কলকাতা

পুরশ্রী

নজরুল সংখ্যা

☞ নাগরিক পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে বকেয়া কর অবিলম্বে মিটিয়ে দিন

☞ জলই জীবন—এর অপচয় রোধে সক্রিয় সহযোগিতা করুন

☞ আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক সময়ে ফেলুন

☞ কলকাতা আমার—আপনার। এর ঐতিহ্য বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের সবারই

কলিকাতা পৌরসংস্থা

কলকাতা পুরশ্রী

৩-৪ সংখ্যা □ ২২ বর্ষ □ ১৬ জুলাই, ১৯৯৯

নজরুল সংখ্যা

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয় ৫

বহরমপুর জেলখানায় কাজী নজরুল ● [illegible] সেনগুপ্ত ৭

কবি নজরুল : প্রকৃতি পর্ব ● জ্যোতির্ময়ী ঘোষ ৯

সাংবাদিক নজরুল ● অঞ্জন বেরা ১০

নজরুলের জন্মশতবর্ষে স্মরণে তিন বিখ্যাত ব্যক্তি ● [illegible] ২০

প্রসঙ্গ : 'নবযুগ' মুজফফর আহমদ ২২

আমার ধর্ম ● নজরুল ইসলাম ২৬

মন্দির ও মসজিদ ● নজরুল ইসলাম ২৮

হিন্দু-মুসলমান ● নজরুল ইসলাম ২৯

নজরুল এবং তাঁর সাহিত্য ● রাজকুমার বসু ৩০

নজরুল : শিশু ও কিশোর সাহিত্য ● রেখা দে ৩৪

বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকায় নজরুল ও তাঁর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ● [illegible] সেনগুপ্ত ৪১

কথা-সাহিত্যিক নজরুল ● অমিত ভট্টাচার্য ৫৮

মনুষ্যত্বের নজরুল ● আবদুল কাদির ৬২

নজরুল ও চলচ্চিত্র ● রাজকুমার রায় ৬৭

নজরুল স্মৃতি বিজড়িত কলকাতার বাড়িগুলি ৭১

"[illegible]" ● [illegible] ৭২

নজরুল জীবনপঞ্জী ৭৬

নজরুল গ্রন্থপঞ্জী ৭৯

প্রচ্ছদ : অনুপ ভৌমিক

আলোকচিত্র : শ্যামল বসু ও শচীন মজুমদার

সহ-সম্পাদক : প্রশান্ত সেনগুপ্ত

সহযোগী : অজয়কুমার [illegible] ও [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য : ১২ টাকা

সম্পাদক : অমলেন্দু ভট্টাচার্য

কলিকাতা পৌরসভার পক্ষে [illegible] কলিকাতা-৮৭ হইতে প্রকাশিত এবং [illegible] প্রিন্টার্স, ১৩৩, [illegible] কলকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

কাজী নজরুল ইসলাম শুধুমাত্র কবিই নন, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, কাহিনীকার, অনুবাদক, সংগীতরচয়িতা, অভিনেতা—বহু ধারার এক উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব। সৃষ্টির ভুবনে তিনি ছিলেন স্বাধীন সম্রাট। সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারে অন্যতম পথিকৃৎ কবি নজরুল।

নজরুল জন্মশতবর্ষে তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টায় আমাদের এই বিশেষ সংখ্যা 'পুরশ্রী'। স্বল্প পরিসরের মধ্যে আমরা একগুচ্ছ বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, তাঁর প্রতিভার বিভিন্ন দিককে। বর্তমানের সময়োপযোগী হবে বলে নজরুলের তিনটি লেখা 'আমার ধর্ম', 'মন্দির-মসজিদ', হিন্দু-মুসলমান' সংযোজিত করা হয়েছে।

নজরুলের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মসূত্রে তিনি থেকেছেন, পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, সৃষ্টি করেছেন তাঁর অজস্র গান, সাহিত্যসম্ভার। নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত কলকাতার বাড়িগুলির তালিকা ও কিছু ছবি একটি প্রতিবেদনে রাখা হল।

আশা করি, পাঠকদের কাছে এই সংখ্যাটি সমাদৃত হবে।

দীপ্ত দৃষ্টিতে নজরুল

শতবর্ষের আলোকে কাজী নজরুল

কল্পতরু সেনগুপ্ত

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে গত বছর ১১ জ্যৈষ্ঠ। ১৩৪৯ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ শেষ হচ্ছে জীবন কবি নজরুলের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়েছিল। বিদ্যুৎ চমক তার বজ্রপাতে শিখা জ্বলে থেমে যায়নি। কিন্তু সেদিনের কবি তাঁর জীবন সংকেত, তাঁর জীবনের পূর্ণতাকে মনে করা যায়। বাস্তবিক যৌবনে পৌঁছে তিনি আজও কবি, বিদ্রোহের কবি। এই বিদ্রোহী সত্তার সমুত্থানের প্রয়োজন ছিল তাঁর জন্মকালের অতীত পরিবেশ বহুলাংশ মাধ্যমে। তিনি জন্মেছিলেন বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। উপার্জনের তেমন কোনো সংস্থান ছিল না। একদিকে দারিদ্র্যের অভিশাপ, একই সাথে মক্তব-এর পাঠ। কৃতিত্বের সাথে মক্তব-এর পাঠ শেষ করে, সেই মক্তবেই শিক্ষকতা করলেন বালক শিক্ষক। আবার পরে মাজারের খাদেম ও মসজিদের মুয়াজ্জিন হিসেবে কাজ করেন। এই সময় বর্ধমান অঞ্চলের লোকগীতি লেটোর দলে যোগ দেন। কাজী নজরুল অল্প বয়সে লেটোর দলের উস্তাদ হয়েছিলেন। তিনি হলেন সেই দলের গায়ক ও কবিয়াল। তাঁর রচিত গানগুলি সকলের প্রশংসা লাভ করে। এর প্রভাব তাঁর মনে গভীর দাগ কাটে। লেটো গানে সুর, ছন্দ, শব্দ প্রয়োগে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনলেন। এই সাথে পাঁচালি, কবিগান লোকগীতির উপর আকৃষ্ট হয়ে সুচারু কবিত্ব লোকগীতি ভক্তি নজরুলকে সাহিত্যে অনুপ্রাণিত করেছে।

আবার তিনি স্কুলে এলেন অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। এবার রানিগঞ্জের এক রেলওয়ে গার্ডের বাড়িতে। পরবর্তী কালে আসানসোলের এক রুটির দোকানে কাজ নিলেন। এখানে পরিচয় হয় দারোগা কাজী রফিজউল্লাহর সাথে। তিনি নজরুলকে ময়মনসিংহের দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি করে দেন। এখানেও তিনি বেশিদিন থাকতে পারেননি। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার আগেই তিনি রানিগঞ্জে ফিরে আসেন। কিন্তু তিনি যে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত ছিলেন, তা বলা যায় না। শিয়ারশোল রাজ স্কুলে পড়ার সময় তাঁর এক সহপাঠী রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করলে তিনি এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, পাঠ নিয়ে সেই সহপাঠীর সাথে বাদানুবাদ করেন। এটা ছোটখাটো ব্যাপার নয়।

আবার তিনি স্কুলে ফিরে এলেন। এবার শিয়ারশোল রাজ স্কুলে বিপ্লবী দলের সদস্য শিক্ষক নিবারণ ঘটকের নজরে পড়লেন। নিবারণ ঘটক তাঁকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। নজরুলের মনে এল দেশের স্বাধীনতার কথা।

এই সময় তিনি এক পুলিশ অফিসারের নজরে পড়ে গেলেন। সেই পুলিশ অফিসার নজরুলকে তাঁর নিজ গ্রামে বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর গ্রামে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন এবং স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানে এক বছরের মতো তিনি ছিলেন। কিন্তু তাঁর মন টেকে না। অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন। আবার অষ্টম শ্রেণীতে তিনি রানিগঞ্জে পড়া আরম্ভ করেছিলেন। ফিরে এসে আবার তিনি শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। এই স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। সুতরাং কবি কুমুদরঞ্জনের স্নেহদৃষ্টি পড়ল তরুণ কবি নজরুলের দিকে। নজরুলের কাব্য প্রতিভার বিকাশে এই স্নেহদৃষ্টি উল্লেখ্য।

১৯১৪ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধ যেমন দেশকে ধ্বংস করে, জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে, শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করে, নৈতিক মূল্যবোধ ধসিয়ে দেয়, তেমনি যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুন এক শক্তিও জন্ম লাভ করে। তাছাড়া এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে দেশোদ্ধারে এক বিপ্লবের প্রস্তুতি হয়েছিল। কিন্তু সেটা কার্যকরি হয়নি। নজরুল এই সময় সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করে যুদ্ধে গেলেন। বিশ্বযুদ্ধের জন্য তিনি হাবিলদার পদে উন্নীত হলেন। সেনা শিবিরে তিনি তার সাহিত্য সাধনার পরিচয় রেখেছিলেন। এই শিবিরে থেকেই তিনি গজল গান রচনা করেছিলেন। শিবিরে থাকতেই তিনি ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের খবরাখবর পেয়েছিলেন।

নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ভারতীয় জনগণের মধ্যেই নতুনের স্বপ্ন লালন করেছিলেন। নভেম্বর বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, গান গেয়েছিলেন।

যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরেছিলেন। রাজনীতি করার সংকল্প নিয়ে। এই সময়ে তাদের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদের সাথে একই ঘরে বাস করেন। তিনি এখানে সাংবাদিক-বৃত্তি গ্রহণ করেন। সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমেদ ও কাজী নজরুল। এই সময় তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা বিদ্রোহী (১৯২১) সারা দেশকে উদ্বেলিত করে তোলে। মুসলমান বিদ্রোহী কবিতাপত্রে তাঁদের অর্থ পূর্ণ হল। এই বিদ্রোহী কবিতার প্রথম পাঠক ছিলেন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ। সেই কবিতাটি ছিল পেন্সিলে লেখা। এটা এক রাতে লেখা যে কবি ছাড়া আর কারুর পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু মুজফ্‌ফর আহমেদের কাছে শোনামাত্র বিদ্রোহী কবিতা বাংলার যুব সমাজকে বাংলার বিপ্লবীদের বুকে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলেছে। "বিদ্রোহী" সত্তার প্রতিষ্ঠায় আবৃত্তি শুরু হয়েছিল। বিদ্রোহ বলতে কেবল বিপ্লবী বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে স্বাধীনতার কোনও পূর্ণ অর্থ ছিল না। কেউ বলছেন স্বরাজ, কেউ বলছেন স্বায়ত্তশাসন, কেউ বলছেন, ডোমেনিয়ন স্টেটাস। এই নিয়ে নানা তর্ক বিতর্ক হয়। কাজী নজরুল কবিতার শেষ পংক্তিতে লিখছেন "আমি সেইদিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না / যবে অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।" এই পংক্তির মাধ্যমে তরুণ বিপ্লবীরা পেলেন স্বাধীনতার অর্থ। শোষণহীন অত্যাচারমুক্ত সমাজ গড়ার প্রেরণা। এইভাবেই তিনি বিপ্লবীদের বুকে আগুন জ্বালালেন।

সেকালের বিপ্লবীরা ছিল যৌবনের জয়যাত্রার দিন। পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প যুব সমাজ এগিয়ে চলেছে সংগ্রামের পথে। সেই জয়যাত্রাকে নজরুল সংগীত যোগালেন।

"এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল"।
শিকল পরে শিকল তোদের করবো রে বিকল...

তোদের ফাঁসি দিয়ে ঝুলাতে দেশে আসবে নতুন প্রাণ।

বিদ্রোহী তরুণ এবং নবীন যুবকরা জেলে যাচ্ছে, দ্বীপান্তরে নির্বাসিত হচ্ছে, ফাঁসিকাষ্ঠে আহ্বান করছে, কবি এই বিপ্লবীদের গৌরবময় জীবন ও তাদের আত্মদানের কথা, দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করলেন—

"ওকি খড় নিশি তোরে
এবি এ শুনি ওরে
বুঝি জেগেছে, কবি পুরাতে।

ওরা দুলায়ে পড়ে দোলা মরণ পারায়ে।
শহর থেকে গোলা নিকষ বারায়ে।"

এর আগে বাংলার প্রধান কবি, কোন সাহিত্যিক এমন করে বিপ্লবীদের সংগ্রামের কথা আত্মদানের কথা লেখেননি।

বাংলায় বিপ্লবাত্মক প্রেরণার দিকে এমন কিছু সামরিক সুরে এমন কিছু গান রচনা করেছিলেন যা বাংলা সংগীত জগতে সম্পূর্ণ নতুন। বাংলায় বা ভারতের সামরিক সুরের গান ছিল না। বিদ্রোহের প্রয়োজনে নজরুলই তা সৃষ্টি করেছেন। যেমন—ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী তল। ("দ্রুত মার্চের সুর. Quick Waltz. Six/Eight) অথবা

"নতুনের গান গাহে দামামা বাজিয়ে পর্ব ঐ
দূর মৃত্যু তীর্থ পথে, যাত্রী কই।

(Quick March)

"নিশান উড়াও দানাতে উড়ুক হাওয়ায় দুলে।" (slow March) এমন ব্রিটিশ মিলিটারি ব্যান্ডের সুর অবলম্বনে তিনি একাধিক গান রচনা করেছেন। যে গানের কথা ও সুর বাংলায় সম্পূর্ণ নতুন। বিপ্লবীদের সংগ্রামের পথে যে গানগুলো প্রেরণা জুগিয়েছে।

বাংলায় বিপ্লববাদ এর চরম রূপে ওঠা পর্ব পর পর নজরুলকে বিদ্রোহ পথে অগ্রসর হতে উৎসাহী করছে। কাজী নজরুলের এই সকল গানের বিশেষ ভূমিকা আছে। এদিক থেকে বাংলার কাজী নজরুল একজন বিপ্লবী ছিলেন। তিনি বিপ্লবের কে বিচার, চেতনায় গ্রহণ করেছিলেন। নতুবা এমন বিদ্রোহের গান লিখতে পারতেন না। দিনের কণ্ঠে বাংলার বিপ্লবী তরুণদের যে ভূমিকা ছিল তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নজরুলের ভাষায় "ফাঁসির মঞ্চে কারাগারে উঠেছে যে বিদ্রোহী।" আর সে-এর কণ্ঠে তারই বাংলার সেই তরুণ ও যুবকরা জেগেছে গেল। তিনি এর কণ্ঠে গৌরবময় ভূমিকাতেও কি বাংলাদেশ স্বদেশের মুক্তিকামী উদ্বুদ্ধ হয় না?

নজরুল যেমন বাংলার বিপ্লবীদেরকে আহ্বান করেছিলেন, বিপ্লবের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন। তেমনই পরবর্তী সময় সাম্যবাদের আদর্শের পথিক ছিলেন তিনি। তিনি আবার স্বপন নজরুল বিদ্রোহের জয়গান গেয়েছিলেন—

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ঐ নূতনের কেতন উড়ে।
কালবৈশাখীর ঝড়। তোরা সব
সিন্ধুপারের আগল ভেঙে
আসছে ভয়ঙ্কর।"

স্বাভাবিকভাবেই নজরুল চিন্তা করেছিলেন বিপ্লবের পরবর্তী কাল সাম্যবাদী সমাজ গড়ে। বিপ্লবের অর্থ পুরাতন ব্যবস্থা অধিকার রক্ষণের থেকে ভেঙে ফেলা। এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে অর্থ উঁচু থাকবে না। মানুষের অন্ন স্বাধীনতা থাকবে, ব্যক্তি স্বোপার্জন, শিক্ষা, সংস্কৃতির স্বাধীনতা থাকবে। সুতরাং নজরুল বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদে স্বাভাবিকভাবে উত্তরিত হয়েছিলেন। যদি নজরুল বিদ্রোহের গান না লিখতেন গদ্যে-পদ্যে বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করে না বেড়াতেন তাহলে তিনি এত বিখ্যাত হতেন কিনা জানি না। আমাদের কিছু "বুদ্ধিজীবী" মানুষ আছেন যাঁরা নজরুলের এই বিদ্রোহী ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা পছন্দ করেন না, অথচ এই নজরুলের বিদ্রোহী ও সাম্যবাদী চিন্তাকে উপেক্ষা করলে সম্পূর্ণ নজরুলকে পাওয়া যাবে না।

তিনি যেমন বিদ্রোহের গান গেয়েছেন, সাম্যবাদের গান গেয়েছেন, তার সাথে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তার মত এত বলিষ্ঠভাবে কেউ লেখেননি। এদেশে নারীসমাজ চিরকাল অবহেলিত, বঞ্চিত জীবন, মুসলমানদের মধ্যে পুরুষশাসিত সমাজের নারী চিরকালই পুরুষের ভোগদাসীর অধিক মর্যাদা পায়নি। কাজী নজরুলের বিখ্যাত কবিতা, 'নারী' এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ। তাঁর 'জাগো নারী বহ্নিশিখা' নারীকে বিদ্রোহের আহ্বান।

কাজী নজরুলের সৃষ্টির আরও বহু দিক আছে। তিনি বাংলা কাব্যে নতুন ছন্দের প্রবর্তন করে বাংলা কাব্যকে শক্তিশালী করেছেন, ভাষাকে সৌন্দর্যবিভূষিত করেছেন। শিশুদের জন্য ছড়া ও কবিতা লিখেছেন যা এক বিপ্লবীর মনে গভীর স্নেহের শিশু-প্রেমের প্রকাশ। তিনি নাটক, গল্প, উপন্যাস বেশ কিছু লিখেছেন। এই সকল গল্প, উপন্যাসে নতুনত্ব আছে। তাঁর বিদ্রোহের মানসিক তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার 'ব্যথার দান' গ্রন্থে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসে একজন মুসলিম নায়িকার চরিত্র অংকন করেছেন বিপ্লবী দলের নেত্রী হিসাবে। এখানে তার মনের গোপন ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি কামনা করেছিলেন মুসলমান সমাজের যুবক-যুবতীরা বাংলার বিপ্লবী দলে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হোন। এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর 'কুহেলিকা' উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন।

সুতরাং নজরুলকে বুঝতে হলে তার সমগ্র রচনা পাঠ করা কর্তব্য। যাঁরা মনে করেন কবি হিসাবে নজরুল উচুদরের কবি নন, তাঁরা দেশের ইতিহাস, কালের পর্যায় ইত্যাদি বিবেচনা না করে পরিপ্রেক্ষিতহীন উক্তি করে থাকেন। একদা সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যে কবির কাব্যে একটা যুগের চিত্র প্রকাশ হয়েছে, তিনি শুধু কবি নন, মহাকবি।

বাংলার জগতে রবীন্দ্র-সংগীত ও নজরুল-সংগীত বাংলার আকাশে বাতাসে সুর ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন কম দেশই আছে যেখানে এমন করে গান গেয়ে মানুষ এতটা প্রেরণা লাভ করেছে। নজরুলের গানের কথা এখানে আর আলোচনা করলাম না। কারণ সেটি স্বতন্ত্র একটি বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে একথা উল্লেখ করতেই হয়। তিনি কাজী সুরের সাথে বাংলায় খেয়াল, ঠুংরি, গজল, কাওয়ালি এবং লোকগীতি নতুন সুরে, নতুন রসিয়ে সৃজন করেছেন। তার সাথে একমাত্র উচ্চাঙ্গ সংগীত নামে 'আত্মজাগরণের গান'-এর পথিকৃৎ তিনি।

কবি নজরুল : প্রস্তুতিপর্ব

জ্যোতির্ময় ঘোষ

"বর্তমান কবিতা পড়িয়া এতো আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাংলা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে, তাহার প্রতিভা যে সুখবী ও শক্তিশালিনী—এক কথায়, সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা যে তাঁহার মনোগৃহে সত্যই অবতীর্ণ হইয়াছে, তাঁহার নিদর্শন প্রথম হইতে ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাংলার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি, এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যামোদী বাঙালী পাঠক ও লেখক সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি।"

"...কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃ উৎসারিত ভাবকল্পনার অনুগামী সহচরী। 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক কবিতার ছন্দ সর্বত্র মূলত এক হইলেও মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্যে প্রত্যেক শ্লোক ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যে ভাবের দাসত্ব করিতেছে—কোনোখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই—এই প্রকৃত কবি-শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনোখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই।"

"...বাদল প্রাতের শরাব' শীর্ষক কবিতা হাফেজের পুষ্পসার ও দ্রাক্ষারসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটিতেও কবির 'মস্ত' হইবার ও 'মস্ত' করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। পাঠকমাত্রেই ইহার উজ্জ্বল রসাবেশ অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনী জয়যুক্ত হউক।"

'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের বহু উল্লেখিত বিখ্যাত চিঠির কিছুটি নির্বাচিত অংশ এখানে উদ্ধৃত হল। এই চিঠিখানি সুদীর্ঘ কিন্তু অবিস্মরণীয়। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় চিঠিখানি প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে চিঠিখানি সম্পাদকের হস্তগত হওয়ায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই অনুমান অসঙ্গত হবে না। নজরুলের বয়স ছিল তখন একুশ আর মোহিতলালের বত্রিশ।

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে মোহিতলালের বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা নিয়ে যেমন কোনও সংশয় উত্থাপন করা সংগত হবে না তেমনি বাংলার সমালোচনা সাহিত্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানসিক ত্রুটি (বক্রতা) জনিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মোহিতলালকে প্রথম সারির অন্যতম অগ্রণী ব্যক্তিত্ব রূপে চিহ্নিত করলে অতিশয়োক্তি হবে না। এই চিঠির সূত্র ধরেই মোহিতলাল ও নজরুলের পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা ঘটলেও পরবর্তীকালে উভয়ের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে কৌতূহলী পাঠকেরা এ-ও জানেন যে নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার মূলে মোহিতলালের 'আমি' শীর্ষক গদ্য রচনাটির প্রভাব বিদ্যমান— মোহিতলালের এই বিশ্বাস ও অভিযোগকে কেন্দ্র করে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাঙনের মুখে গিয়ে পড়ে। মোহিতলালের ব্যক্তিত্বের প্রবল আত্মাভিমানবোধ ও চারিত্রিক [illegible] কটূর সমালোচনা তাঁর সমকালে তাঁকে বঙ্গদেশে বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল এবং মনে হয় তাঁর প্রাপ্য সাহিত্যিক মর্যাদা থেকেও তাঁকে অনেকাংশে বঞ্চিত করেছিল। কিন্তু 'মোসলেম ভারত' সম্পাদকের কাছে লেখা সুদীর্ঘ চিঠিতে মোহিতলালের রসবোধ ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাকে অসামান্য বলতেই হবে এবং উদীয়মান তরুণ কবি নজরুলের দুটি মাত্র কবিতাপাঠের ('খেয়াপারের তরণী' ও 'বাদল প্রাতের শরাব'—পরবর্তীকালে এই দ্বিতীয় কবিতাটি '[illegible]' নামে চিহ্নিত হয়েছে) অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নজরুলের কবিপ্রতিভাকে যে দ্বিধাহীন ভাষায় নন্দিত করেছিলেন, তাকে সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক, বিবিধ কারণেই স্মরণীয় বলতে হবে।

॥ দুই ॥

নজরুলের প্রথম মুদ্রিত কবিতার নাম 'মুক্তি'। বেরিয়েছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় (জুলাই/আগস্ট ১৯১৯)। নজরুল এর আগেও অনেক কবিতা লিখেছিলেন কিন্তু এই কবিতাটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জানিয়েছেন কবিতাটি নজরুলের 'নির্ঝর' নামে সংকলনে গৃহীত হয়েছিল। 'নির্ঝর' সংকলনটি মুদ্রিত হলেও বাজারে প্রকাশিত হয়নি।

'মিহির' পত্রিকাটি আমরা দেখিনি। তবে এই সাক্ষ্যের জন্য (যেহেতু কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতাও না থাকায় ঠিক সাক্ষ্যমতে 'মুক্তি' শীর্ষক একটিমাত্র কবিতা আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। কবিতাটি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবের 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা' গ্রন্থটিতে আছে। কবিতাটি প্রসঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলাম একটি টীকা যুক্ত করেছিলেন। সেখানে আছে 'ইহা সত্য ঘটনা। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে এই ঘটনাটি ঘটিতে শুন যেখানটির মুদ্রা ঘটে। উহারা পরিত্র সমাধি এখনো হয় যাঁরা পবিত্রের মহাপবিত্র বলিয়া কথিত হয়—নজরুল ইসলাম।'

কবির সবুজ দিক থেকে এবং কবিতাটি পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে এটি পুস্পী যে 'মুক্তি' একটি আত্মিক কবিতা। তবু নজরুলের এই প্রথম মুদ্রিত কবিতাটি নয়, তাঁর দক্ষিণ অভিজ্ঞানে কবিতা এবং কম সংখ্যক গদ্যও প্রকাশ এ পত্রিকা ভাগে স্পষ্ট এ অজ্ঞাতে পুষ্প ও পত্রিকায় নিয়োজনার কতিপয় অপ্রকাশিত। বস্তুত নজরুল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম থেকে এইরকম আত্মপ্রতিষ্ঠিত কবিতাটি এবং তার পাশাপাশি 'হেনা', 'ব্যথার দান' প্রভৃতি ছোট গল্প পাঠালেন। নজরুল ইসলাম বেশ কয়েকটি ছোটগল্প এবং কয়েকটি উপন্যাস ও নাটিকা লিখেছেন।

অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গদ্য প্রায় বা পদ্যেই প্রায় ক্ষমা বা কাটিয়ে দিয়েছেন। এই দিকে সাহিত্যিক বাস্তবতা কথা মনে রাখলে নজরুলকে প্রথমত ও প্রধানত কবিশিল্পী রূপেই চিহ্নিত করলে ভ্রান্তি অবকাশ হবে না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের সমর্থনে একটি তথ্য-পরিসংখ্যান পেশ করা দরকার। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ প্রথম বর্ষে 'মোসলেম ভারতে' নজরুল ইসলামেরও যে রচনাবলী ছাপা হয়েছিলো তার একটি তালিকা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর আলোচনায় বর্ণনা ও ইতিহাস চেতনা থেকে তার নজরুল সংক্রান্ত স্মৃতিকথায় উপস্থাপিত করেছেন। এই তালিকাভুক্ত রচনাগুলির পাশাপাশি এগুলির সাহিত্যিক প্রকৃতি আমরা লক্ষ্য নির্দেশ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে অতিক্রম থেকেই আমাদের প্রতিপাদ্যটি সম্পর্কে অনুভব করা যাবে বাস্তব এও হতে পারে—

(১) বাঁধন হারা (ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাস)
(২) খেয়াপারের তরণী (কবিতা)
(৩) বাদল বরিষণে (ছোট গল্প)
(৪) বাদল প্রাতের শরাব (কবিতা)
(৫) মোহরম (কবিতা)
(৬) কোরবানী (কবিতা)
(৭) শাত্-ইল-আরব (কবিতা)
(৮) গান (হিন্দি)
(৯) হাফিজের গজল
(১০) ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম, আবির্ভাব (কবিতা)
(১১) বিদ্রোহী (কবিতা)
(১২) মরমী (গান)
(১৩) ভোর-বিহু (গান)

সমসাময়িক বিজ্ঞজনেরাও জানিয়েছেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ—

আমি কবি বা সাহিত্যিক নই। কাজেই সাহিত্যের আমি যে এতখানি সমঝদার সে-কথাও জোর গলায় প্রচার করার অধিকার আমার নেই। তবু নজরুল ইসলামের এই প্রথম কবিতাটির পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে খুবি খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

তিনি খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠুন না কেন, তিনি নিজেই জানতে বুঝেছিলেন যে, 'সম্পাদক ও সহকারীরা এই কবিতাটির তারিফ করেননি। কেউ কেউ বলেছেন কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ।'

নজরুলের এই প্রথম মুদ্রিত কবিতার 'রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ' শীর্ষক ছিল কি-না, সময়ের তার প্রবৃত্তি ও পরিবেশ সম্পর্কে অবহেলার দরুন ১৯২০ সালে নজরুলের এই কবিতা এবং নজরুলের 'হেনা' ও 'ব্যথার দান' প্রকাশে পত্রিকা সম্পাদনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন কবিতা-পাঠকরূপে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবের কী ধারণা হয়েছিল তার কিছু প্রতিবেদনে তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা প্রকাশ করেছেন—

কিছু না কিছু বলুক না কেন, আমি কিন্তু নজরুল ইসলামের এই কবিতাটির হাতে লিখিত পাণ্ডুলিপি দেখেই পেয়েছিলাম। তারপর এই কবিতা এবং 'হেনা' ও 'ব্যথার দান' প্রভৃতি ছোটগল্প পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে বাংলাসাহিত্যে একজন শক্তিশালী কবি ও সাহিত্যিকের উদয় হতে যাচ্ছে।

'মুক্তি' কবিতাটিকে সমকালের সমালোচক ও সম্পাদকেরা 'রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ' বলে মনে করেছিলেন। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু সত্য আছে। বস্তুত, তখনকার অর্ধসত্য। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা থেকেই যথার্থ আত্মমগ্নশিল্পী। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী প্রভৃতি তো আমাদেরই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আত্মাদর্শ, আত্মগত ও সাহিত্য লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথ যাঁকে তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন, সেই বিহারীলাল 'সারদামঙ্গল' থেকে 'সাধের আসন'-এর 'প্রভাতী' তখ লেখেননি, তিনি 'বঙ্গসুন্দরী'ও লিখেছিলেন, 'নিসর্গ-সন্দর্শন' তো বটেই। রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে ও প্রথম তরুণ বয়সে যাঁকে সাহিত্যগুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন, সেই মধুসূদনও 'আত্মবিলাপ', 'বঙ্গভূমির প্রতি', চতুর্দশপদী কবিতাবলী ও 'ব্রজাঙ্গনা'-ই শুধু লেখেননি, 'মেঘনাদবধকাব্য' ও 'বীরাঙ্গনাকাব্য' আর নাটক-প্রহসন প্রভৃতিও লিখেছিলেন। অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কাব্যজগতে তথা বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শ পাশাপাশি, আরও সঠিকভাবে মিশ্রিতভাবে চলছিল।

রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবে সেই সাহিত্যাদর্শেরই উত্তরাধিকার তাঁর অন্তরে প্রবাহিত পেয়েছিলেন। তিনি ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শের মধ্যে একটি সোনালি সমন্বয়ের সন্ধানে ছিলেন এবং সম্ভবত সমকালেও তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল। কেন না মহত্ত্ব ও গতিশীলতার প্রতি গভীরতর তৃষ্ণি প্রতিভার জন্মসূত্রে নিশ্চিত।

নজরুল তাঁর শৈশব-কৈশোরে সাহিত্যের বিভিন্ন কাহিনীমালাও লোকায়ত বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যাদিতে সাধনা করেছিলেন, কিন্তু পুরান ইসলামী সাহিত্যে তাঁর প্রত্যক্ষ গভীরতা তাঁর কবিতার স্তরে-স্তরে দৃশ্যমান, তাঁর প্রাক-সমকালীন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র কবিতায় ছান্দসিকের অনুরাগ ও বহুদী সমীকরণ নজরুলকে প্রভাবিত করেছিল, রবীন্দ্রনাথের অনুদিত গান কতটুকু ছিল বলে নজরুলের অনুরাগে তাঁকে 'রবীন্দ্রসংগীতের হাফিজ' বলা হতো এবং নজরুল সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের আন্তরিক পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন—নজরুলকে অনায়াসেই 'রবীন্দ্রসাহিত্যেরই হাফিজ' বললেও খুব একটা অতিশয়োক্তি হয় না।

নজরুলের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'মুক্তি' রচনায় মূলে রবীন্দ্রপ্রভাব থাকতেই পারে কিন্তু তা কোন ক্রমেই রবীন্দ্রনাথের অন্ধ অনুকরণ হতে পারে না। নজরুলের শৈশব-কৈশোরের মৌলিক মাটি-পরিবেশ ও

[illegible] 'মৃত্তি' নামে মুদ্রিত হয়েছিল।

[illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible] কিন্তু [illegible] বাংলা সাহিত্যে [illegible] ছিল না।

[illegible] 'মুক্তি' [illegible] নজরুল [illegible] এই [illegible]

[illegible] 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' [illegible] নজরুল [illegible] 'মুক্তি' [illegible]

[illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] ১৯১৯ [illegible] নজরুল [illegible]

[illegible] নজরুল [illegible]

[illegible] এই [illegible] নজরুল [illegible]

[illegible] কবিতা [illegible]

কিন্তু [illegible] মধ্যযুগের [illegible] কবি [illegible] লিখেছিলেন—

[illegible]

[illegible]

[illegible] আধুনিকতার [illegible] প্রথম [illegible] কবি [illegible] প্রকাশ করে গেছেন। [illegible]

[illegible] কবিতা [illegible] নজরুল [illegible]

[illegible] আধুনিক [illegible] নজরুল [illegible]

[illegible] নজরুল [illegible] 'দোলনচাঁপার [illegible]' [illegible] এই দুটি কবিতাই [illegible]

'[illegible]' শীর্ষক কবিতার [illegible] কবি [illegible] এই [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 'মা পাখির মতো' [illegible] কবিতার [illegible] শীর্ষক

কবিতার ইতরের পুষ্পপাত ও প্রাকৃতার অভ্যুত্থান হইয়া উঠিয়াছে, এ কবিতাটিতেও কবির 'অস্ত্র' হইবার ও 'অস্ত্র' করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে, তাহারী মধ্যে ইহার উদ্ভব রূপান্তরে অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনী জয়যুক্ত হউক।

লেখাপড়া হলে অর্থাৎ, ছড়ার ছন্দে, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন প্রাকৃত ছন্দ, সেক্ষেত্রে উর্দু-ফারসি শব্দগুলো এমন বেশি উপযুক্ত ও বিশেষ উপযোগিতা সৃষ্টি করে। নজরুলের ফারসি শিক্ষা তুর্কিস্থ মক্তবে শিক্ষক মৌলবি কাজী সাহেবের আমলেরও আগে শুরু হয়েছিল। নজরুল ইসলাম সম্পর্কে এক দুর্ভাগ্যের কারণে ফারসি শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এজন্যই তিনি ছোটবেলা থেকেই মিশ্র ভাষা রীতিতে গান লিখে দিয়েছেন। মিশ্র ভাষা-রীতি, প্রসঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে নতুন ব্রজবুলির কথাও মনে পড়ে। বিদ্যাপতি, দ্বিতীয় বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও রাধামোহন বৈষ্ণব পদাবলীর পদের যে উপযোগিতা লাভ করেন, তা-ই অনেক ভাবে প্রাকৃত না লৌকিক হয়ে উর্দু-ফারসি শব্দ গ্রহণ করেও কবিতায় পাওয়া যায়। নজরুল বিশেষভাবে রফিকুল ইসলাম নজরুলের প্রেমের মিশ্র ভাষারীতিতে লেখা একটি কবিতার নমুনা দেখিয়েছেন—

কেন দিল খেলে ছিলে মেরী খাতুনে আমান,
হাত পায়ে ওঠে ইশক মে জান পেরেশান।
প্রেমে তোমার বন্দি
চশ্ম কাফিরি
দিল কি যে বলবে গোলা, আহেতারা প্রাণ।
বুলবুল কাঁদে এসেছে বাকী শুধু গান।

কবির দক্ষতা হলেই নজরুল সেটা নাচ-গান এবং কথার সঙ্গে সংযোগ করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে রফিকুল ইসলাম সাহেবের মন্তব্যটি নজরুলের কাব্যভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়—

"বস্তুত সেটাই বাংলা গানে প্রথম আরবি নজরুলকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা দান করেছিল। কবি ও শিল্পী নজরুলের হাতে-গড়া সেটাই নয়। কেবল ছন্দ কবিতা, গান বা নাটক রচনা নয়, হিন্দু পুরাণ ইতিহাস এবং ঐ সমস্তের থেকে সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ঘটে সেটো দলে। পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্টিতে মুসলমান ঐতিহ্যের সঙ্গে হিন্দু ঐতিহ্য এবং বাংলার প্রাচীন ও লোক সংস্কৃতির উপাদান ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য ও স্বচ্ছন্দ পরিলক্ষিত হয় তার সূত্রপাত ঘটে সেটো কবি নজরুলের জীবনে।"

'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা মোহিতলালের চিঠিতে নজরুলের 'খেয়াপারের তরণী' ও 'বাদল প্রাতের শরাব' কবিতা দুটির ভাষা সৌন্দর্যের অনুপম আলো অনেকেই উদ্ধৃত করেছেন। সেই উদ্ধৃতাংশের দুটি বাক্যের পুনরাবৃত্তি করতে চাই—

"কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ছন্দের কোনখানে হৃদয়ের তীব্রতা নাই। মিত্রাক্ষর, যতি, ভঙ্গি, সংযম, নিখুঁত বিন্যাস এবং সর্বোপরি প্রকাশ ভঙ্গির লোভ পর্যন্ত একটি উজ্জ্বল শক্তির কবিপ্রকৃতি কল্পনার রূপ, শব্দ বিন্যাস ও ছন্দ ঝংকারে মূর্তি দীপ্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

'কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই'—এই তিনটি শব্দে উপরে বিশেষত আবৃত্তি শব্দটির উপর আমরা জোর দিতে চাইছি।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রতিভার কাহিনি অতুল, প্রতিষ্ঠিত হিমালয় পর্বতমালার মতো। কবিতাকে বিদ্রোহ রবীন্দ্র শিল্প ও সাহিত্য মহাসাগর জাতীয়, নিরবচ্ছিন্ন ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ছিল, অন্তঃপ্রবাহের দিক থেকে মহাকাব্যিক তুলনা কিন্তু এই সময়েই ছিলেন তিনি, বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ গতি থেকে পর্যায়ে বাংলা জাতিকে জীবনপ্রবাহের সামগ্রিক মহাসম্প্রীতির জন্য শক্তিময়। এমন সুদীর্ঘ প্রতিভার মধ্যে একটি অরণ্য প্রতিভা জন্মগতভাবে ক্রমায়ে 'রবীন্দ্রনাথ' হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রমবিকাশের পথে কোথাও আকস্মিকতার চমক অভাবনীয় অভূতপূর্ব কীর্তিতে দেয়। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকাশের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি যা লেখেন বললে যদি রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হত, তাহলে রবীন্দ্র-সৃষ্টির ভারতীয় ঐশ্বর্য কি থাকত?

যখন নজরুলের কথা ভাবি, তখন মনে না হয়ে পারে না, ১৩২৮ সালের ২২ পৌষ তারিখে 'বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতাটি যেদিন প্রথম ছাপা হল সেদিন নজরুলের (জন্ম ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) বয়স ছিল বাইশ বছর। 'বিদ্রোহী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ আর মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। শুধু তাই না, অনেক পত্রপত্রিকায়ে 'বিদ্রোহী' কবিতাটির পুনর্মুদ্রণের খবর পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় লেখা আর কোনও কবিতা নিয়ে অনুরূপ উন্মাদনার সৃষ্টির ঘটনা কি আমাদের মনে পড়ে?

এমন নয় যে আমাদের এত কম বয়সে অথবা এর চেয়েও আরও উল্লেখযোগ্য কম বয়সে উল্লেখযোগ্য আলো বা কবিতা লিখে আর কেউ নজরুলের আগে লেখেননি। ছাত্রের কাছেই দৃষ্টান্ত হিসেবে আছেন সুকান্ত-সুকান্ত। এবং গদ্য রচনায় ক্ষেত্রে লেখেন। 'ছবি' রবীন্দ্রনাথের কবিতার উৎকৃষ্ট রচনার নিদর্শন রেখে গেছেন। তবু কেউ বা অর্জন করতে পারেননি এমনকি রবীন্দ্রনাথও, একমাত্র নজরুলই তা পেয়েছিলেন তা হল এই একটিমাত্র কবিতা লিখবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু চাঞ্চল্যকর নয়, আলোড়িত স্থান তিনি অর্জন করেছেন।

এই কবিতা রচনার প্রায় আশি বছর পরে, এখনও নজরুল এই কবিতাটির বিদ্রোহের জন্যই উল্লিখিত ও চিহ্নিত হয়ে আছেন, সাহিত্যের ইতিহাসে এই ঘটনার তুলনা মেলা ভার।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক তথ্যের এই সূত্রে অবতারণা হবে না। রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) এবং 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) প্রকাশিত হওয়ার পর অতি তরুণ বয়সে যথাক্রমে একুশ ও পঁচিশ বছর বয়সেই কবি-কথাশিল্পী সেদিনের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে অভিনন্দন লাভে ধন্য হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ঘটনা, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে কোনও গ্রন্থ উৎসর্গ করেননি।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কাল সাহিত্যিকদের এবং বিজ্ঞান ও রাজনীতির জগতে বিশিষ্ট কোনও কোনও ব্যক্তিকে গ্রন্থ উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে কোনওরকম কার্পণ্য করেননি। তবু 'বিদ্রোহী' কবিতাটির নজরুল প্রতিভার এমন কোনও মৌলিকতা ও উৎকর্ষ বিশেষত্বে নিঃসংশয় অভিভূত করেছিল যে, বয়স-সাপেক্ষ রবীন্দ্রনাথের তাঁর সেই পরিণত বয়সেও একজনের মধ্যে একটি নতুন গ্রন্থ দিয়ে নজরুলকে উৎসর্গ করে নিজের অপরিসীম স্নেহ-শ্রদ্ধা, তাঁর তরুণেরও জানান করে দিলেন। নতুন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও তরুণ সাহিত্য বহুলের আশীর্বাদ উল্লিখিত অনাবৃত হয়েছিলেন—কবি নজরুলকে বিদগ্ধ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পক্ষে

বিরূপ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তুলনা করে দেওয়ায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভক্ত ও পার্ষদদের মনোভাব অনুধাবন করেছিলেন। প্রসঙ্গটি তাঁদের কাছে উত্থাপনও করেছিলেন। নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরেও আসেননি।

অনুজ তরুণ কবি লেখকদের মধ্যে যাঁদের স্নেহ ও স্বত্ব রবীন্দ্রনাথের কাছেও সমূহ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছিল, তাঁদের তিনি সদর স্বীকৃতি জানাতেও সর্বদাই নিজের উত্তরাধিকারী বলে একমাত্র তরুণ নজরুলকেই স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ-মমতা সহ ও আশীর্বাণীরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু ফিরে স্মরণ করতে পারি, 'দেশ' পত্রিকার ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের মাঘ-ফাল্গুন যুগ্ম ও শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাহিত্য-বিতর্কের দেশপটে' নামাঙ্কিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে নজরুলকে উৎসর্গীকৃত 'বসন্ত' নাটিকার অধিক্রান্ত সর্বাংশে নজরুল প্রতিভার রবীন্দ্রকৃত সঠিকতম মূল্যায়ন বলে উল্লেখ করেছিলাম। এই ধরনের আরও একটি রবীন্দ্রকৃত নজরুল মূল্যায়ন আমরা পেতে পারি নজরুলের 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীটি থেকে। এই বাণীটিকে মূল্যায়নে আমরা সর্বাংশে সঠিকভাবে 'রাজনৈতিক আশীর্বাণী' বলে চিহ্নিত করে থাকি।

'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রদত্ত আশীর্বাণীটি রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উচ্চারণ বলে পাঠকসমালোচকগণের বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু 'বসন্ত' নাটিকার সর্বাংশ সর্বাংশেও যে কবি রাজনৈতিক সাংগঠনিক নজরুলের উচ্চাকাঙ্ক্ষী রচিত, এই সত্যটি গভীরতর উপলব্ধি-সাপেক্ষ। নজরুল-সম্পাদিত সাপ্তাহিক অর্ধসাপ্তাহিক রবীন্দ্রনাথ এখানে 'ওরে নবীন, ওরে প্রেমিক' বলে আহ্বান করে লিখেছিলেন

আয়রে সবে
প্রলয়োল্লাসের মন্ত্রণাতে

আসলে রবীন্দ্রসাহিত্যে 'বলাকা'-র 'সবুজপত্র' পর্বটির সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি না করতে পারলে কিছুতেই স্পষ্ট হবে না, কেন রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্রোহী'র কবিকেই নিজের যথার্থ উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করলেন। 'পূরবী'র 'আহ্বান' কবিতাও আসলে বিদ্রোহী নবীন বীর যুবকের শাসনকে বিধিহীন বন্দের উৎসাহ ও উদ্দীপনা। 'ঐকতান' কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ অস্পৃশ্যতার অর্থেই লোকায়তে জনগণের যোগ্য কবিকে 'এসো কবি' বলে আহ্বান জানালেন।

সমকালের বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হয় কেন 'বিদ্রোহী' প্রকাশের বিশেষ লগ্ন থেকে নজরুলকেই রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে নবীকৃত মর্যাদায় ভূষিত করলেন। একদিকে 'কল্লোল' 'ক বিচিত্রা' ও 'প্রগতি' মনোবৃত্তিক 'কল্লোলের চিঠি'। কোনও গোষ্ঠীকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন, সাহিত্য ও কর্মসাধনার সুযোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করতে পারেন না।

উল্লিখিত সমকালীন দুটি প্রধান সাহিত্য গোষ্ঠীর একটিকেও কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর যথাযথ উত্তরসাধকরূপে গ্রহণ করতে পারেননি, তার ব্যাখ্যা বিস্তৃত-আলোচনা নয়, তবে কিঞ্চিৎ পরিসরসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে তাঁর পরবর্তী অভিভাবকরূপে প্রমথ চৌধুরীকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন, সবুজপত্র প্রকাশনার (১৯১৪) দিন সেই অভিপ্রায়েরই রূপায়ণ প্রচেষ্টা। সার্থক ভূমিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথই স্বয়ং। 'সবুজপত্র' একটি লেখক গোষ্ঠী তৈরিতে ভূমিকাও নিয়েছিল। যেমনটি চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু বছর সাতেকের ভিতর 'সবুজপত্র' সম্পাদক যদি মিটিয়ে ক্রমশ প্রাকৃতিক ও সাহিত্যিক বিশীর্ণতার দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লব ও সেই বিপ্লবোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বিশ্বসাহিত্যে তার প্রতিফলন একটি নবোত্থিত চেতনার

রবীন্দ্রনাথের ক্রমিক উত্তরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রকাশলগ্নেই রবীন্দ্রনাথ চিনে নিতে পেরেছেন তাঁর বহু-প্রতীক্ষিত 'আগত রাতের কবি' কে?

বস্তুত, অনেকের কাছে অপ্রত্যাশিত ও আপাতঅপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও অভ্যাস বিবেচনায় রবীন্দ্রোত্তর যে তিনজন কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও কম বেশি প্রাণিত করেছিলেন তাঁরা হলেন: সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দ। সময়ের সূত্র ধরলে, অগ্রজ প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের ও শব্দবোধের দ্বারা, নজরুল ইসলামের সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবী দর্শনের দ্বারা এবং জীবনানন্দের অপার ও অস্থির আধুনিকতার দ্বারা কমবেশি প্রাণিত হয়েছিলেন।

তবু সবুজ একজন রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক একজন জীবনানন্দ সত্ত্বেও নজরুল একজনই নজরুল। নজরুল বিষয়ে অসংখ্য বহু বাণী ছাপার অক্ষরে নিত্য উচ্চারিত হলেও কেন এখনও নিষ্পেষিত নয়। কোথায় তাঁর প্রাণশক্তি? কোথায় তাঁর নবীন প্রেমের উৎস? কোথায় তাঁর উচ্চারণের রহস্য?

ভাষা ও সমাজ নিয়ে যাঁরা বিভিন্ন কেতাবি চর্চায় নিবেদিত অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ যাঁরা সম্ভবত দুটি বিষয়েই এমন অনেক নিগূঢ় সংবাদ রাখেন, যেগুলি যাঁদেরই একান্ত অনুশীলনের বিষয়। তাঁদের নিকট ভাষা সকলের বোধগম্য না হতেও পারে। ভাষা আর সমাজ—দুটি এলাকা জুড়েই যাঁদের কাজ তাঁদের কাছেও সর্বজনবোধ্য না হলেও অবজ্ঞাযোগ্য অবশ্যই। সেই 'সব' জন, যাঁরা এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হলেও কিছু কৌতূহল, কিছু জিজ্ঞাসা পোষণ করেন।

ভাষা ও সমাজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন চর্চার বিষয়ই নয়। কিন্তু সকলেই জানেন, [illegible] জগতে অনেক শব্দেরই বিভিন্ন [illegible] নির্দেশ করবার ছলে।

ভাষা নিয়ে মানুষের [illegible] এমন [illegible] জানেন, ভাষা [illegible] ও বৈশিষ্ট্য [illegible]। মানুষের ভাষা, চিন্তার ভাষা, সুখের ভাষা, দুঃখের ভাষা—প্রক্রিয়া ও ব্যবহার অনুসারে ভাষার নানা ধরন আছে। যেমন, যেখানে বা [illegible] করছি, তাঁকে চিন্তা করতে গেলেই [illegible]। একটি শব্দ থেকেও বেশি পরিবর্তন ঘটে যায়, অথবা [illegible] একই জায়গায় স্থির থাকে না। আমরা সেই কথাটি (অর্থাৎ শব্দটা) যখন তাদের অনুবাদ করি। একেবারে অনুবাদই হোক। তার [illegible] এবং একটি অর্থও শেষ পর্যন্ত আসে যায়। সেই [illegible] গড়ে ওঠে, হয়ে পড়ে বিকৃত। অবশেষে [illegible] অনুবাদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই যেতে হয়।

এইভাবে প্রথম অনুবাদ থেকে দ্বিতীয় [illegible] যেন [illegible] যায়। কয়টা ধাপ কী হবে, তার অনুপুঙ্খ গবেষণা করতে পারেন [illegible] ভাষাবিজ্ঞানী। ব্যক্তিগত [illegible] সাহিত্যসৃষ্টির [illegible] 'ব্যক্তিগত' [illegible] সাহিত্যের [illegible] পাশাপাশি ভাষা ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞান [illegible] মনোবিজ্ঞানের [illegible] প্রকৃতি হয়ে ওঠে।

সাহিত্য 'পাঠের' প্রধান এলাকা। 'ব্যক্তিগত' এলাকা পাঠের কথাও। কিন্তু সে সবই অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের কথা। কেননা, মুদ্রণ শিল্পের [illegible] অপেক্ষাকৃত আধুনিক অভিজ্ঞতা।

সাম্প্রতিক কবি এবং পাঠক-সমালোচক কবিতার সৃষ্টি ও আস্বাদন [illegible] মুদ্রণশিল্পের বাইরের [illegible] সহজে ভাবতে না পারলেও [illegible] মুদ্রণ যুগের সৃষ্টি ও পাঠ যে অন্যরকমই ছিল। স্মৃতি ছিল [illegible]। বিশেষ সামাজিক প্রক্রিয়া। এমনকি পুঁথির যুগেও, [illegible] পর্বে ব্যক্তিগত নিভৃত পাঠ ছিল বিরল ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। [illegible] ও [illegible] পাঠের [illegible] কোনটি তাল, কোনটি ছন্দ অথবা কোন শব্দটি উচ্চারণ ও আস্বাদনের ক্ষেত্রে শ্রেয়, তা নিয়ে তর্ক আছে, [illegible] সন্দেহ। তবুও, কোনও বিদগ্ধ ও বিচক্ষণ সমালোচক এ-রকম [illegible] পারেন, এ-রকম অভিমত পোষণ করতেই পারেন যে, "মুদ্রণ শিল্প [illegible] সাহিত্যিক অনুভবের সম্পর্ককে ধোঁয়াটে করার ক্ষেত্রে [illegible] দায়ী। [illegible] এই সূত্র ধরে বলেছেন, "[illegible] বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আছে। [illegible] শতাব্দী মুদ্রিত পৃষ্ঠায় [illegible]। কবিতার অন্তর্নিহিত সাংগীতিক [illegible] শুধুই [illegible] অবজ্ঞার কারণে [illegible] বিবর্ণ, [illegible], [illegible] হয়ে যায়।"

[illegible] তাঁর [illegible] একটি [illegible] ও [illegible] স্মরণ করেছেন, যা আমাদের প্রাথমিক [illegible] সমৃদ্ধ করতে পারে—ঠিক যুগের [illegible] পর্যন্ত, আমাদের [illegible] তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতেও গদ্য ও পদ্যের একক ও নিভৃত পাঠের [illegible] তৈরি হয়নি, গদ্য ও পদ্যপাঠ [illegible] ও [illegible]।

প্রাচীন সাহিত্যপাঠে নীরব পাঠের [illegible] বিরল দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায় অগাস্টিনের কনফেশনস্-এ একটি অংশ থেকে—সে তার গুরু অ্যামব্রোজকে একেবারেই নীরবে পড়তে দেখে [illegible], কেননা অ্যামব্রোজ তাঁর [illegible] সামগ্রিক [illegible] পাঠ করেন এবং [illegible] একদিন এরকম দেখা গেছে, বইয়ের পাতায় নীরবে তিনি তাঁর চোখ বুলিয়ে চলেছেন। এর কী অভিপ্রায়—তাঁর কাছে ও কিছু গুপ্ত ও নিভৃত। [illegible] বইয়ের এত বড়ো [illegible] নীরবে পড়া হল, তার [illegible] কারণ [illegible]। 'কনফেশনস্' থেকে উদ্ধৃত অংশ পুনরুদ্ধার করি—

His eyes scanned the pages, but his voice and tongue were silent ....whatever the reason, no doubt it was a good one in such a man.

[illegible] ও ইংরেজ [illegible] ভারতবর্ষে [illegible] আজই [illegible] মূল্য রয়ে। তার বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসেই এ মুদ্রণশিল্প কতটা [illegible], [illegible], মানুষের [illegible] ভাষা, [illegible] কত প্রকার বহু ভাবে, কে তা বলতে পেরেছে। কিন্তু এ নিয়ে তো তর্কের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই যে, মানুষের [illegible] অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থে 'মানুষের সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা' অথবা মানুষের [illegible]। কিন্তু সংসারে সাংস্কৃতিক জীবন শুধু মানুষেরই থাকে। কেন না শুধু মানুষেরই আছে মানসিক জীবন।

এই মানসিক জীবনের বৈশিষ্ট্যকেই আমাদের নজরুল [illegible] সার্থকভাবেই দেখায়। তাঁর জীবনকাল ১৮৯৯-১৯৭৬ [illegible] কিন্তু [illegible] কর্মময় জীবনের সময়সীমা ১৯১৯-১৯৪১ দীর্ঘ ছিল না। এই বাইশটি বছরের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার [illegible] উন্মোচিত হতে পেরেছিল। আরও একটি সহজ সরল তথ্য মনে রাখা দরকার। এই বাইশটি বছরের অধিকাংশ জুড়ে অবিভক্ত বঙ্গ ও ভারত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণের শিকার। [illegible], সেই শাসন ও শোষণ পর্বের সূচনা আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ থেকে এবং আনুষ্ঠানিক অবসান ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে।

শৈশবেই [illegible], প্রতিকূল জীবনের বিরুদ্ধে নজরুলকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল [illegible] এক ভয়ঙ্কর অসম যুদ্ধে। [illegible] ১৯০৮ সালে পিতার মৃত্যুর পরে। নয় বছরের শিশু নজরুল এই পারিবারিক সংকটকালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত হলেন, [illegible] তাঁর জীবনে [illegible] না, তাঁর [illegible] সৃজনশীল [illegible] প্রত্যাশিত আনুকূল্য খুঁজে পেল না।

মক্তবের শিক্ষা শেষ করে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে যখন তাঁর পড়ার কথা, তখন তাঁকে [illegible] মক্তবেই [illegible] শিক্ষকতার কাজ করতে। ধারাবাহিক কোনও ছাত্রজীবনও পাননি তিনি। অর্থোপার্জনের জন্য নানা রকম কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। গ্রামে গ্রামে [illegible], বাজারে [illegible], [illegible] এই সবই তাঁকে করতে হয়েছে [illegible]। নজরুল [illegible] ছিলেন না, পারিবারিক আর্থিক [illegible] সমাধানের চেষ্টায় সুখ-শান্তি-বিলাস সবকিছু ভুলে নজরুলের যে [illegible] সৈনিকের [illegible] শুরু হয়েছিল, তাঁর পরবর্তী জীবনের [illegible] এবং [illegible] বিপন্ন মানুষের জন্য সেই একটি আবেগময় [illegible] ও [illegible] অর্থময় [illegible]। এই [illegible] ও [illegible] মানবতাবাদী নজরুলের লেখাগুলি ও [illegible] [illegible] অনুপ্রাণিত [illegible]।

[illegible] থেকেই তাঁকে সমস্ত পরিবারের [illegible] জন্য [illegible] [illegible] [illegible] 'ব্রেকিং [illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] করেছেন। [illegible]

পীড়নের বৈষম্য বা সাম্রাজ্যবাদের পরে, কীর্তন, কথকতা, যাত্রা, জিকির মহ্ফিল তথা ভক্তিমূলক লোকায়ত গানের আসর। বিশেষত ত্রিশের দশকের রবীন্দ্রোত্তর, ভিক্টোরিয়ান আধুনিক বিশ্বের বোধের পক্ষে নিঃসঙ্গতা তথা আধুনিক অর্থে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভক্তি, মুক্তি, ইত্যাদি তথা কবিতার সাধকদের পরম্পরা ও অবলোকন প্রেরণা সত্তার এক কথায়, যে সম্মিলিত বিচিত্র ধারা কবিতাকে বাংলা গান হয়ে উঠিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—সেই বিচিত্র সম্ভার ফেলেফেলাতেই সমৃদ্ধ হয়েছিল নজরুলের।

অপরাপর উৎস থেকেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের তফাৎ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। তবুও জীবনানন্দের অনুভবে এসেছিল। অন্যদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেন থেকে বলা যেতে পারে যেমন লেখার হলে না যে, লোকায়ত ঐতিহ্যের সূত্রে নজরুলের ভারতীয় সমন্বয়ের সঙ্গে যে অর্থে, সেই অর্থে রামপ্রসাদ ও লালনের সঙ্গেও নজরুলের আত্মীয়তা অকাট্য ভাবেই বাংলার সুফল পাবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবল প্রভাবের ভিতরেও কিছু আত্মমগ্ন বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের লোকায়ত ধারাকে অর্থাৎ মূল ধারাটিকেই প্রতিষ্ঠা, দ্বিধাহীন ভাবেই বলা যায়, নজরুল এবং সম্ভবত আধুনিক এই উপমহাদেশে একমাত্র নজরুলই।

তাঁর কবিতা, কথাসাহিত্য ও অন্যান্য গদ্যরচনা (সাংবাদিক রচনাসহ) নিতান্ত, তাঁর ও একক পাঠ্যের প্রকাশকালে বিচার নয় হয়তো, বরং সেগুলি সংকলন করিয়েছেন কোথাও। তাঁর গানগুলির মূল্যবোধই সম্ভবত 'অসামান্য' বলে উপস্থাপনযোগ্য। বস্তুত, নজরুলের গান ও কবিতার মূল্যবোধ গান-কবিতা। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই সুরসংযোগে অনুকেই 'গান' হয়ে ওঠে, আর কোনও আধুনিক কবির পক্ষেই এই কথা একচুলও খাটে না। তবু বিদগ্ধজনদের 'আলোচনা' প্রসঙ্গে 'গানে'র ক্ষতি অপূরণ পর্যন্ত প্রযোজ্য।

নজরুলের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা ও অসাম্প্রদায়িক লোকায়ত। তাই নজরুল সাহিত্যের আস্বাদন পদ্ধতিও হওয়া উচিত লোকায়ত।

এখন যদি বলা যায়, নজরুল সাহিত্যের মূল্যায়ন যে ভাবে হয়ে এসেছে, সেই পদ্ধতি ভুলত ভুল? সেইজন্যই নজরুল এ পর্যন্ত ভুলভাবে বিশ্লিষ্ট ও প্রশংসিত হয়ে এসেছেন? রবীন্দ্রোত্তর অন্যান্য আধুনিক বাঙালি কবিদের সঙ্গে তাঁর মিল যতটা, অমিল তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

এ কথা কি ঐতিহাসিক ভাবেই সত্য নয় যে আধুনিকতা এক অর্থে 'অভ্যাস'। আমাদের মতে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের তিনি শ্রেষ্ঠ সমালোচক, সেই জীবনানন্দও নজরুল-মূল্যায়নে আধুনিক অভ্যাস ও অভ্যাসের শক্তিতে নিয়েও কেন লিখে বসলেন—

১.....এ রকম পরিবেশে মুক্ত শ্রেষ্ঠ কবিতা জন্মায় না কিংবা জন্মায়, কিন্তু যখন প্রতিভা ও অনুশীলিত সুস্থিরতার প্রয়োজন। নজরুলের তা ছিল না। তাই তাঁর কবিতা চমৎকার কিন্তু মহোত্তীর্ণ নয়।

২.....তিনি অনেক সফল কবিতা উৎসারিত করতে পেরেছিলেন। কোনো কোনো কবিতায় এত বেশি সফলতা যে কঠিন সমালোচকও বলতে পারেন যে নজরুলী শব্দ এইখানে-এইখানে সার্থক হয়েছে, কিন্তু তবুও মান এড়িয়ে গিয়েছে।

৪.....কিন্তু নজরুলের আন্তরিকতা ও সময় এই বুদ্ধির্মর্যাদার হাত থেকে তাঁকে নিয়ত নিয়েছিল। আধুনিক অনেক কবিতা থেকে তাঁর কোনো কবিতার অসীমতার হাই বেশি, অনিয়ন্ত্রণের উৎকর্ষ তা কমে আসে নয়। কিন্তু নিজেদের বিশেষিত করে কোনো প্রতিভা নেই এ সব কবিতার বিষয়ে, লেখকের কোন বিধান নেই।

ঈশ্বরের চিন্তা উদ্ধৃতাংশে 'চমৎকার কিন্তু মহোত্তীর্ণ নয়', 'তবুও মান এড়িয়ে গেছে' 'নিজেদের বিশেষিত করে কোনো প্রতিভা নেই এ-সব কবিতার বিষয়ে' প্রভৃতি 'মূল্যায়ন' বা 'মূল্যায়ন পদ্ধতি' নজরুলের কবিতা প্রসঙ্গে যে কেমন খাটে না তা জানতেন জীবনানন্দ। যে কবিতা সমাজ, রাষ্ট্র ও নজরুলী সম্পর্কে অন্তত কিছুটা আলোকপাত করে জনসাধারণকে কাছে টেনেছে, নজরুলের সেই কাব্য সম্পর্কে জনসাধারণের, প্রায় নির্বিবাদ সুর বিস্ময়কর সাড়া জাগিয়েছে, তবু তিনি বিচারের বলি হয়েছেন, "আমাদের কবিতা বিশেষ একটি সময়ের মেলা ধরে অতীতের বিষয়ে পরিণত। ... সব নিয়মকানুন তৌল করে নিতে শিল্পী বসে রয়েছেন।"

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে আমাদের সর্বাধিক শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা, জীবনানন্দ, তবু নজরুল মূল্যায়নেও তাঁর দুর্বল প্রতিপত্তির কথা নয়। (নজরুলের কয়েকটি কবিতা প্রসঙ্গে যখন জীবনানন্দ বলেন, "ভালো ভাব ও বিষয়ের আদর্শ সৌন্দর্য রয়েছে এই কবিতাগুলোর বিষয়। প্রেম, প্রকৃতি, ভাব ছেড়েও বরং অনেক বেশি কাছে প্রেম ও নবীন সমাজ প্রেম বাংলা কাব্যে নজরুলের আবির্ভাবের মুহূর্তে যে দুরন্ত সম্ভাবনা দেখেছিল, তিনি তা প্রৌঢ়ত্বেরই উৎসবে উৎসবে উজাড় দিয়ে গেছেন। তবে নিয়েও তার কোনও কোনও কবিতা প্রসঙ্গে আমার প্রতিবাদ স্পষ্ট ও সুস্পষ্ট। নজরুলের কবিতার জীবনানন্দ নির্দেশিত শৈলাকাঙ্ক্ষাগুলি বুদ্ধিবিলাসের যে প্রক্রিয়ায় প্রবণতাপথে হবে পারেন, সেই মাপকাঠিটিই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

বস্তুত, 'অগ্নিবীণা'র কবিতাগুলি এবং জীবনানন্দ প্রভৃতির অন্যান্য কবিতার লোকশ্রুতি অনুরণনসূত্র স্মরণ রেখেও বলতে হবে, নজরুলের চিন্তনের গভীর আর তাঁর মূল্যবোধের গভীরতা থেকে জীবনানন্দের মতো বিষয়ে অপ্রকাশিতের বা মনোবিকলনের নতুন সত্তা খুঁজে পাওয়ায় চৈতন্য ও বর্তমানের সংবাদ অতি-আধুনিক একজন কবি স্বতন্ত্র হয়।

নজরুল ত্রিশের উপনিবেশের কবিতাতেই অন্তত পীড়নকর কবিতার অনুশীলন শেষ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, জীবনানন্দ অতীতের উত্তরকালের তাৎপর্যপূর্ণ এক সময় প্রায় কলকাতার শহরের আবহাওয়া নাগরিকতার ক্লান্তি, গ্লানি ও হতাশার পুনরুত্থানের সন্ধানে আত্মগোপনের সমুদ্রিত।

তথাপি, নজরুল যে-অর্থে লোকায়ত, আধুনিক পাশ্চাত্য কর্মবিভাজন ও সাম্প্রতিকতা-অভিমুখী জীবনানন্দ ততটুকুই হয় বাংলাদেশ থেকে; নজরুলের চেতনায় প্রোথিত উপমহাদেশ বিচিত্রপানি থেকে জীবনানন্দের 'ভোর' কবিতাটির পুরো সত্তা রোমান্সের এবং সার্বভৌম মনোবিকলনের প্রধান তিন বিজ্ঞানী ফ্রয়েড, ইয়ুং আর উটি। নজরুলের মধ্যে দুর্বিপাক ও মানবতার সত্তাদের কাছে কঠিন ক্রিয়া-বিক্রিয়া হয়ে থাকে না, একজনের একসূত্রে কাজ করেও উৎসারিত হয়। ব্যক্তিকতার, বিদ্রোহ, অনুভবে ও সক্রিয়তার কোনও ভেদরেখা থাকে না বলেই উচ্চারণ হয় খাঁটি, ও দ্বিধাহীন, উক্ত আশায় জাগরণও উদ্দীপ্ত হয় কবিতায়। এই হলেন নজরুল আর সেজন্য প্রতিটি উচ্চারণই কবির থেকে হন নজরুল। প্রেম ও প্রাণ সত্তায় সেই সুন্দরী নীড়ের অপর নাম, নজরুল ইসলাম।

নজরুল বাল্যকালে গান লিখেছেন ও গান গেয়েছেন, [illegible] তিনি [illegible] লিখেছেন ও অভিনয় করেছেন।—এ তো আমরা [illegible] সকলেই জেনে গেছি। কিন্তু সকলেই হয়তো জানেন না যে, তিনি ছিলেন [illegible] প্রতিভাসম্পন্ন। ১৯১৪ সালে নজরুল ছিলেন [illegible] বিদ্যালয়ের ছাত্র। সেখানকার ইংরেজির শিক্ষক [illegible] পরিচালিত একটি [illegible] অনুষ্ঠানে নজরুল রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' ও 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতা দুটি আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মুগ্ধ ও অভিভূত করে দিয়েছিলেন। পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান যে অধিকার করতেন, [illegible] এই সময়ে তিনি তাও [illegible] পারতেন।

[illegible] থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়ার সময় নজরুল কী রকম ছাত্র ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় সহপাঠী বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখায়—

"[illegible] পড়ায় খুব ভালো ছেলে নজরুল। প্রতি বছর ফার্স্ট হয়ে [illegible] পায়……হাঁ, খুব ভালো ছেলে। তখন প্রমোশন পেয়ে দুটি ক্লাস ডিঙিয়ে একেবারে সেকেন্ড ক্লাসে উঠে এসেছে।"

এই সময়েই তাঁর জীবনে আরও দু-একটি এমন ঘটনা ঘটে যার —যে ভূমিকা নজরুল ইসলামের [illegible] জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। [illegible] বিপ্লবী [illegible] সঙ্গে যুক্ত তাঁর শিক্ষক [illegible] সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নিবারণচন্দ্রের প্রভাবে নজরুল বিপ্লববাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। বিপ্লব ও বিপ্লবীদের প্রতি গভীর [illegible] ও সক্রিয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা এই সময় থেকেই নজরুল মনে সঞ্চারিত হয়।

এই সময়েই বিদ্যালয় থেকে [illegible] নজরুল কবিতার অভিনন্দনপত্র রচনা করেন। এই সময়েই তাঁর বন্ধু শৈলজানন্দ তাঁর [illegible] একটি [illegible] উপহার পেয়েছিলেন। সেই [illegible] নিয়ে [illegible] ইংরেজি [illegible] নজরুল। 'ভাঙার গান' আর 'প্রলয় নাচ' নামে দুটি কবিতা লিখেছিলেন নজরুল এই সময়ে। [illegible] একটি [illegible] তিনি। [illegible] খুলে একই [illegible] কাজ করে [illegible]। [illegible] একটি [illegible] তিনি [illegible] নজরুলের 'মধুবী' [illegible] নামক কবিতাটিও তাঁর [illegible]। [illegible] নজরুলের [illegible] কথা [illegible]। নজরুলের [illegible] বিশেষ [illegible] তাঁর [illegible] পরবর্তী সময়ের [illegible]।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে নজরুল দশম শ্রেণীর ছাত্র। প্রি-টেস্ট পরীক্ষা চলছে। তিনি [illegible] ছাত্র [illegible] প্রথম মহাযুদ্ধকালে ইংরেজ আর জার্মানির [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে ভয়ংকর যুদ্ধে। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী [illegible] বিভিন্ন কারণে [illegible] ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন [illegible] বাঙালি সেনাদের নিয়ে বাঙালি পল্টনের দাবি জোরালো হয়ে উঠল। অবশেষে বাঙালি পল্টন গঠিত হল। নজরুল ও শৈলজানন্দ সেনাবাহিনীতে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষায় নজরুলই উত্তীর্ণ হন। নজরুলের 'ব্যথার দান' ও 'বাঁধনহারা' গ্রন্থে [illegible] নজরুলের সেনাবাহিনীতে যোগদানের [illegible] মিলিয়ে আছে।

নজরুলের সৈনিকজীবন যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য [illegible] নয়, [illegible] নজরুলকে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে [illegible] হয়নি। কিন্তু করাচির সেনানিবাস নানাভাবে হয়ে উঠেছিল নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের প্রস্তুতি পর্ব—যেখানে নজরুলের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর [illegible] ও [illegible] সহজ হয়ে উঠেছিল। তার [illegible] পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নিজের জবানিতেই—

"আমি তখন [illegible] যুদ্ধে গেছি সে আজ ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানেই আমার [illegible] সঙ্গে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলবী থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমন মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকে তাঁর কাছে ফার্সি শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত কাব্যই পড়ে ফেলি।"

তাছাড়া কলকাতার সাহিত্য জগতের সঙ্গে নজরুল করাচি সেনানিবাস থেকে [illegible] যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। তিনি কলকাতার উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকাগুলির গ্রাহক ছিলেন। 'সওগাত' পত্রিকার গ্রাহক তিনি প্রথম থেকেই। পত্রিকাটির কিছু [illegible] তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। খুব সম্ভবত এই সময়ে 'উপাসনা' মাসিক পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ঘটে।

সবচেয়ে বড় কথা, করাচী সেনানিবাস থেকে পত্রযোগে তিনি এমন দু-জন সাহিত্যবন্ধুকে লাভ করেছিলেন যাঁরা তাঁকে চোখে না দেখেই নিছক তাঁর রচনাপাঠের ভিত্তিতেই তাঁকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের [illegible] কলকাতা শহরের প্রথম সারির বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে এমনভাবে পরিচিত করে দিয়েছিলেন যাতে বলা যায় কলকাতায় পদক্ষেপ করার আগেই সেখানে নজরুলের কলকাতা-কেন্দ্রিক [illegible] সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু নজরুলের কবিজীবনের সে আর এক পর্ব। সেই সময়ের নজরুল রবীন্দ্রনাথের ভাষাই বলতে পারতেন—

'মানুষ শুধু কবিই নয়, সে কবিও'।

কিন্তু সে-সব কথা আজ নজরুল অনুরাগী মাত্রেরই জানা কথা। এখানে শুধু করি নজরুলের [illegible] সেনাবাহিনী।

সাংবাদিক নজরুল

অঞ্জন বেরা

শতবর্ষে শতমুখেই কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর প্রতিভার নানা দিক নিয়ে আলোচনা-পুনরালোচনা, মূল্যায়ন-পুনর্মূল্যায়নে জোর পড়েছে। নতুন করে মনে জাগছে সেই অনিন্দ্য প্রতিভাধর মানুষটিকে। আর সেই দেখায়, সঙ্গত প্রায় সবটা জুড়ে থাকবে কবি নজরুল বা সঙ্গীতকার নজরুল। নিজের সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে নজরুল একবার বলেছিলেন তাঁর সঙ্গীতের কথা। বলেছিলেন, তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর গানের জন্য। এ ছিল কবির নিজস্ব মূল্যায়ন, যা সবসময় সবার কাছে সঠিক হবে এমন মনে করা যায় না। তাই নজরুলকে কখনই শুধুমাত্র তাঁর কবিতা ও গানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নজরুলকে জানতে ও বুঝতে হলে তাঁর সাংবাদিকতাকেও বাদ দেওয়া যায় না। নজরুল-মানসের গতিপ্রকৃতি ও বিকাশ অনুধাবন করতে হলে সাংবাদিকতায় তাঁর আগ্রহ এবং অবদান না-বুঝলে চলবে না। তাঁর জীবনে সাংবাদিকতা কোনও প্রক্ষিপ্ত পর্ব বা তাৎপর্যহীন সময়যাপন ছিল না। সাংবাদিকতা তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রগুলিকেও প্রভাবিত করেছে। এমনকি নজরুলের কবিতা ও সঙ্গীতকেও অনেক ক্ষেত্রে অনুধাবন করতে গেলে সাংবাদিকতায় তাঁর অংশগ্রহণকে না-বুঝলে চলে না।

এ প্রসঙ্গে বিশদে যাবার আগে গোড়াতেই একটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। সক্রিয় জীবনে যে সাতটি প্রকাশনার সঙ্গে নজরুল হাতে-কলমে যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে মাত্র একটি বাদে, সবকটিই ছিল সংবাদপত্র। মানে, খবর সংবাদভিত্তিক প্রকাশনা। ব্যতিক্রমী ওই একটি কাগজ ছিল 'সওগাত'। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের 'সওগাত' ছিল সাহিত্য-পত্রিকা।

আমরা সবাই জানি, ১৯৭৬ সালে মারা গেলেও নজরুলের সক্রিয় জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে। তারপর থেকে অসুস্থতার পরিণামে পেয়ে বাকরুদ্ধ কবি ছিলেন জীবন্মৃত।

১৯১৯ সালে নজরুল যখন বেঙ্গলি রেজিমেন্টের সৈনিক (বয়স তখন মাত্র কুড়ি) তখনই হাবিলদার থাকতে নজরুলের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় নাসিরউদ্দিনের মাসিক পত্রিকা 'সওগাত'-এ। সেটি ছিল 'সওগাত'-এর প্রথম পর্যায়। পরবর্তীকালে 'সওগাত' সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। নজরুলের মুদ্রিত প্রথম লেখাটি ছিল গল্প—'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী'। প্রকাশিত হয় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। নজরুলের মুদ্রিত দ্বিতীয় লেখাটি ছিল একটি কবিতা—'মুক্তি'। ছাপা হয়েছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' পত্রিকায়। তখন সেই পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমেদ (১৮৮৯-১৯৭৩)। মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে নজরুল ইসলামের সম্পর্কের সূচনাও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় লেখালেখির সূত্রেই। যে সম্পর্কের বিশেষ তাৎপর্য ছিল নজরুলের সাংবাদিক জীবনে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মিটে যাবার পর বেঙ্গলি রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন ১৯২০ সালের মার্চ। মুজফ্‌ফর

নজরুল সম্পাদিত ধূমকেতু পত্রিকার দপ্তর, ৩২ কলেজ স্ট্রিট

আহমদের ভাষায় 'আমাদের দেশ তখন টগবগ করে ফুটছে।' কলকাতায় আসার পর নজরুল ক্রমশ যুক্ত হয়ে পড়েন লেখালেখির সঙ্গে। মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার অফিস (৩২, কলেজ স্ট্রিট) তখন তাঁর কলকাতার ঠিকানা। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নজরুল যুক্ত হয়ে পড়েন সাংবাদিকতায়।

সাংবাদিকতায় নজরুলের জড়িয়ে পড়ার এই ছিল পশ্চাৎপট। একটি জিনিস লক্ষ করার মতো যে, মূলত বিশের দশকেই নজরুল সাংবাদিকতাকে পুষ্ট করেছিলেন। বিশের দশকের একেবারে শেষ দিক থেকে পরবর্তী দশ-এগারো বছর নজরুল মূলত সঙ্গীতকার। শুধু সংগীত নয়, আকাশবাণী, গ্রামোফোন কোম্পানি, চলচ্চিত্রে অভিনয় ও সংগীত পরিচালনার ভূমিকাতেই তখন তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে যে বিদ্রোহী-কবি বাংলা কাব্যজগতকে আলোড়িত করে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সেই নজরুল তিরিশের দশকে অনেকটাই ম্লান, স্তিমিত।

একথা নজরুল নিজেও একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন চিঠিপত্রে পরিষ্কার লিখেছেন। তবুও, আমরা দেখছি, ১৯৪১ সালের অক্টোবরে আবার একবার নজরুল যুক্ত হলেন সাংবাদিকতায়, 'নবযুগ'-এর সম্পাদনায়। যদিও মাত্র কয়েক মাসের জন্য; কেননা, ১৯৪২-এর জুলাই মাসেই কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

বিশের দশকে নজরুল যখন সাংবাদিকতায় জড়িয়ে পড়েন তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক তাৎপর্যপূর্ণ বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। তা ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তসহ সমাজের বিভিন্ন অংশে। বিশের দশক শুরুই হয় গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। উল্লেখযোগ্য শ্রমিক শ্রেণির সংগঠিত উত্থানও। একটি সূত্রে মার্কসবাদী চেতনারও প্রসার শুরু হয় এদেশে, এই দশকেই। ১৯২০ সালে তাসখন্দে, অর্থাৎ বিদেশে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করলেন, তার প্রভাব ক্রমশ দেশের মাটিতেও ছড়িয়ে পড়ছিল। ১৯২৫ সালে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার দায়ে মুজফ্‌ফর আহমদ, শওকত উসমানী, ডাঙ্গে প্রমুখ কারারুদ্ধ হন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সমস্ত কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে উঠেছিল। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে এই গ্রুপগুলি কানপুর শহরে এক সম্মেলনে মিলিত হন সেটাই ছিল এদেশে প্রথম প্রকাশ্য কমিউনিস্ট সম্মেলন। বিশের দশকের গোড়া থেকেই কমিউনিস্টরা দাবি তুলেছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার। 'স্বরাজ' ও 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' অর্থ পার হয়ে নতুন মতাদর্শের আহ্বান প্রকাশিত করতে শুরু করেছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে। এবং বাংলা প্রদেশ ছিল তার অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। অন্যতম কেন্দ্র।

এই রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি প্রভাবিত করেছিল সাংবাদিকতাকেও। বিশেষত বাংলা সংবাদপত্রকে। রাজনৈতিক সাংবাদিকতা বলতে যা বোঝায় তা যুদ্ধ—পরবর্তী সময়েই, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক নতুন মাত্রা পায়। এই প্রেক্ষাপটে, নজরুলের মতো একজন সচেতন কবি-লেখক যে সাংবাদিকতায় যুক্ত হয়ে পড়বেন তাগিদ অনুভব করবেন এতে আর আশ্চর্যের কী থাকতে পারে! বলা যেতে পারে যে, সময়ের স্বাভাবিক টানেই নজরুল সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে মুক্তি-সংগ্রামে প্রকাশ করার ভাষা খুঁজতে চেষ্টা করেছিলেন। এবং এ কাজে একেবারে গোড়া থেকেই তিনি পেয়েছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদের মতো একজনকে যাঁর সাহচর্য নজরুলকে নানাভাবে উপকৃত করেছিল।

সাংবাদিকতায় নজরুলের হাতেখড়ি সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এ। ১৯২০ সালের ১২ জুলাই কলকাতার ৬ টার্নার স্ট্রিট থেকে তৎকালীন খিলাফত নেতা এ কে ফজলুল হকের মালিকানায় 'নবযুগ' প্রকাশিত হয়। 'নবযুগ' প্রকাশিত হয় নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহমদের যুগ্ম সম্পাদনায়। 'নবযুগ'-এ শুধু নজরুল নয় মুজফ্‌ফর আহমদেরও সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। মুজফ্‌ফর আহমদ তখনও কমিউনিস্ট নন। ১৯২১-এই শেষদিক থেকে মুজফ্‌ফর আহমদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদে আকৃষ্ট হন।

তবে নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহমদ সম্পাদিত সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' সেই সময়েই কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলার কথা বলেছিল। বাংলার শ্রমিক কৃষকদের সমস্যা নিয়ে লেখালেখি প্রথম

৮. টার্নার স্ট্রিট 'নবযুগ' পত্রিকার অফিস

প্রকাশিত হয় 'নবযুগ'-এ। পরবর্তীকালে মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন, "...দেশ যে আন্দোলন তখন চলেছিল তারই প্রভাবে নিজেই আমরা সেদিকে ঝুঁকে পড়েছিলেম। কোনও মত তখনও আমাদের মনে স্থির হয়ে মূর্ত হয়ে ওঠেনি। তবে আমরা মজুরদের কথা, কৃষকদের কথা লিখছিলেম। অভিজ্ঞতা হতেই সেসব লিখতাম। আমার মনে হয় এইসব লেখা হতেই পড়াশুনা করে কিছু বোঝার বাসনা আমার মনে জেগেছিল।" 'নবযুগ'-এ নজরুলের সাংবাদিকতা-দক্ষতার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। তাঁর অনায়াস লিখনভঙ্গী, সাবলীল দৃপ্ত গদ্য, শিরোনাম দেবার কৌশল 'নবযুগ'-কে অচিরেই জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

সেই ১৯২০ সালেই নজরুল 'নবযুগ'-এ লিখেছিলেন এমন সব লেখা তাতে পরবর্তীকালের 'বিদ্রোহী'-র কবিকে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, 'নবযুগ'-এ নজরুল লিখেছিলেন—"আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহাযুগের মহাউদ্বোধন। আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদ সাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব-মুক্তি-কাঙ্ক্ষা বেশ। ঐ শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙ্গিবে। ঐ শোনো ইসরাফিলের শিঙ্গায় নবসৃষ্টির উদ্বোধন-মহাবোল! ...আজ নারায়ণ মানব। তাঁহার হাতে স্বাধীনতার বাঁশি।"

এ রচনা যেন একেবারে 'বিদ্রোহী' কবিতার ('বিজলী', ৬ জানুয়ারি ১৯২২) পদধ্বনি।

'নবযুগ'-এ নজরুল 'ধর্মঘট' নিয়েও লিখেছিলেন—"...ধর্মঘটের আগুন এখন দাউদাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয়। কেননা ভারতের এই পতিত উপেক্ষিত নিপীড়িত হতভাগ্য এত কাঁদিয়াও যেন জাগিয়াছে, এ দেশেও মানুষের মনুষ্যত্বের অনুভব সকলেই করিতেছেন।"

স্বভাবতই এরকম একটি কাগজকে ব্রিটিশ সরকার বেশিদিন সহ্য করতে চায়নি। একাধিকবার কাগজের জামিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

এ সময়েই একবার জামানত জমা দেওয়া নিয়ে 'নবযুগ'-এর মালিক ফজলুল হকের সঙ্গে নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদের মতপার্থক্য তৈরি হয়। মতপার্থক্যের মূলে ছিল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে 'নবযুগ' ছেড়ে দেন নজরুল। তার কিছুদিন পর মুজফ্ফর আহমদ। সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' সেই সময়কার মতো বন্ধ হয়ে যায়।

'নবযুগ'-পরবর্তী সময়ে নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদ যৌথভাবে একটি দৈনিকপত্র প্রকাশের কথা ভেবেছিলেন। সেটা ছিল ১৯২১ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি ঘটনা। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তখন আরও জটিল হয়ে উঠছিল। ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারিতে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। দেশের মধ্যে, বিশেষত বাংলায় তখন মুজফ্ফর আহমদ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। যদিও তার সঙ্গে নজরুল যুক্ত ছিলেন না।

এরকম পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই নজরুল প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত কাগজ 'ধূমকেতু'। ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট। তবে ধূমকেতু বের করার ঠিক আগে কিছুদিনের জন্য নজরুল মোহাম্মদ আকরম খাঁর দৈনিক 'সেবক'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আকরম খাঁ ছিলেন তখন খিলাফত আন্দোলনের নেতা। পরবর্তীকালে এঁরই প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সভাপতিও হয়েছিলেন। 'সেবক'-এ নজরুল বিশেষ স্বস্তিতে ছিলেন না। শেষপর্যন্ত, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে একটি লেখা 'সেবক'-এ কাটছাঁট করে ছাপা হলে ক্ষুব্ধ নজরুল ইস্তফা দেন। এরপরই সশস্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। তাঁর প্রভাব মধ্যে নজরুল বের করলেন 'ধূমকেতু'।

ধূমকেতু ছিল অর্ধসাপ্তাহিক। অর্থাৎ সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হত। প্রকাশক ছিলেন আফজালুল হক। কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন শান্তিপদ সিংহ। দপ্তর ছিল সেই ৩২, কলেজ স্ট্রিট। অষ্টম সংখ্যা (১২ সেপ্টেম্বর ১৯২২) থেকে অবশ্য 'ধূমকেতু'-র দপ্তর উঠে যায় পাশেই, ৭ নম্বর প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনে।

'ধূমকেতু'-র গুরুত্ব ছিল প্রথমত নজরুল এককভাবে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন। ফলে 'ধূমকেতু' ছিল নজরুলের নিজের কণ্ঠস্বর। দ্বিতীয়ত, নজরুলই সংবাদপত্রে প্রথম চলিত ভাষার ব্যবহার চালু করেন 'ধূমকেতু' মারফত। তৃতীয়ত, 'ধূমকেতু' প্রকাশের সময় নজরুল মূলত বাংলার যুক্ত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদেরদ্বারা প্রভাবিত থাকলেও এবং 'ধূমকেতু'-তে তার প্রভাব থাকলেও, বাংলার সাম্যবাদী পত্র-পত্রিকা প্রকাশের পূর্বসূরি হিসেবে 'ধূমকেতু'কেই ধরা যায়। তৎকালীন গোয়েন্দা বিভাগের গোপন কাগজপত্রে 'ধূমকেতু'-কে 'কমিউনিস্ট প্রকাশনা' হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, বাস্তবে তা ছিল না। কারণ তখন বাংলা প্রদেশে মুজফ্ফর আহমদ ছাড়া কমিউনিস্ট পত্রিকা প্রকাশের চিন্তা কারও ছিল বলে জানা যায় না। এবং মুজফ্ফর আহমদ 'ধূমকেতু'-র নীতিনির্ধারণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। নজরুল স্মৃতিকথায় বরং 'ধূমকেতু'-র সম্পাদকীয় নীতি সম্পর্কে মুজফ্ফর আহমদ সমালোচনাই করেছেন বলা যায়।

যাই হোক, ধূমকেতু প্রকাশমাত্রই পাঠকমহলে হইচই ফেলে দিয়েছিল। 'ধূমকেতু'-র প্রথম পাতাতেই লেখা হত একটি স্লোগান— "কলকাতার সব কাগজের চেয়ে বেশি কাটতি"।

[illegible]

'ধূমকেতু' রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীও পেয়েছিল। প্রথম সংখ্যা থেকেই পত্রিকার শিরোভাগে হুবহু করে ছাপা হত রবীন্দ্রনাথের পাঠানো এই আশীর্বাণী—

"কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু,
আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।"

'ধূমকেতু' সম্পর্কে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল সম্ভবত এটিই বাংলা ভাষায় প্রথম কাগজ যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল। জাতীয় নেতৃত্ব যখন 'স্বরাজ'-এর ধোঁয়াশাপূর্ণ স্লোগানের বাইরে বেরোতে পারেননি তখন 'ধূমকেতুর পথ' শীর্ষক একটি লেখায় (১৩ অক্টোবর ১৯২২) নজরুল বলেছিলেন—

"সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে গেলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।"

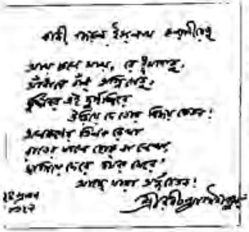

সংবাদপত্র হিসেবে 'ধূমকেতু' ছিল একটি পরিণত চিন্তা-ভাবনার ফসল। যেমন, 'ধূমকেতু'-তে পাঠক বিনোদনের জন্য বিভাগ-বিন্যাসও করেছিলেন নজরুল। যেমন, ছিল একটি বিভাগ 'সওদাগর সাহী'। এতে থাকত আন্তর্জাতিক সংবাদ। ছিল 'দুনিয়ার খবর' নামে একটি বিভাগ। 'দেশের খবর' বিভাগে দেশীয় রাজনীতির খবরাখবর। খাটিমিটিটিপুনি নামে একটি বিভাগ থাকত। ধারাবাহিক উপন্যাস সাথে প্রকাশিত হত এতে। 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' শিরোনামে ছিল মহিলাদের বিষয় সংক্রান্ত বিভাগ। রাজনৈতিক পর্যালোচনা থাকত 'যদি সম্ভবনা' শীর্ষক বিভাগে। সম্পাদককে লেখা চিঠিপত্র ছাপা হত 'ধরির পত্র' বিভাগে। এ ছাড়াও ছিল সাময়িকের খোঁচা, টিকি-টিপ্পনী, 'চানাচুর' শীর্ষক কিছু অনিয়মিত বিভাগ।

ব্রিটিশ সরকার স্বভাবতই পূর্ণ স্বাধীনতাকামী এই জনপ্রিয় কাগজটিকে পছন্দ করত না। 'ধূমকেতু'-র ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯২২) সংখ্যায় লীলা মিত্রর লেখা 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ত' নামে একটি প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক কবিতার জন্য এই সংখ্যাটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।

পত্রিকাটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করার আগেই নজরুল কুমিল্লায় তাঁদের বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিরজাসুন্দরী দেবীর নামে 'ধূমকেতু'-র স্বত্ব লিখে দেন। পুলিশ কুমিল্লা থেকেই নজরুলকে গ্রেপ্তার করে ২৩ নভেম্বর। তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল। ১৬ জানুয়ারি (১৯২৩) কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো নজরুলকে এক বছরের জন্য কারাদণ্ড দেন। ডিসেম্বর মাসে (১৯২৩) নজরুল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। লক্ষণীয়, এই কারাবাসের সময়ই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

নজরুল গ্রেপ্তার হবার পর 'ধূমকেতু' বেশিদিন চলেনি। ২৭ জানুয়ারি বেরিয়েছিল সর্বশেষ সংখ্যা।

জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তাঁর [illegible] দলে নজরুল যুক্ত হলেন। যদিও শিরোনামে থাকেন অল্প। পরবর্তীতে তাঁকে পাওয়া গেল শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'লাঙল'-এর পরিচালনায়। নজরুল ছিলেন এই দলের অন্যতম প্রধান সংগঠক। ১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর এই দলের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে প্রথম ইশতেহারটি প্রকাশিত হয়েছিল নজরুলেরই নামে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নজরুলের ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোড থেকে সাপ্তাহিক 'লাঙল' আত্মপ্রকাশ করে ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর (১ পৌষ ১৩৩২)।

কেমন কাগজ ছিল 'লাঙল'? এ ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে এটা ছিল শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র। যে দলের 'উদ্দেশ্য' হিসেবে বলা হয়েছিল— নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতালাভই এই দলের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, 'লাঙল' ছিল এই উদ্দেশ্যেরই অনুসারী।

নজরুল নামে যদিও 'লাঙল'-এর সম্পাদক ছিলেন না। সম্পাদক ছিলেন মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। নজরুল ছিলেন 'প্রধান পরিচালক'। প্রথম সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী'। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'কৃষকের গান'। তৃতীয় সংখ্যায় নজরুলের 'সব্যসাচী' কবিতা। 'ধূমকেতু'-র মতো 'লাঙল'-কেও আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ:

"জাগো জাগো বলরাম ধরো তব মরুভাঙা হল,
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।"

কিন্তু, অনেক সম্ভাবনা জাগিয়ে 'লাঙল' যাত্রা শুরু করলেও দ্বিতীয় সংখ্যা বার হবার ঠিক একমাসের মাথায় (৫ জানুয়ারি ১৯২৬) নজরুল সপরিবারে চলে যান কৃষ্ণনগরে। ফলে 'লাঙল'-এর দৈনন্দিন কাজকর্মে যুক্ত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদিও 'লাঙল'-এ তিনি লিখেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। কবিতা থেকে গদ্য সবই। শুধু 'লাঙল' নয়, 'গণবাণী'-তেও তিনি লিখেছিলেন প্রায় ধারাবাহিকভাবে।

উল্লেখ্য, নজরুল কৃষ্ণনগরে চলে যাবার একদিন আগেই মুজফ্‌ফর আহমদ কলকাতায় এসে উঠেন। উঠলেন 'লাঙল'-এর দপ্তরেই। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় সাজা ভোগের পর কলকাতায় পা দিয়ে মুজফ্‌ফর আহমদ যুক্ত হন শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ দলে এবং তার মুখপত্র 'লাঙল'-এর সঙ্গে। স্বাভাবিক এক প্রভাব পড়ে দলের নীতি ও কর্মসূচিতেও। ১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ দলের নাম বদলে হয় 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল'। নজরুল এই দলের কার্যনির্বাহকে অন্তর্ভুক্ত হন।

স্বাভাবিকভাবেই 'লাঙল'-এও মুখপত্রের আদলের রাজনৈতিক ভাবনার প্রভাব পড়তে থাকে। তবে আর্থিক অনটনে 'লাঙল' বেশিদিন প্রকাশিত হয়নি। মাত্র পনেরোটি সংখ্যা প্রকাশের পর 'লাঙল' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, শেষ সংখ্যা বেরোয় ১৯২৬ সালের ১৫ এপ্রিল। তখন কলকাতা জুড়ে চলছে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। আবার প্রয়োজন একটি কাগজের। বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের নতুন সাপ্তাহিক মুখপত্র বার করে 'গণবাণী' নামে (১২ আগস্ট ১৯২৬)। 'গণবাণী'-র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক লেখা হয়েছিল মুজফ্‌ফর আহমদেরই নাম।

'গণবাণী'র আত্মপ্রকাশের সময়ও নজরুল কৃষ্ণনগরে। ফলে সম্পাদনার কাজে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। যদিও তিনি লিখতেন। 'গণবাণী'র ২৬ আগস্ট (১৯২৬) সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল

গণবাণী পত্রিকার দপ্তর

নজরুলের লেখা দাঙ্গা-বিরোধী একটি অনবদ্য প্রবন্ধ—'মন্দির ও মসজিদ'। 'গণবাণী'র পাতাতেই ছাপা হয়েছিল নজরুলের করা আন্তর্জাতিক সংগীতের অনুবাদ।

গণবাণী শেষপর্যন্ত চলেছিল ১৯২৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে নজরুল বিশের দশকের শেষদিক থেকেই সরে যাচ্ছেন। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত শ্রমিক কৃষক দলের সর্বভারতীয় প্রথম সম্মেলনে নজরুল উপস্থিত ছিলেন। মুজফফর আহমদ স্মৃতিকথায় লিখছেন, ১৯২৯-এর মার্চে কুষ্টিয়ায় হেমন্তকুমার সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত কৃষক সম্মেলনে তিনি শেষবারের মতো নজরুলের সঙ্গে রাজনৈতিক মঞ্চে উঠেছিলেন। উল্লেখ্য, এই ১৯২৯ সালেরই ২০ মার্চের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তারা আরও অনেকের সঙ্গে মুজফফর আহমদ গ্রেফতার হয়ে যান। প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক সক্রিয়তাও এর ফলে স্তিমিত হয়ে আসে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসার প্রেক্ষাপটেই সেই পর্বে নজরুলের সাংবাদিকতা জীবনের ছেদ পড়ে।

অবশ্য, এর আগে ১৯২৭-২৮ সাল নাগাদ কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর মূলত আর্থিক অনটন লাঘব করতেই নজরুল সাপ্তাহিক 'সওগাত'-এ চাকরি নিয়েছিলেন। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন।

সাংবাদিকতায় নজরুলকে দেখা যায় এরপর ১৯৪১ সালের অক্টোবরে। প্রভাতী দৈনিক 'নবযুগ'-এর প্রধান সম্পাদকরূপে। উল্লেখ্য, ১৯৪১ সালের 'নবযুগ'-এর মালিক ছিলেন সেই ফজলুল হক। অবশ্য তখন তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক সরকারের প্রধান। সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এর সঙ্গে প্রভাতী 'নবযুগ'-এর রাজনৈতিক চরিত্রের ফারাক ছিল। হক সাহেব ১৯৪১ সালে যখন 'নবযুগ' পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ নেন তখন তাঁর মন্ত্রিসভার গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। ততদিনে মুসলিম লিগের জিন্নাপন্থী নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দিয়েছে। সে সময় লিগ ছেড়ে বেরিয়ে এসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জোট বেঁধে নতুন করে মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ নিচ্ছেন তিনি। সেই পর্বে, তাঁর রাজনৈতিক প্রচারকার্যের হাতিয়ার হিসেবে 'নবযুগ' পুনঃপ্রকাশে তিনি তৎপর হন। নজরুলকে তিনি সম্পাদনার ভার দিয়েছিলেন মূলত কবির জনপ্রিয়তা পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট করবে, এই ভেবেই।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, বিশের দশকে মুজফফর আহমদের সাহচর্যে সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রতি যে সখ্য থেকে নজরুল সাংবাদিকতায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন তার সঙ্গে ১৯৪১ সালের পরিস্থিতির কোনও মিল ছিল না। তবুও প্রভাতী 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত নজরুলের লেখাগুলি থেকে কবির দৃষ্টিভঙ্গিগত সততার স্পর্শ পাওয়া যায়। এটা ঠিকই, বিশের দশকের বিদ্রোহী কবিকে চল্লিশের সেই উত্তাল পর্বে বামপন্থী ও কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকার সংগঠকরূপে দেখাই ছিল স্বাভাবিক প্রত্যাশা; যা বাস্তবে হয়নি। তবুও স্বাধীনতার দাবিতে নির্ভীক বক্তব্য, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং শ্রমিকের অধিকার রক্ষার জন্য তাঁর দায়বদ্ধতা থেকে প্রভাতী 'নবযুগ'-এর নজরুল সরে আসেননি। তা ছাড়া, প্রভাতী 'নবযুগ'-এ বেশিদিনের জন্য আমরা তাঁকে পাইনি। ১৯৪১-এর অক্টোবরে প্রভাতী 'নবযুগ' প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুল অসুস্থ হন ১৯৪২-এর জুলাইয়ে। অর্থাৎ, খুব বেশি হলে মাস আটেক।

তবুও, নানাবিধ অপ্রাপ্তির আক্ষেপের মধ্যেও, সামগ্রিক বিচারে সাংবাদিক নজরুলের কাছ থেকে বাংলা সাংবাদিকতা পেয়েছেও অনেক। 'নবযুগ' থেকে 'নবযুগ'—তাঁর কাছে আমাদের ঋণ বাড়িয়েছে।

নজরুলের জন্মশতবর্ষের স্মরণে
তিন বিখ্যাত বাঙালি

আব্দুল অলিল

কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষ চলছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষ গত বছর শেষ হয়েছে। আর এক বিখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানাচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা কে না জানে। কিন্তু অতীতকে বাদ দিয়ে তো বর্তমানকে জানা যায় না।

বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে ১৯২৯ সালে কলকাতায় নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সভায় এই তিন মনীষীই উপস্থিত ছিলেন। নজরুল ইসলামের জন্মশতবর্ষে তিন বিখ্যাত বাঙালি স্মরণ করে তাঁদের 'সওগাত'-এর পাতা থেকে সেই দিনের সংবর্ধনা সভার পুরো অনুষ্ঠানটি পাঠকদের জন্য পরিবেশিত হল।

১৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ সাল রবিবার, দুপুর ২টায় কলকাতায় এলবার্ট হলে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কবি নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সভারম্ভের অনেক পূর্বেই এলবার্ট হল জনতায় পরিপূর্ণ, জায়গা না পেয়ে অনেককেই ফিরে যেতে হয়। সভায় বহু সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক কর্মী এবং হিন্দু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানাচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঐ সংবর্ধনা সভার সভাপতি ছিলেন। দুপুর ঠিক দুটোর সময় একখানি পুষ্পসজ্জিত চেয়ারে কবিকে সভায় আনা হয়। তিনি সভার মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনমণ্ডলী করতালি সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দন জানান। সভারম্ভে প্রসিদ্ধ গায়ক উমাপদ ভট্টাচার্য নজরুলগীতি পরিবেশন করে সভাকে মুগ্ধ করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, 'আজ বাঙলার কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য আমরা সমবেত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী প্রতিভায় বাংলাদেশ সম্মোহিত হয়ে গেছে। তাই অনেক প্রতিভা লোকচক্ষে তেমন করে ফুটতে পারছে না। আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকারের মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম। নজরুল কবি, প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কবি বলে স্বীকার করেছেন। আজ আমি এই ভেবে বিপুল আনন্দ অনুভব করছি, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানদের কবি নন। তিনি বাংলার কবি, বাঙালির কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খ্রিস্টান ছিলেন। কিন্তু বাঙালি জাতি তাঁহাকে শুধু বাঙালি রূপেই পেয়েছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কবিরা সাধারণত কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তাহা নন। কারাগারে শৃঙ্খল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যাহা লিখেছেন, তাহা বাঙালির প্রাণে এক নতুন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতার পর নজরুল সংবর্ধনা সমিতির সহ-সভাপতি মি: এস. ওয়াজেদ আলী নিম্নোক্ত অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন— 'কবি নজরুল ইসলাম করকমলেষু, কবি তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব অবদানে বাঙালিকে চির ঋণী করিয়াছ তুমি। আজ তাহাদের কৃতজ্ঞতা নিদর্শন স্বরূপ অভিনন্দন গ্রহণ কর। তোমার কবিতা বিচার বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে সে আপনার পথ রচনা করে চলিয়াছে [illegible] তোমার [illegible]। যে [illegible] বাঙালি যুগ [illegible] সিক্ত [illegible] দিয়ে গিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের [illegible] অভিনন্দন লও। বাঙলার [illegible] তোমার প্রাণের [illegible] [illegible] উঠিয়াছে। [illegible] বাঙালির [illegible] নীল নয়নে [illegible] আশা [illegible] দিয়াছে। আজ তুমি [illegible] নয়নের [illegible] গ্রহণ কর। তুমি বাঙালির ক্ষীণ কণ্ঠে তেজ দিয়াছ, মূর্চ্ছিত প্রাণে অমৃত ধারা [illegible] করিয়াছ। আজ [illegible] তোমার [illegible] তোমার তরুণ [illegible] ইঙ্গিত [illegible] করিয়াছে। [illegible] তোমার [illegible] উদ্ভাসে [illegible] হইয়াছে। জাতির এ অভিযানে তুমি নবযাত্রার কণ্ঠ। তুমি বাঙলার [illegible] কণ্ঠে [illegible] তুমি দিয়াছ, [illegible] সহকারে [illegible] শক্তিতে [illegible] বন্ধন [illegible] করিয়াছ। তুমি বাঙালির [illegible] কণ্ঠে [illegible] সঙ্গীত [illegible] দিয়াছ। আজ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তুমি [illegible] গ্রহণ কর। [illegible] মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে গান [illegible]। তোমার নতুন [illegible] হইয়াছে। মানুষের [illegible] তোমার [illegible] দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি, চিরঞ্জীব মনীষী তুমি, তোমাকে আজ আমাদের সশ্রদ্ধ অন্তরের নমস্কার।' [illegible] বাঙালির পক্ষে নজরুল সংবর্ধনা সমিতির সভ্যবৃন্দ। কলকাতা ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬। ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৯।'

অভিনন্দন পাঠের পর সভাপতি উপস্থিত জনগণ কবির হাতে সোনার দোয়াত, কলম, রূপার দোয়াত অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। তারপর উমা ভট্টাচার্য ও নলিনীকান্ত সরকার কবির অভিনন্দনের জন্য বিশেষভাবে রচিত একটি আবাহন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সঙ্গীতের পর নজরুল ইসলাম অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠলে সভায় জনমণ্ডলী বিপুল করতালিতে আনন্দধ্বনি করে কবি সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। কবির উত্তরের অংশ বিশেষ

বন্ধুগণ! আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তুলে দিলেন, আমি তা মাথায় তুলে নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে

উঠেছে। তাতে শুধু একটি মাত্র সুরধ্বনি হয়ে উঠেছে। আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম। আমার হৃদয়-দ্বার যে ভরে উঠল। নবীন ও প্রবীণ [illegible] দুটি বন্দী হয়ে তুলে দিয়েছেন। আজ যদি আমি কিছু বলতে না পারি আপনারা আমায় সে অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন। আমি যে নবীন যৌবনের, সেই নবীন যুগকে বরণ করলেন আপনারা, তবে এ ঐশ্বর্য আমার জন্য, আমার স্থান সেখানে হতে পারে। [illegible] [illegible] এ [illegible] আপনাদের [illegible] অভিনন্দনকে [illegible] দিয়ে যে [illegible] দিতে পারব, সে [illegible] আমার নেই। [illegible] আমার [illegible] বন্ধু [illegible] এবং [illegible]। সে যদি আসতে পেরেই হয়, [illegible] আমার নিন্দা করতে পারবেন না। [illegible] অভিনন্দন হয়ে গেল। একটু আশ্চর্য হবে যাঁরা এ সভার আয়োজন করেছেন [illegible] বাদ দিয়েছেন। আমি দেশপ্রেমে সেই বহু বন্ধুদের কথা বলছি যাঁরা এখানে না এলেও [illegible] করতে পারতেন না এবং [illegible] একটু বেশি করেই [illegible] করেছেন। [illegible] [illegible] বন্ধুরা তাঁরা যেমন সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমায় ভালবেসেছেন, তেমনি বন্ধুর উল্টো তাঁরা [illegible] ফুটিয়ে [illegible] করেছেন। এতে আমি [illegible] [illegible] উপভোগ করি। [illegible] বন্ধুদের চেয়ে ফুটিয়ে [illegible]। [illegible] বন্ধুর [illegible] যেন [illegible] করে [illegible] ধরতে না পারলে হয় না। তিনি আমার [illegible] এবং [illegible] পারেন, তিনি আমার নিন্দাই [illegible] অথবা [illegible]। আজকের দিনে তাঁদেরও আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-নমস্কার নিবেদন করছি। অবশ্য বন্ধুরা যেমন পাখির একদিকে [illegible] পাখনার [illegible] দিয়েছেন, তেমনি নিন্দার [illegible], [illegible] ছড়িয়েছেন এবং ঐ দুই [illegible] দুই পাখার শক্তি এমন সমভাবে হয়ে উঠেছে যে তাতে আমি ঠিক থেকে গেছি, একটুও টলাতে পারেনি।

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভাল লেগেছে। সেই ভাল লেগেছিলেন [illegible] করতে পারব এই উৎসবে আমার আজকে একটা ভয় [illegible]। সে [illegible] [illegible] সবার প্রতি নমস্কার নিবেদন করা। আমার [illegible] যে [illegible] এখন [illegible] দিন। আমাকে [illegible] বলায় [illegible] করবেন না। সত্যের প্রকাশ-পীড়াকে বলি হবার জন্যই আমি সত্যকে এবং সবাকে [illegible] পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি [illegible] যদি আমায় ধরে এনে [illegible] ব্যবস্থা করে থাকেন তাহলে আপনাদের [illegible] হয়েছে। [illegible] [illegible] [illegible] এসে [illegible] দিয়েছেন। আমাকে বিদ্রোহী বলে খামাখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনোদিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র। আমি [illegible] [illegible] করেছি, [illegible] [illegible] দিয়েছি—[illegible], কিন্তু আমি জানি, আমাকে [illegible] দিতে পারিনি; আমার লেখার [illegible] [illegible] যেটুকু পেয়েছি। যে [illegible] [illegible] সাগর [illegible] [illegible] [illegible], সেই [illegible] [illegible] যেন [illegible] না করি। [illegible] [illegible] [illegible] না হারাই—এই আশীর্বাদ আপনারা করুন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব-গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্ম ফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে গোরস্থানের পথে তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ করে দেখার স্তবস্তুতি।

কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি। সে হাতে-হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভনীয় হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁটছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোনো বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি। আমি আমার আপনাদের আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি নমস্কার জানাচ্ছি। আমি ধন্য করতে আসিনি, ধন্য হতে এসেছি, তাই আপনাদের আমার অন্তর বন্দনা।

সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা

কবির উত্তর দানের পর সমাদৃত হয়ে প্রসিদ্ধ গায়ক গোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তারপর সভাপতির অনুরোধে সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "স্বাধীন দেশে জীবনের সহিত সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তাহা নাই। দেশ পরাধীন বলে এ দেশের লোকেরা জীবনের সকল দিক থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুলের জীবনের নানাদিক থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তার ফলে আমি একটি উদাহরণ দেব—কবি নজরুল যুদ্ধের ছবি দিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। তাঁহাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা বহু অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশি। এতেই বুঝা যায় যে নজরুল একটা জীবন্ত মানুষ। কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' র মত প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয় সমগ্র বাঙালি জাতির।"

সুভাষচন্দ্র বসুর পর রায়বাহাদুর জলধর সেন বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন "আজিকার এই দিনে আমরা কবি নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা করিবার জন্য যেভাবে হিন্দু-মুসলমানে মিলিত হইয়াছি, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, দেশের প্রত্যেক মঙ্গল আয়োজনে যদি সেইভাবে আমরা মিলিতে পারি, যদি ভুলিয়া যাইতে পারি, আমরা হিন্দু বা আমরা মুসলমান; শুধু যদি আমাদের মনে জাগে আমরা বাঙালি, বাংলা মায়ের সন্তান, তবে আমাদের নজরুল সংবর্ধনা সার্থক হবে।"

সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উপসংহারে বলেন, "আমরা আগামী সংগ্রামে কবি নজরুলের সঙ্গীত কণ্ঠে ধারণ করিয়া শ্রীমান সুভাষের মতো তরুণ নেতাদের অনুসরণ করিব। ফরাসি বিপ্লবের সময়কার প্রথম একখানি গীতে দেশকে মাতাইয়াছিলেন। তাহাতে দেখা গেছিলাম, সে সময় প্রত্যেক মানুষ অতি মানুষে পরিণত হইয়াছিল। আমাদেরও বিশ্বাস নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক-একটি অতি মানুষে পরিণত হবে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা [illegible]]

প্রসঙ্গ : 'গণবাণী' মুজফ্ফর আহ্মদ

[এই পত্রটি 'সংকল্প' নিবন্ধের সঙ্গে পত্রের আকারে মুজফ্ফর আহ্মদ লিখিত 'আত্মশক্তি' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক শ্রী গোপাল লাল সান্যাল মহাশয়কে লিখিত। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২০শে মার্চ সংখ্যা 'আত্মশক্তি' পত্রিকার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে শ্রী ... 'চোরা না' ... পুস্তক-পরিচয় প্রসঙ্গে মুজফ্ফর 'গণবাণী'র সমালোচনা করেন। তারই জবাবে কবি এই পত্রটি লেখেন। 'গণবাণী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ। —তখন সেই সঙ্গে 'গণবাণী'র অন্যতম পরিচালক ছিলেন।—সম্পাদক]

শ্রীযুক্ত 'আত্মশক্তি' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

বিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

আপনার (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের) ২৬শে মার্চের 'আত্মশক্তি'র 'পুস্তক-পরিচয়'-এ নতুন সাপ্তাহিক 'গণবাণী'র যে পরিচয় দিয়েছেন তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। কারণ 'গণবাণী'র সাথে আমিও সংশ্লিষ্ট। অবশ্য 'গণবাণী' পুস্তক নয়, 'আত্মশক্তি'র পুস্তক-পরিচয়ের সুবিধা নিয়ে পরিচিত হলেও, যেমন আত্মশক্তি আপনার কাগজ হলেও, ঐ সমালোচনাটি আপনার নয়।

ঐ "পরিচয়" নিয়ে বলবার কথাটুকু আমারই দাবি-দাওয়া, তাদের কৃতক প্রতিবাদ নাকের নয়। আশা করি, আপনার প্রাচীন কাগজের সহৃদয়তা কখনো ছেড়ে দেবেন না আমার বক্তব্যটুকু জানাতে। এ অনুরোধ জানাবার এই কারণ যে, আপনার সম্পাদিত পত্রিকাটি 'তরুণদের আত্মশক্তি', 'শনিবারের পত্র' নয়। তবুও এ কথাটা বলবার হেতু আছে। কেউ বলেছিলেন, 'শনিবারের চিঠি' না-কি একীভূত হয়ে উঠেছে 'আত্মশক্তি'র সাথে। অবশ্য, আমার একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়নি, যদিও দু'দিনকাকে আমার এইরূপ ভুল ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছেন আর কি। এ রকম ধারণার আরও কারণ আছে। হঠাৎ একদিন বাগানে পড়লাম ইটালির মুসোলিনি আর অস্ট্রিয়ার জার্মান রাজার ইতালি চলতে চলতে শেষে কি এক রকম সম্বন্ধ পাতাতে চলেছে। সেই ইতালিটা রকম যে, হয়তো শেষটা ইটালির সাথে একীভূত (Incorporated) হয়ে যাবে। হয়তো বা এত সময় V₁ হয়ে যাবেন, আর শীঘ্র V₁ ট্রীয়ের যদি থাকাও হতে পারে, তবে শনিবারের পত্র তরুণদের পত্রিকাটি না হয়ত হবে না কেন, একীভূত না হোক। আমরা আমার আপত্তি যত নয় ভাসূরের কথা নেওয়া দুটিতা নিশ্চয়ই। তবে জানেন কি, "কোন খবরের দুটি কি আছে" বলে একটা প্রবাদ আছে, যাদের চরিত্রে উচিত কথাও এর মত হয় "দুধ খবরের সত্য কি না তা"। আপনার "অবনির হার" এবং প্রবাসীর অশোকবাবুর তখন কথা ভাবিনাই চলছিল তখন ওটা ইতালির মত আর হাসির কেন হয় নাই, বা দেখে আমরা অবশ্য করতে পারতাম যে ওটা নিশ্চিতই একটা সমস্তে থেকে উঠবে। 'সজনে পদিনি' আমরা বুঝিনে, তবে আমার এক বন্ধু একদিন বলেছিলেন, এ লেখকদেরই নিশ্চিতই একটা প্রেরণায় হয়ে যাবে, কেননা অশোকবাবুর লেখার ক্ষমতা না থাক, তাঁর দুটি পড়বার ক্ষমতা আছে।

বিজ্ঞান বিষয়, সন্দেহ নেই। অশোক বাবুর লেখার ক্ষমতার মেধে আমার তাই মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু বর্ষিং লিখতে যে শক্তিশালী লেখক হওয়া যায়, এ সন্ধান ও আগে আমার কেউ দেয়নি। তাহলে আমি আমার লেখার ক্ষমতাটা অশোকবাবুর কাছে থেকেই শিখতাম। আর অশোকবাবু ও তাঁর প্রেমবন্ধুরা আমার লিখতে শেখাবার জন্য কিরূপ সমুৎসুক, তা তাঁদের আমার উদ্দেশ্য যা অর্থবাদ হ'তে দিলেন। সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'গুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন। প্রাণপণেই যে আজকাল বাংলার ছেলে হঠাৎ ইঁদা দেওয়া সমাজে কাষ্ঠের মতো বসেছেন, তাও দেখতে পাবেন।

আপনাকে যদি চিনি, তাই আমার তত হইলে আপনার কাগজের ইংরেজি লেখাগুলো দেখে যে, কোনদিন বা আপনার নামের শেষে (B.A. Cantab) দেখে ফেলি। চিঠি নামটা প্রতিষ্ঠা, এ কথা নির্দিষ্ট রাখতেনবাবুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত না হলে কেউ কি বিশ্বাস করতে পারতেন? এ-রকম লেখা ঐরকম Oxon বা Cantab B.A. ইউনিয়ন-প্রচারক জাতির দ্বারা বোধ হয় কেউ শিখতে ও পারতেন না, পড়তেও পারতেন না। অশোক বাবুর প্রেমিক মন শীতল প্রতি কিরূপ অসীম হয়ে উঠেছিল জানা নেই। কিন্তু সে তার সরকারী ওপর পড়লে যে কিরূপ ভয়ানক হয়, তা বেশ বুঝি। আমার কথা হচ্ছে, কোনদিন বা শ্রীযুক্ত বলাই চটিয়ে লেখা শুরু করে দেন।

নিজেকে শীত পাহিয়ে বলে কোন নিরাময় চেখে ('খাস কলমের নিজের শীত নয়) আপনি হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে এটা চিঠি, প্রবন্ধ নয়। আর, চিঠিতে যে আবোল-তাবোল বকবার অধিকার সকলেরই আছে, তা 'শনিবারের চিঠি' পড়লেই দেখতে পাবেন। তাই বলে আমার এ চিঠিটা রবিবারের উত্তরও নয়। কেননা তাঁরা এত চিঠি লিখেছেন আমায় যে, তার উত্তর দিতে হলে আমার গলেন হবে নিত্যাকে ডাকতে হয়। এটাকে মনে করে নিন আসল কথা পাড়বার আগে একটু ভাবনা করে নেওয়া, যেমন আপনারা ভাবনা করেছেন 'গণবাণীর' আলোচনা করতে গিয়ে।

শ্রীযুক্ত আমায় লিখেছেন "লাঙল উঠে গিয়ে এটা (অর্থাৎ গণবাণী) নামল"। কিন্তু 'গণবাণী'র কভারে লেখা আছে, এর সাথে 'লাঙল' একীভূত হয়েছে। যেমন Forward-এর সাথে Indian Daily News প্রভৃতি একীভূত হয়েছে। অতএব আসলে লাঙল উঠে গেল না, সে হয়ে গেল গণবাণীর মধ্যে। এর কারণও দেখিয়েছেন ওর সম্পাদক মুজফ্ফর আহ্মদ। 'গণবাণী'র কভারের লেখাটুকু বোধ হয় শ্রীযুক্ত অশোকের চোখে পড়ে নাই। অথচ আমি এ ইচ্ছা করছি না যে, তার

[illegible] লাঙল পড়ুক। ক্রমে অন্তর্মুখী পড়তেই সে রকম অবস্থা হয়ে উঠে।

তিনি যথার্থ লিখেছেন, এ লড়াই দল বেশীর মুসলিম প্রতিষ্ঠা দল। এদেশে প্রথম তৈরি হল, কাদা ভাষা, কোন ভাবাবেগের সংস্কৃতিহীন অসাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এর অর্জিত যা সমাজকে জানানো উচিত। কোন সময়ের সভায় এর উত্থান, সেটাও জানানো দরকার। 'উদ্ভূত আসামা' 'দখিনা পবনে' কথা বলেছেন, অনেক ব্যাপারে অনেক বড় কিছু লেখেন, সুতরাং শরীরের এতক্ষণ বেশী থাকতো তিনি বলেন এ বিষয়ে তথা অনাবশ্যক নয় নিশ্চয়। কিন্তু না বলাটা অন্যায়ের, অবশ্য তাঁর পক্ষে তিনি সুস্পষ্টিতে আলোচনা করেন। তিনি আপনার আপনার কালকে কৃষক-প্রজাদের ধরন-ধারণ অন্যতম সম্বন্ধে নিশ্চয় করছেন না। তিনি তিনি এ-সময় শুরু করে নিজেকে সামনে দেখছেন না। "বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা দল" সম্বন্ধে দু'একটা খবর দিলি এবে, এর গুরুত্ব জানা আবশ্যক মনে করছি। গত ফেব্রুয়ারি মাসের এই ৬-৭ই তারিখে কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হয়, যার সভাপতি হয়েছিলেন ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ঐ অধিবেশনের বিবরণী বাংলার ইংরাজি-বাংলা প্রায় সব কাগজেই বেরিয়েছিল। আনন্দ ও বেরিয়েছিলই। অবশ্য খবরকাগজের কাজ 'ক্যাবারে' সে বিষয়ে বলাবলি—শুধু সভাস্থ সাতকাণ্ডের কোন অতিকথনের চমকদার লেখা ছাড়া। এখানে একটি দল প্রবৃত্তি হলো বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা দলের গঠনতন্ত্র সভাসমিতি হয়েছে, তার কোন সংবাদই হয়েনি 'ক্যাবারে'। আমরা দিতে আসছেন না। সম্পাদকীয় এই ধর্ম ও সৌজন্যবোধ বাংলার আর কোন কাগজ অতিক্রম করেনি। অবশ্যই 'ক্যাবারে' হিসেবেও ও অবজ্ঞে অন্য অনেক দেশের প্রতিবেদন কথা লেখে, সুতরাং এ-কাগজে বাংলার কখনো হাটি-মজুরের কথাও লিখতে হবে, এমন কোন কথা নেই। তবে আমার এ কৃষক-প্রজা দলটা তুলসীবাবুর, নলিনীবাবুর মত ধনিক লোকের জন্য নহে। গরম করলে খাবা না, যত সব বিভিন্ন জেলার দরিদ্রদের মজুর, কৃষকেরা হাড়-চামড়া বের করা, খালি-গায়ে পেটে-পিঠে এক মুখওয়ালা চাষা-মজুর। আর তাদের নেতাদেরও অবস্থা—না খেয়ে চাল না থাকে চুলো। তাতে সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রে অনাধি নয়। বোঝ জানা।

তাই ঐ প্রজা সমিতিতে প্রস্তাবসমূহ নানা সংখ্যা দেখিয়েছিল। ঐ সমিতিতে প্রথম প্রস্তাবই হলো, কৃষক-প্রজা দল গঠনের প্রস্তাব।

তিয়াত চতুর্থ প্রস্তাব হলো: "সকল পত্রিকাতে কৃষক ও প্রজাদের দুঃখদুর্দশা আলোচনা প্রচার করা উচিত।"

প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবক ও সমর্থক সকলেই বিভিন্ন জেলার কৃষক ও প্রজা।

অতঃপর আমাদের প্রতি প্রশ্ন—"কোন্ কোন্ আর-কাগজের সাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িকতা প্রমাণিত এর কর্মীরা।" উত্তরে আমরা বলুনতকে সানুনয় অনুরোধ জানাচ্ছি তিনি যেন দয়া করে একবার ৩৭, হ্যারিসন রোডের "গণবাণী" অফিসে পদধূলি দিয়ে যান। দেখে দেখতে পাবেন, বা প্রত্যক্ষণের পদধূলি "গণবাণী" অফিসে ধূলিকৃত হয়ে "গণবাণী"-কেও মাড়িয়ে উঠেছে। সে অফিসে মানুষের

নজরুলের প্রতি [illegible] ছিলাম। তাই আমি সাহিত্যে আমার প্রতিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছিলাম। সে আমার প্রত্যাশার চেয়েও বেশী। এখন কেউ যদি এর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেন, [illegible] আমার [illegible] নয় এ কথা [illegible]।

বিনত
মুজফ্‌ফর আহমদ

চেয়ে লোকেই বেশি, প্রেতাত্মা প্রাণীর ও মাকড়সার সমান। অনুষ্ঠানের প্রতিকারেই মহামনোযোগী সর্বদাই। অবশ্য খাবার বেলায় অনটন। বাক-পড়া, বাঁধা-নাড়া আসবাবের মত সব দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আসে জল আসে, বিশেষ করে যখন দেখি, "গণবাণী"র কর্মীরা হতভাগ্য মুজফ্‌ফরের অবস্থাতেও। অবস্থা ও সব—'ফকির-দরবেশ, দাঁড়িয়ে তাড় নেই, পড়িয়ে চোকো।' আর পরিচয় দরকার নেই। যেন সমস্ত মানবসমাজের প্রতিনিধি! আমি জোর করে বলতে পারি মুজফ্‌ফরকে দেখলে যেমন তার শুধু দেখেও জল আসে। এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা বীর কর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন খাঁটির মুসলী, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা—সংসারে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কি করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবীর দেশে নোয়াখালীতে, এই মোল্লা-মৌলবীর দেশ বাংলায়, তা ভেবে পাইনে। ও যেন আল্লার নিজ, কাছে থেকে নিবৃত্ত করা যায় না। ও যেন গোলাপ গাছে ফুল ফোটায় কাঁটায় ভয় সুগন্ধ নিয়ে। যার তাকে দেখতে পেয়ে গেছেন, তার প্রতি দিন যে বাঁচিয়ে রাখি না। এই পাগল আমার মনে বিদ্রোহ করতে পারে না, এমন অনেক মুসলমান নেতা আছে এই সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের ও দুঃখের কথা খুঁজে নিয়ে গুছিয়ে নিলে, শুধু মুজফ্‌ফরের বিচার পর দিন অনশনে ক্লিষ্ট হয়ে গুছিয়ে মরছে। যদি জানি, এই "গণবাণী" বের করতে তাকে দুটো দিন কাটে কাটে অনশনে কাটাতে হয়েছে। দু চিঠিও ডাক দিয়েছে, তার মুজফ্‌ফর সমাজ তকদির করে। অথচ মুজফ্‌ফরকে মত সম্পূর্ণভাবে দেশনেতা বলে বারবারে, ভারতবর্ষে আসলে কোন মুসলমান নেতা দুরের কথা, হিন্দু নেতাকেও দেখিনি। এই সাম্প্রদায়িক হানাহানি নিয়ে যদি কারুর মাথা ঠিক থাকে, তা মুজফ্‌ফরের, "লাঙল" ও "গণবাণী"র লেখা প্রবন্ধ পড়লেই বুঝতে পারবেন।

দেশের ছোট বড় অনেকই সকল দেশপ্রেমিক মিলে যখন "এই দেশ যে বর খেয়ে" প্রতারণার সার্থকতা প্রমাণ করে নানা দিন দিন-কয়েক জেল খাদের বিনিময়ে অন্তত একবার নিজের "আর-কাগজের সংস্থান" করে নিলে, তখন যারা তাদের আগেকার দরিদ্রতাকে প্রতিষ্ঠা করল না অর্থবিত্তের স্বার্থ নিয়ে—তাদের অন্যতম হলো মুজফ্‌ফর। মুজফ্‌ফর আজও অর্থনৈতিক সত্যের জেলের সত্যাগ্রহী আন্দোলনের অন্যতম আসামী এবং বাংলার সর্বপ্রথম মুসলমান স্টেট প্রিজনার। বাংলার বাইরে নানান স্টেটই জেলে তার উপর অকথ্য অত্যাচার চলছে।

থেকে তখন [illegible] যে বৃহৎপ্রাণ এখন তাকে হিমালয় পর্বতস্থিত [illegible] ফিরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়। তখন একজন তার মাত্র ১৫ [illegible]। সেখানে নিজের পথ দিন কাটিয়েছে সে অসহায়, তবু সে চায়নি কিছু। সে বলেনি কোনদিনই মুখ ফুটে যে, দেশের জন্য সে কিছু করেছে। [illegible] না জানিয়েছে। সে বলে না বলেই যে তার জন্য এর [illegible] পায়, তার ওপর আমার এত বিপুল শ্রদ্ধা। সেই ছেলে তিনি [illegible] কর্পোরেশনের মোটরে চড়ে গাড়িতে হাওয়া খাইয়ে বেড়াচ্ছেন এবং [illegible] যাঁর অভাব অনুভব করে নিজের [illegible] ছেড়েই চলেছে দিনের পর দিন, তাকে কোলকাতা এসে তাঁর [illegible] অভিভাবক লিখিয়ে নিতে কাগজে কাগজে তাঁর নামে [illegible] বড় করে তুলল সেই মুজফ্‌ফর তার [illegible] একটা পয়সা বা এক [illegible] সাহায্যটি পায়নি ঐ নিজের সাহায্যের জন্য। সে অনুযোগ করে না তার জন্য, কিন্তু আমরা করি।

যে মুসলমান সাহিত্য-সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন মুজফ্‌ফর, আজ তার নিজের এক [illegible] গোপন রেখে গেল, সেই মুসলমান সাহিত্য-সমিতির যখন নতুন করে প্রতিষ্ঠা হল এবং তার নতুন সম্পাদক [illegible] এবং তাদের অধিকাংশই [illegible] যখন তার [illegible] বা মৃত হওয়ার কথা আর পর্যন্ত নিলে না—তার আগে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও [illegible] কথা তখন একটি কথা করে দুঃখ প্রকাশ করেনি মুজফ্‌ফর। ও যেন প্রদীপের তেল, ওকে কেউ দেখে না, দেখে শুধু সেই শিখাকে, যা বুকে প্রদীপের তেলকে শোষণ করে। শুধু মুজফ্‌ফর নয়, এদেশের প্রায় সকলেরই এই অবস্থা। হালিম, নলিনী, সব সমান। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। একজনের [illegible], একজনের [illegible], [illegible], একজনের [illegible] একজনের [illegible] আছে। তার [illegible] ও [illegible] সৃষ্টি। [illegible] হলে সব [illegible] উল্লা। কোনদের নীচে ঢাকা ছুটতো না [illegible], আর পেটের ভিতর [illegible] যেন তেলা তৈরি হচ্ছে—কিসের [illegible] এমন গড়গড় করে। [illegible] আছে—[illegible] বেরিয়ে যাওয়া [illegible] নয়। [illegible] অবিরাম [illegible] পড়ে আছেন। [illegible] তাঁর ইলেকট্রিক ফ্যান [illegible] এবং [illegible], [illegible] টেবিল [illegible] পরিশোভিত, [illegible] সজ্জিত, [illegible] অফিসকে ত্যাগ করে একটু নীচু হেঁটে (সিঁড়ি দিয়ে)। তাঁদের অফিসের মেঝেতে [illegible] "গণবাণী" অফিসের ও তার কর্মচারীদের দেখে আসার নিমন্ত্রণ রইল। [illegible] অন্তত তাঁর পয়সায় একটু চা খেয়ে নেবে। একলা একেও এক কাপ খেতে। আমি নিজে নিয়েই [illegible] নিয়ে যেতাম, কিন্তু এদিকের [illegible]। কতোদিন, কোলকাতায় [illegible] বিশেষ প্রয়োজন থাকলেও যেতে পারছিনে ট্রাম ভাড়ার অভাবে। [illegible] ইঁদুরেরা বক্সিং খেলছে, ডন ফেলছে! [illegible] আমার ক্ষেত্রেও দেখেনা, তারা বলে "হাত [illegible] হয়,

পারে বুঝোও [illegible], মাথার নয়, তোমার হাত শক্তটা নিতে পারে, কিন্তু এ কাজটা হবে না তার। এমন কি মুজফ্‌ফরের মত খুঁটিও হবে তার মন ভোলেও না।"

তারপর "গণবাণী"র লেখা নিয়ে "[illegible]" বলেছেন— "বাঙলার কৃষক ও শ্রমিকেরা লেখাপড়ার সঙ্গে [illegible] কতক কতক শিখলে ওগুলো লিপিগুলিই বুঝতে পারবেন?"—তাঁর ইঙ্গিতটা এবং রসিকতাটা দুটোই বুঝলাম না, বুঝলাম শুধু তাঁর [illegible]—অন্তত সেই সম্বন্ধে, যে সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি কি জানেন না, যে কোন দেশের কোন শ্রমিক কার্ল মার্কসের "ক্যাপিটাল" পড়ে বুঝতে পারবে না। ঐ মতবাদটা যারা পড়বে, তারা কৃষক-শ্রমিক নয়, তারা [illegible] অনুসারী লোক। কার্ল মার্কসের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তা নিয়ে অনেক [illegible] সাহিত্য হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এ মতবাদ নিয়ে এমন কতকগুলি লোকের সৃষ্টি হয়েছে যারা জগৎটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চেয়েছেন বা গড়ছেন। মজুররা কোনকালেই মতবাদ বুঝবে না, মতবাদ তৈরি করে তুলবে সেই সকল লোক যারা বুঝেছেন এ মতবাদের মর্ম জনসাধারণকে। ইঞ্জিন চালাবে ড্রাইভার কিন্তু গাড়িতে চড়বে সর্বসাধারণ। "গণবাণী" তাঁদেরই কথা। কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপত্র, মনে আশার বেদনাতুর হৃদয়ের মূক মুখের বাণী "গণবাণী," তাদের বইতে না পারা ব্যথা কথায় ফুটিয়ে তুলবে "গণবাণী"। ইতি—

বিনীত

—নজরুল ইসলাম

৮ই ভাদ্র
১৩৩৩ সাল

আমার ধর্ম

দেশে একটা কথা উঠেছে যে, মুক্তির জন্য যে আন্দোলন আমরা চালাচ্ছি, আমাদের তা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে। দেশে যখন মুক্তির আলো [illegible] বহুদিন পর [illegible] লাখ লাখ লোক আপন ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন তারা এক নতুনভাবে [illegible] অনুপ্রেরণা [illegible] মানুষ [illegible] তার পেছনে পেছনে চলতে লাগল। কিন্তু আজ যখন [illegible] দেওয়া হল তখন [illegible] নিয়ে তর্ক উঠে [illegible] মাথার গোলমাল হল। একটি কথাই [illegible] শক্তি অন্য থেকে [illegible] তুলে দিয়েছিল, শক্তিকে শুধু [illegible] একটা আচার। কিন্তু তেমনি আজ যেন আমাদের ভিতরে [illegible] বেরিয়ে [illegible] উপস্থিত হয়েছে—[illegible] তাকে ধরে রাখবার কোন [illegible] খুঁজছেন না। কেউ কেউ এর বেশি গোঁড়া [illegible] হয়ে পড়েছেন, কিন্তু [illegible] থেকে [illegible] আমাদের মনে তো নেই [illegible] শক্তি নেই।

আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, আমাদের ধর্মের ভিতর দিয়ে চলতে হবে। কিসের জন্যে আমাদের ধর্মকে আশ্রয় করতে হবে? ওরে মূঢ়, তুই একবার ওঠ। উঠে বল, 'আমি ব্রাহ্মণ নই যে ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে পড়ে থাকব। আমি আর তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকব না। আমার দাঁড়াতে হবে—[illegible] আমি দাঁড়াবো'। ওরে পণ্ডিত, ওরে [illegible], তুই শেষ [illegible] থেকে [illegible] করতে উঠেছ। দেবতা [illegible] নিয়ে, প্রকৃতি আর [illegible] নিয়ে খেলতে যায়। আমার [illegible] তোর বুকে [illegible]

দিয়েছে—সমাজ তোর [illegible] করে ফেলেছে। [illegible] তোর প্রাণের [illegible] কেড়েছে।

কিসের ধর্ম? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম। দেবতার [illegible] প্রকৃতিকে আমি প্রতিবাদ [illegible] সমাজকে [illegible] করছে। সব [illegible] আমি বাঁচবো।

আমার আবার ধর্ম কি? যার [illegible] কথা বলিবার অধিকার নেই, দুপুর [illegible] ঘুম ভেঙে যায়, [illegible] চোখ [illegible] শক্তি নেই, তার আবার ধর্ম কি? যাকে [illegible] এসে [illegible] ফেলতে পারে, যার [illegible] মাকে [illegible] ফেললেও [illegible] নাই, তার আবার ধর্ম কি? দু'বেলা দুটি খাবার জন্যই যার বাঁচা, একটু [illegible] করে [illegible] বাঁচিয়ে [illegible] যার থাকা, তার আবার ধর্ম কি?

মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কি? তোমার ধর্মের কথা বলবার অধিকার কি?

ওরে আমার তরুণ, ওরে আমার [illegible] দল, তোরা আয়, তোরা ছুটে আয়—এই [illegible] থেকে চলে আয়। তোরা সব আমাদের আগে দাঁড়াতে হবে। কিসের শিক্ষা? কে শেখাবে? [illegible] শেখাতে পারে? আমরা কিছু শিখবো না, আমরা কিছু শুনবো না, আগে দাঁড়াবো—আমরা বাঁচবো।

একবার [illegible] ভেবে দেখ—তাদের কথা ভেবে দেখ। দেশ ছাড়া [illegible] দল [illegible] ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে জানে তারা [illegible] গেছে, কত না সয়েছে? তারা ত কথাটি কয়নি। সেই [illegible] হয়ে প্রাণ [illegible] করে, হাটে মাঠে বেড়াচ্ছে, তবু তারা কথাটি কয়নি। তাদের [illegible] আজ কি তোমার বুকে [illegible] যাচ্ছে না? তুমি যে পথ দিয়ে [illegible] শুধু [illegible] চলে যাও, তারই [illegible] ঘরে তারা যে [illegible] দিন তিল তিল করে [illegible]। সে খবর তুমি রাখ কি? সেই [illegible] তারা যে [illegible] কাটিয়ে দিয়েছে, তাদের ধর্ম কি?

তারা বুঝেছে বাঁচাই তাদের ধর্ম—তারা জানে এই তিল তিল করে [illegible] জীবন। তাই তারা ঐ মরণের পথ বেছে নিয়েছে।

ওগো তরুণ, আজ কি তুমি ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকবে—তুমি কি বাঁচবার কথা ভাববে না? ওরে অদীন, ওরে [illegible] তোর আবার ধর্ম কি? যারা তোকে ধর্ম শিখিয়েছে, তারা [illegible] এসে [illegible] নিয়ে পড়ে থাকবে? তারা কি [illegible] এসে [illegible] পড়তে [illegible] থাকবে? [illegible] ভুবে যেত, [illegible] প্রাণ [illegible] হয়ে যেত। তাই আগে বাঁচো।

(কাজী নজরুল ইসলামের এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ধূমকেতু' পত্রিকার [illegible] সালের [illegible] সংখ্যায়।)

মন্দির ও মসজিদ

"মারো শালা যবনদের!" "মারো শালা কাফেরদের!"—আবার হিন্দু মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর মাথা-ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর "প্রেস্টিজ" রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম—তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে,—"বাবা গো, মা গো!"—মাতৃ-পরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে!

দেখিলাম, হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।

মন্দির-মসজিদের ললাটে লেখা এই রক্তকলঙ্ক-রেখা কে মুছিয়া ফেলিবে, বীর? ভবিষ্যৎ তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

সেই রুদ্র আসিতেছেন, যিনি ধর্ম-মাতালদের আড্ডা ঐ মন্দির-মসজিদ-গির্জা ভাঙিয়া সকল মানুষকে এক আকাশের গম্বুজ-তলে লইয়া আসিবেন।

জানি, স্রষ্টার আপনি-মোড়ল "প্রাইভেট সেক্রেটারি"রা হয়ত খুদিয়া, টুঁটি টিপিয়া, চিচি কাঁদিয়া আমার প্রাণ বধিবে, তবু উহাদের পতন হইবে। উহারা ধর্ম-মাতাল। উহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের এলকোহল পান করিয়াছে।

পুরোহিত-মোল্লাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি ভগবানও আজ হারাইয়াছেন।

মুহম্মদকে যাহারা মারিয়াছিল, ঈসা-মুশাকে যে-সব ধর্ম-মাতাল প্রহার করিয়াছিল, তাহারাই আবার মারিতেছে মানুষকে—ঈসা-মুসা-মুহম্মদের বড় মানুষকে।

যে-সব অবতার-পয়গম্বর মানুষের মার হইতে মানুষকে বাঁচাইতে আসিয়া মানুষের মার খাইয়া গেলেন, তাঁহারা আজ কোথায়? মানুষের অত্যাচারের জন্য মাথা পাতিয়াছিলেন তাঁহারা, তাঁহাদেরই মাতাল পাণ্ডা-পিয়াদা আজ মানুষের সর্ব অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠিল।

যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগারে, মসজিদের জিন্দানখানায়, গীর্জার gaol-এ বন্দী। মোল্লা-পুরুত, পাদরী-ভিক্ষু জেল-ওয়ার্ডের মত তাঁহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে।

একস্থানে দেখিলাম, উনপঞ্চাশ জন ভদ্র-অভদ্র হিন্দু মিলিয়া একজন শীর্ণকায় মুসলমান মজুরকে নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে, আর একস্থানে দেখিলাম, প্রায় ঐ সংখ্যক মুসলমান মিলিয়া একজন দুর্বল হিন্দুকে পশুর মত মারিতেছে। দুই পশুর হাতে মার খাইতেছে দুর্বল মানুষ। ইহারা মানুষকে মারিতেছে যেমন করিয়া দুর্বল কসাইরা পশুকে জবাই করিয়া মারে। উহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, উহাদের প্রত্যেকের মুখ শয়তানের চেয়েও বীভৎস, শুয়োরের চেয়েও কুৎসিত। হিংসায়, কদর্যতায় উহাদের গাত্রে অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ।

উহাদের দুই দলেরই চেহারা একরকম, উহারা আসল শয়তান। সে বারে বারে কখনো টুপি পরিয়া দাড়ি লাগাইয়া মুসলমানদের খেপাইয়া আসিয়াছে, কখনো পৈতা-টিকি রাখিয়া হিন্দুদের খেপাইয়া দিয়াছে, সে-ই আবার গোঁফ দাড়ি ছাঁটিয়া ঐ টিকি খসাইয়া হিন্দু-মুসলমানকে এক সাথে মারিতেছে। উহার লাঠি সম্প্রদায়ের দিকে দেখিয়াছি, উহার মুখ নরকপালের মুখের মত লাল।

দেখিলাম, আল্লার মসজিদ আল্লা আসিয়া রক্ষা করিলেন না, মা-কালীর মন্দির কালী আসিয়া আগলাইলেন না। মন্দিরের চূড়া ভাঙিল, মসজিদের গম্বুজ টুটিল।

আল্লার এবং কালীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আকাশ হইতে বজ্রপাত হইল না মুসলমানদের শিরে, "আবাবিলের" প্রস্তর-বৃষ্টি হইল না হিন্দুদের মাথার উপর।

এই গোলমালের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ছেলে আসিয়া গোঁফ-দাড়ি কামানো দাঙ্গা-হত খায়রু মিয়াকে হিন্দু মনে করিয়া "বল হরি হরিবোল" বলিয়া শ্মশানে পুড়াইতে লইয়া গেল, এবং কতকগুলি মুসলমান ছেলে গুলী খাইয়া মৃত দাড়িওয়ালা সদানন্দ বাবুকে মুসলমান ভাবিয়া "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়িতে পড়িতে কবর দিতে লইয়া গেল।

মন্দির এবং মসজিদ চিড় খাইয়া উঠিল, মনে হইল যেন উহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে!

হানাহানি চলিতেছে। দেখিলাম রাস্তার এক জীর্ণ-শীর্ণ ভিখারিনী তাহার ক্ষুধাতুর শিশুটিকে বুকে চাপিয়া একটি পয়সা ভিক্ষা চাহিতেছে। শিশুটির তখনো নাড়ি কাটা হয় নাই। অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠে সে যেন এই দুঃখের পৃথিবীতে আসার প্রতিবাদ করিতেছিল। ভিখারিনী বলিল, "বাছাকে আমার একটু দুধ দিতে পারছি না বাবু! এই সবে এসেছে বাছা আমার। আমার বুকে এক ফোঁটা দুধ নেই!" আমার কণ্ঠে যেন বিষ-জ্বালা কাঁদিয়া উঠিল। পাশের একটি বাবু যেন একটু হাসিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল, "হুঁ। এই ত চেহারা, এক ফোঁটা রক্ত নেই শরীরে, তবু ছেলে হওয়া চাই!"

ভিখারিনী নিষ্পলক চোখে তাকাইয়া রহিল লোকটির দিকে। সে কি দৃষ্টি! চোখ দুটো তার যেন আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল। ও যেন নিখিল প্রতারিতা নারীর ধিক্কার! এমনি করিয়া নির্বাক চোখে তাহারা তাকাইয়া থাকিয়াছে আল্লারই দিকে—যে তাহাদের সর্বনাশ করিয়াছে। আমি যেন তার দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিলাম। সে বলিতে চায়, "পেটের ক্ষুধা এর চেয়েও বলিষ্ঠ, ও যে বিক্রয় করিয়াও সে ক্ষুধা মিটাইতে হয়।"

যে-লোকটি বিদ্রূপ করিল সে-ই হয়ত ঐ শিশুর জীবন দিয়াছে। সে

[illegible]
[illegible] ও [illegible]।

না হয়, তারই একজন আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু অথবা তাহারই মত মানুষ এখেন ঐ শিশুর জন্মদাতা।

ঐ যে এক আকাশ তারা, উহারা ইহারই মত দুর্ভাগিনী ভিখারিনীদের চোখ, অনন্তকাল ধরিয়া ভোগ-তৃপ্ত বিশ্ববাসীকে কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে।

তিনদিন পরে আবার দেখিলাম, পথে দাঁড়াইয়া সেই ভিখারিনী। এবার তাহার বক্ষ শূন্য। চক্ষুও তাহার শূন্য। যেদিন শিশু ছিল তার বুকে, সেদিন চক্ষে তার দেখিয়াছিলাম বিশ্বমাতার মমতা। অনন্ত নারীর করুণা সেদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার চোখের তারায়, তাই সে সেদিন এমন নিঃক কাতর বক্ষে ভিক্ষা চাহিয়াছিল। আজ তাহার মনের মা বুঝি-বা মরিয়া গিয়াছে তাহার শিশুর সাথে! আজও সে ভিক্ষা চাহিতেছে, কিন্তু আর সে কাতরতা নাই তাহার কণ্ঠে, আজ যেন সে চাহিবার জন্যই চাহিতেছে!...

আমায় সে চিনিল। আমি সেদিন তাহাকে আমার ট্রাম ভাড়ার পয়সা দুইটি দিয়াছিলাম।—ভিখারিনীর শুষ্কচক্ষে হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ ভরিয়া উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোর ছেলে কোথায়?" সে উর্ধ্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। তাহার পর একটু থামিয়া আমায় বলিল, "বাবু, আমার সাথে একটু আসবেন?" আমি সাথে সাথে চলিলাম।

পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তারই পাশে ডাস্টবিন। শহরের যত আবর্জনা জমা হয় ঐ ডাস্টবিনে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ভিখারিনী ডাস্টবিনের অনেকগুলো আবর্জনা তুলিয়া একটা ন্যাকড়া জড়ানো কি একটা যেন তুলিয়া লইয়া "বাপু আমার সোনা আমার" বলিয়া ভিখারিনীর মত চুমা খাইতে লাগিল।

এই তাহার খোকন।—এই তাহার বাপু, এই তাহার সোনা! ভিখারিনী ইহার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর শিশুটিকে আবার ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবু, ঐ পয়সা কয়টি দিয়ে সেদিন একটা খাবার-দুধ-খাওয়া বোতল কিনেছিলুম। এ-কয়দিন ছেলেটাকে দিয়েছি টাকা জলে গুলে শুধু ঐ শুধু বোতল। ভাবিও দেখেছি একটু করে—যদি আমার বুকে দুধ আসে! দুধ এল না এই হাড়-চামড়ার শরীরে! এক ফোঁটা দুধ পেলে না বাছা আমার, এই তিন দিনের মধ্যে! শেষে আর বোতলও দিতে পারলুম না, আজ সে চলে গেল! ভালই হয়েছে, বাছা আমার এবার খুব বড় লোকের ঘরে জন্মাবে। একটু পেট ভরে দুধ খেয়ে বাঁচবে!"

চলে গেল ভিখারিনী আবার ভিক্ষা মাগতে।

ডাস্টবিন হইতে ভিখারিনীর পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া আমি চলিলাম গোরস্থানের দিকে।...

আজ এমনি করিয়া প্রতি বৎসর বাংলার দশ লাখ সন্তানের মরা লাশ বুকে করিয়া চলিতেছে শ্মশানের পানে, গোরস্থানের পথে।

যাইতে যাইতে দেখিলাম, সেদিকে মন্দির আর মসজিদের ইট-পাথরের স্তূপ লইয়া হিন্দু-মুসলমান সমানে কাটাকাটি করিতেছে।

শিশুর লাশ-কোলে আমি অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শিশুর লাশ যেন একটি প্রতিকার প্রার্থনা, একটা কৈফিয়ত তলবের মত দেখাইতে লাগিল। ধর্ম-মতবাদের তখন শিশুর লাশের দিকে তাকাইয়া দেখিবার অবকাশ ছিল না। তাহারা তখন ইট-পাথর লইয়া বিরাট মারামারি শুরু করিয়া দিয়াছে!

এমনি করিয়া যুগে যুগে ইহারা মানুষকে অবহেলা করিয়া ইট-পাথর লইয়া মাতামাতি করিয়াছে। মানুষ মারিয়া ইট-পাথর বাঁচাইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বঙ্গ-জননী তাহার দশ লাখ অনাহার-জীর্ণ রোগশীর্ণ অকালমৃত সন্তানের লাশ লইয়া ইহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ইহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। ইহারা মানুষের চেয়ে

১৯২২ সালে? মস্কোতে এমএন

ইট-পাথরকে বেশি পবিত্র মনে করে! ইহারা ইট-পূজা করে। ইহারা পাথর-পূজারী।

ভূতে-পাওয়ার মত ইহাদের মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদের মসজিদে পাইয়াছে! ইহাদের বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

যে-দশ লক্ষ মানুষ প্রতি বৎসর মরিতেছে শুধু বাংলায়,—তাহারা শুধু হিন্দু নয়, তাহারা শুধু মুসলমান নয়, তাহারা মানুষ—স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি।

মানুষের কল্যাণের জন্য ঐ-সব ভজনালয়ের সৃষ্টি, ভজনালয়ের মঙ্গলের জন্য মানুষ সৃষ্ট হয় নাই। আজ যদি আমাদের মাতলামির দরুন ঐ ভজনালয়ই মানুষের অকল্যাণের হেতু হইয়া উঠে—যাহার হওয়া উচিত ছিল স্বর্গ-মর্ত্যের সেতু—তবে ভাঙিয়া ফেল ঐ মন্দির-মসজিদ! সকল মানুষ আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঁচুক এক আকাশের ছাদতলে, এক চন্দ্র-সূর্য-তারা-জ্বালা মহামন্দিরের আঙিনাতলে!

মানুষ তাহার পবিত্র পায়ে-দলা মাটি দিয়া তৈরি করিল ইট, রচনা করিল মন্দির-মসজিদ। সেই মন্দির-মসজিদের দুইটা ইট খসিয়া পড়িল বলিয়া তাহার জন্য দুই শত মানুষের মাথা খসিয়া পড়িবে! যে এ কথা বলে, আগে তাহারই বিচার হউক।

দুইটা ইটের জন্য যদি দুই শত মানুষের মাথা দিয়া খেসারত করিতে হয়, তবে বাঙালি জাতির যে এই বিপুল দেহ-মন্দির হইতে দশ লক্ষ ঝরিয়া মানুষ ঝরিয়া পড়িতেছে প্রতি বৎসরে কলেরা-টাইফয়েডের খেলায়, এই মহা-ক্ষতির খেসারত হইবে কত লক্ষ মানুষের মাথা দিয়া?

মন্দির-মসজিদের চূড়া আবার গড়িয়া উঠিবে এই মানুষেরই পায়ে-দলা মাটি দিয়া, পবিত্র হইয়া উঠিবে এই মানুষেরই মনের পবিত্রতা দিয়া, শুধু তাহারাই আর ফিরিয়া আসিবে না, যাহারা পাইল না একটু আলো, একটু বাতাস, এক ফোঁটা ওষুধ, দু'ফোঁটা জল-পানি! যাহারা তিলে তিলে মরিয়া জাতির হৃদয়হীনতার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। তাহাদের মৃত্যুর রক্ত দিয়া সমগ্র জাতি মরিতেছে তিলে তিলে!

আমি ভাবি, যখন রোগ-শীর্ণ জরা-জীর্ণ অনাহার-ক্লিষ্ট বিবস্ত্র বুভুক্ষু সর্বহারা ভিখারিদের দল লক্ষ করিয়া দল দিনের পর দিন ধরিয়া ঐ মন্দির-মসজিদের পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তখন ধসিয়া পড়ে না কেন মানুষের ঐ নিরর্থক ভজনালয়গুলো? কেন যে ভূমিকম্প আসে না পৃথিবীতে? কেন আসে না সেই রুদ্র—যিনি মানুষ-সমাজের শিয়াল-কুকুরের আস্তা ঐ ভজনালয়গুলো ফেলাবেন গুঁড়িয়ে? দেবেন মানুষের ট্রেডমার্কের চিহ্ন ঐ টিকি-টুপিগুলো উড়িয়ে?

মন্দির-মসজিদের সামনে বাজনা বাজাইলে হয় তার প্রতিবাদ, আসে তার জন্যে দুরন্ত হাজার হাজার, আসে তার জন্য [illegible] দেওয়ার দল—গো-ভাগাড়ে শকুনি পড়ার মত!—শুধু দশ লক্ষ প্রাণের তার প্রতিকার হইল না!

মানুষের পশু-প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্ম-মদান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল।

সকল কালে সকল দেশে সকল লাভ-লোভকে জয় করিয়াছে তরুণ। ওগো বাঙলার তরুণের দল—ওগো আমার আগুন খেলার নির্ভীক সাথিরা, ঐ দশ লক্ষ অকালমৃতের লাশ তোমাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া। তারা প্রতিকার চায়।

তোমরা ঐ শকুনির দলের নও, তোমরা আকাশের শিখা, তোমাদের জাতি নাই। তোমরা আলোর, তোমরা গগনের, তোমরা কল্যাণের। তোমরা বাহিরে এস, এই দুর্দিনে তাড়াও ঐ গো-ভাগাড়ে পড়া শকুনির দলকে।

আমি শুনিয়াছি মসজিদের আজান আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। তাহা এক সাথে উত্থিত হইতেছে ঊর্ধ্বে—স্রষ্টার সিংহাসনের পানে। আমি দেখিয়াছি, সারা আকাশ যেন খুশি হইয়া উঠিতেছে।

। কাজী নজরুল ইসলামের 'মন্দির মসজিদ' লেখাটি প্রথমে ছাপা হয়েছিল গণবাণী পত্রিকার ১৯২৬ সালের ২৬শে আগস্ট-এর সংখ্যায় ।

হিন্দু-মুসলমান

একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সাথে আলোচনা হচ্ছিল আমার হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন, দেখ, যে ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে?

হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে উঠলে আমার বারেবারে গুরুদেবের ঐ কথাটাই মনে হয়। সাথে সাথে এ প্রশ্নও উদয় হয় মনে, যে, এ ন্যাজ গজাল কি করে? এর আদি উদ্ভব কোথায়? ঐ সাথে এটাও মনে হয়, ন্যাজ যাদেরই গজায়—তা ভিতরেই হোক আর বাইরেই হোক—তারাই হয়ে ওঠে পশু। যে সব ন্যাজওয়ালা পশুর হিংস্রতা সরল হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে—শৃঙ্গরূপে, তাদের তত ভয়ের কারণ নেই, যত ভয় হয় সেই সব পশুদের দেখে—যাদের হিংস্রতা ভিতরে, যাদের শিং মাথা ফুটে বেরোয়নি! শিংওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গহীন ব্যাঘ্র-ভল্লুক জাতীয় পশুগুলো বেশি হিংস্র—বেশি ভীষণ। এ হিসেবে মানুষও পড়ে ঐ শৃঙ্গহীন বাঘ-ভাল্লুকের দলে। কিন্তু, বাঘ-ভাল্লুকের তবু ন্যাজটা বাইরে, তাই রক্ষা হয়েছে। কেননা, ন্যাজ আর শিং দুই-ই ভেতরে থাকলে কী রকম হিংস্র হয়ে উঠতে হয়, তা হিন্দু-মুসলমানের চোরা-মারা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।

যে প্রশ্ন করছিলাম, ঐ যে ভেতরের ন্যাজ, এর উদ্ভব কোথায়? আমার মনে হয় টিকিতে ও দাড়িতে। টিকিপুর ও দাড়ি-স্তানই বুঝি এর আদি জন্মভূমি। পশু সাজবার মানুষের একি 'আদিম' দুষ্ট ইচ্ছা—ন্যাজ গজাল না ব'লে তারা টিকি দাড়ি জন্মিয়ে যেন সান্ত্বনা পেল।

যে দিন মানব-জগতে পশু-জগতে না জানি কী উৎসবের সাড়া পড়েছিল, যে দিন মানুষের জগতে তারা দাড়ি-টিকির মত কোনো কিছু একটা আবিষ্কার করল!

মানুষের চিরন্তন আত্মীয়তাকে এমনি ক'রে বৈচিত্র্যের [illegible] দেওয়াল খাড়া করে। [illegible] যায়, কিন্তু যুগে যুগে অসহনীয় হয়ে উঠেছে বলেই তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে মনুষ্যত্ব বিদ্রোহ করেছে। হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব! তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব! এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটাও এই পণ্ডিত-মোল্লার মারামারি, হিন্দু-মুসলমানের মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ারে কোনোদিনই ঠোকাঠুকি বাধবে না, কারণ তাঁরা দুইজনেই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের উপর পড়বে না। তিনি সর্বনাম, সকল নাম দিয়ে [illegible]। এত মারামারির মধ্যে এইটুকুই ভরসার কথা যে, আল্লা ওর্ফে নারায়ণ হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তাঁর টিকিও নেই, দাড়িও নেই। একেবারে "ক্লিন"! টিকি-দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা, আমি আলাদা! মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।

অবতার-পয়গম্বর কেউ বলেননি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রীশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি—আলোর মত, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তেরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর; মুহম্মদের ভক্তেরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের; খ্রীস্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রীস্ট ক্রীশ্চানদের। কৃষ্ণ-মুহম্মদ-খ্রীস্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তি নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে। [illegible] সূর্য নিয়ে ঝগড়া বাধাতাম। এ বলত আমাদের পাড়ার সূর্য বড়, ও বলত আমাদের পাড়ার সূর্য বড়। [illegible]

নদীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে যখন দেখি, একটা লোক ডুবে মরছে, মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ-প্রশ্ন করবার অবসর দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান। একজন মানুষ ডুবছে, এইটেই হয়ে ওঠে তার কাছে সবচেয়ে বড়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। হিন্দু যদি উদ্ধার করে দেখে লোকটা মুসলমান, বা মুসলমান যদি দেখে লোকটা হিন্দু—তার জন্য ত তার আত্মপ্রসাদ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না। তার মন বলে, আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি—আমারই মত একজন মানুষকে।

কিন্তু আজ দেখছি কি? [illegible]

মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে। পশুর ন্যাজ গজিয়েছে ওদের মাথার ওপর, ওদের সারা মুখে। ওরা মারছে লুঙ্গিকে, মারছে নেংটিকে; মারছে টিকিকে, দাড়িকে। বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির কি অবসান নেই!

মানুষ কি এমনি অন্ধ হবে যে, সুনীতি বাবু হয়ে উঠবেন হিন্দু-সভার সেক্রেটারি এবং মুজিবর রহমান সাহেব হবেন [illegible] প্রেসিডেন্ট?

রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম, [illegible] মাথায় এক হাতের টিকি গজিয়েছে।

মনে হ'ল, পশুও ন্যাজ কাটছে, আর মানুষের গজাচ্ছে।

[illegible]

অঞ্জলি লহ মোর সংগীতে

অরুণকুমার বসু

যে যুগে সংগীত জগতে [illegible] পারিবারিক ঐতিহ্যের পরম্পরায় তাঁর জীবন শুরুর থেকে সংগীত শিক্ষা ও সংগীত সাধনার যাবতীয় সুযোগ পরিস্থিতি জানা অপরিহার্য। কিন্তু নজরুলের সাংগীতিক জীবন শুরু এমনই অপ্রত্যাশিত ইতিহাসে বিস্তার ঘটে পড়েছে। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক বাল্য শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছাত্রজীবন, ভিখারির অর্থাৎ অন্নসংস্থানহীন অবস্থা, একক চেষ্টায় মাথা গুঁজে থাকার জায়গাটুকুও নেই — এমন পরিবেশে একটি ছেলে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা অনুষ্ঠানের নিয়মিত সুযোগ না পেয়েও স্বাভাবিক এবং উচ্চাঙ্গ [illegible] সাংগীতিক ঐতিহ্য তিনি যে পরিমাণে আয়ত্ত করেছিলেন, তা একেবারে স্বাভাবিক অবচেতনধারার প্রতিভা প্রাচুর্যেরই লক্ষণ। কৈশোরের চুরুলিয়ার প্রথম গ্রামীণ পরিবেশে লেটো ও কবিগানের দল নজরুল লোকসংগীত ও লৌকিক সংস্কৃতির নানা উপকরণের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ ঘটিয়েছিলেন। এই পর্বের কোনো রেকর্ড নেই। তাই শুধু অনুমান করতে হয়, শুধু সেগুলো গানই তিনি রচনা করেন নি, হয়তো কবিগানের আসরে প্রচলিত পুরাতন কীর্তন ও বাউল, ভাটিয়ালি শ্যামাসংগীত তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে থাকবে। [illegible] বা ঝুমুর গান প্রভৃতি বাংলার লৌকিক রীতির গান লোকজীবন থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নজরুলের ভেতরে এসেছিল। সেগুলিকে তিনি আপন সহজাত প্রেরণায় কতটা আত্মস্থ করেছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনা করা শক্ত। তাঁর এই প্রথম জীবনের শিক্ষানুশীলনের ধূসর, নজরুলের জীবনী রচয়িতা প্রায় সবাই বিদ্যালয় জীবনে তাঁর সংগীত শিক্ষকের উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু ঐতিহ্যের কিছু উপাদান তিনি পেয়ে থাকতে পারেন। সেটুকু বাদ দিয়ে অন্যান্য পেশাদার সংগ্রহে কিছু অনুশীলনের প্রসঙ্গ মনে রাখা যেতে পারে। তবুও তা যথেষ্ট নয়। সৈনিক জীবনে বেশ-কিছু সংগীতরসিক সঙ্গে সেনাবাহিনীর কাজে [illegible] কিংবা সু-গায়কদের সাহচর্য, তাঁদের সঙ্গে সংগীত-অভিজ্ঞতার বিনিময়, তাঁদের সহায়তায় একাধিক বাদ্যযন্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ — এই জাতীয় কিছু স্মৃতির যোগসূত্র থেকে নজরুল জীবনের একটি সাংগীতিক পটভূমিকার আভাস মেলে। তবু কিছু ফাঁক থেকে যায়। কৈশোর-যৌবনে নজরুল রবীন্দ্রনাথের গানের একান্ত অনুরাগী ছিলেন, বিভিন্ন স্বরলিপির সাহায্যে সে সব গানের চর্চা করতেন। ১৯১৯ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বর্ধমানের গ্রাম পরিবেশে, কি করাচীর সৈনিক পরিবেশে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে আশৈশব ঐকান্তিক যোগ কেমন করে তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়েছিল, তাও বিস্ময়ই জাগে।

নজরুলের এই স্বরলিপি-দক্ষতা অবশ্য একটি বিশেষ শাখা। কলকাতায় পিয়ানো-শিক্ষার অভিজ্ঞতা হয়তো যথেষ্ট হয়েছিল নজরুলের। তবু সাংগীতিক বিভিন্ন আসরের মাধ্যমে গান শেখা স্বোপার্জিত বিদ্যা, ওস্তাদজির তালিম শিক্ষা। এই একান্ত শিক্ষানবিশের অনেক বছরের পরেই সম্ভবত তিনি শুরু করেছিলেন। বাংলার নানা মাসিক স্বরলিপিগুচ্ছ উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে প্রকাশিত হয়েছিল, পত্রিকাতেও স্বরলিপির স্থান নির্ধারিত ছিল। এই জাতীয় স্বরলিপি-সংগ্রহ হয়তো তাঁর অজানা ছিল না।

করাচি থেকে ফেরার পর তাঁর বিভিন্ন পত্রের মধ্যে স্বরলিপির বই দেখা গেছে। মুজফ্ফর আহমদের সাক্ষ্য জানা যায়, কলকাতায় আসার পর রবীন্দ্রসংগীতই তাঁর পরিবেশনের দীর্ঘস্থায়ী আকর। রবীন্দ্রসংগীতের আসরে গান গেয়ে অনুষ্ঠানে তাঁরা মুগ্ধ থাকত। মুজফ্ফর আহমদ তাঁকে 'রবীন্দ্রসংগীতের হাফেজ' বলতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম যে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল শান্তিনিকেতনে, সম্ভবত ১৩২৮-২৯ সালের আগেই, তার স্মৃতিচারণ বহু প্রত্যক্ষদর্শী কেউ করেছিলেন। উপাসনা সর্বক্ষণ নজরুল মুগ্ধ কণ্ঠে গীতাঞ্জলির গান গেয়ে চলেছিলেন। এই স্মৃতি-বর্ণনার একটি অংশে রবীন্দ্রনাথও নাকি বিস্ময়প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে নজরুল নাকি বহু কবির সামনে সেদিন তাঁর গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন, নির্ভুলভাবে বাণী বিন্যাস হয়। নজরুলের স্মৃতিচারণে মুজফ্ফর আহমদ জানিয়েছেন যে নজরুলের কলকাতা-বাসের প্রথম পর্বে সংস্কৃতি জগতের চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী হিসেবে অপরিচিত পরিচিত ছিল। নজরুলের সঙ্গে উক্ত শিল্পীর ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁর কাছে থেকেও নজরুল রবীন্দ্রনাথের গান শিখে থাকতে পারেন, সেকালে শহরের ব্রাহ্ম পরিবারগুলিতে রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন চর্চা ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ও ভিন্ন সামাজিক অবস্থানে নজরুলের পক্ষে সেখানে প্রবেশাধিকার সুলভ ছিল না। অতএব ধরে নিতে হবে, রবীন্দ্রসংগীতে নজরুলের পক্ষে রবীন্দ্রসংগীতের মাধুর্য আস্বাদনের অবকাশ দূর দিয়ে, যাই ঘটুক, কোনোরূপ ত্রুটি ছিল না। আর তখন সুরকার হিসেবে যখন রবীন্দ্রনাথের গানের গুরুত্ব বা গীতিধর্মকে তিনি অধিগত করতে পেরেছিলেন, এখানে কোনো নজরুলগীতির শিল্পীর পক্ষে তা হয়তো সহজ নয়।

এই জাতীয় কিছু অনুমিতি দিয়ে নজরুলের সংগীত-জীবনের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় পুনরুদ্ধার করলেও, অনেক প্রশ্ন তবু অনুত্তরিত থাকে। অনেকগুলো স্তরে বেশ কয়েকটা ছবি পাওয়া যায় না। আর এই অসম্পূর্ণ জানার দ্বারা নজরুলের সাংগীতিক প্রতিভার বিকাশের পটভূমি পুরোপুরি আয়ত্ত হয় না।

১৯৫৭ সালে রাজবাড়ীতে-র একটি ছবি কবিকে খাইয়ে দিচ্ছেন।

২

কলকাতায় এসে বন্ধু ও পরিচিত মহলে গায়ক-শিল্পীরূপেই নজরুল প্রথম প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছিলেন। মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত, বিজলী, কল্লোল প্রভৃতি গোটা কতক পত্রপত্রিকায় নিয়মিত কিছু কবিতা, কয়েকটি গল্প ও দু একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লেখা ছাড়া তাঁর নিজের সময় বিশেষ সংগীতের 'আসরের ঘরে'ই জমা থাকছিল। যে কোনো মহল-মজলিসে তাঁর উপস্থিতি মানেই গান। একখানি হারমোনিয়াম যন্ত্র হাতের এলাকায় পৌঁছালেই নজরুল হয়ে উঠতেন উচ্ছ্বসিত। তাঁর উদ্দাম চুল, উদাসীন বেশবাস, উদ্ভাসিত দৃষ্টি-র সঙ্গে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ সব এক জোড়ে সুর মেলাত এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই স্থান কালপাত্রের ঊর্ধ্বে উচ্ছলতা হয়ে যেত তার চালচলন। বন্ধুদের স্মৃতি-উদ্ধারলেখে সমকালীয় বিবরণে কোনো তথ্য-বৈপরীত্য পাওয়া যাবে না।

নজরুলের অসম্ভব গীত প্রবণতাকে উসকে দেওয়ার জন্যে জোড়াগের সোনার উৎসাহের সঙ্গে কিছু পরিমাণ তাম্বুলচর্বণ ও ঘন ঘন পেয়ালা চা-ই যথেষ্ট ছিল। এই পানচর্বণের নিয়মিত অভ্যাস ও দুর্বলিত শরীরের অন্তর্ধারা দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পর্যন্ত নজরুলের গীতজীবনের নিত্য অর্ঘ্য ছিল বলে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। তবে এতদুভয়ের মিলিত প্রেরণা নজরুলের সৃজনশিখরে যে কম্পন সঞ্চার করুক, এর বিষক্রিয়া কবির দেহযন্ত্রে কোনো ব্যাধিবিকারের ভূমি নির্মাণ করে চলেছিল কি না, কে জানে। এমনকী, কবির সজ্ঞান জীবনের শেষ দশকে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গকে পর্যন্ত পর্যুদস্ত করেছিল এই নেশা-দম্পতি। একাধিক স্মৃতিবিবরণ থেকে জানা গেছে, সকাল থেকে আরম্ভ রাত্রি অবধি তাঁর পান গ্রহণ হতে থামেনি, মধ্যাহ্ন ভোজন উপভোজন ইত্যাদি-উৎপাদনের কারখানায় প্রতিনিধিকারে পারেনি শুধু এই তামাক চা তাম্বুলই দুশ বছরের প্রকৃতি দিয়ে গেছে।

গায়ক-শিল্পী হিসেবে নজরুল শুধু সহজ লভ্যই ছিলেন তাই নয়, ছিলেন সুলভও। কারণ জনসমাবেশের মনোরঞ্জন করতে তাকে শুধু পীড়াপীড়ি দিয়ে ডাকা হত, সেখানে পৌরোহিত্যে সম্মানদক্ষিণা ছিল না। পান ও পানীয়ের দাক্ষিণ্যেই আসরতোষ শিল্পী উজাড় করে দিতেন নিজেকে। মুজফ্‌ফর আহমদের স্মৃতিকথায় জানা যায়, কারখানার প্রতিবেশী পর্যন্ত ডেকে নিয়ে যেতেন নজরুলকে। সজনীকান্ত লেখেছেন যে বাড়ির দোতলায় তাঁর গানের ফোয়ারা ছুটেছে বিকেল থেকে অনেক রাতেও তাতে ভাঁটা নামেনি। বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন নজরুল যে ঘরে ঢুকতেন সে ঘরের সবাই ঘড়ি দেখতে ভুলে যেতেন। অন্যতর লেখক সাংবাদিক রাজনৈতিক নেতা থেকে শিল্পী অভিনেতা স্বজন-পরিজনদের স্মৃতিলিখন থেকে নজরুলের এই আসরভোলা গীতোন্মুখতার সুস্পষ্ট অন্তর্ময় মূর্তিটি অকপটে আঁকা দেখা যায়।

কিন্তু কী গাইতেন নজরুল এসব আসরে? তা কেউ সবিস্তারে জানাননি। তবে উনিশ-কুড়ির বয়স থেকে কয়েক বছরের গানের তালিকা নিয়ে পরীক্ষা করে, মনে হয়, সবচেয়ে গাইতেন রবীন্দ্রনাথের গান, তারপর স্বদেশ ও পার্টির কিছু হৈচৈ গজল, কিছু হিন্দি গানের বন্দিশ, অনুরোধে আরো নানা জাতের লঘুচালের বাংলা উর্দু ফারসি গান, কিছু পল্লীগীতি, কাওয়ালি—১৯২৫-২৬ এর পর থেকে নিজেরই বাঁধা বাংলা গজল। স্বরচিত কিছু গান অবশ্য গোড়া থেকেই আসরের কথা।

এই কবিটির বয়সের মধ্যে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বাদ থেকে যেতো তাঁর, চল্লিশ থেকেই। পঁচিশ বছর বয়স থেকে তাঁর কাব্য-চর্চার শুরু হোল তা শুধু করেছে—গ্রামোফোনের দিকের শক্তি আরও সব ছাপানো পুরোপুরি হওয়া অনিবার্য। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ ত্রিশাধ পর্যন্ত এই ধারা। ১৯২৮-এ তো পরপর দুখানা গীত-ই বেরিয়েছে 'বুলবুল' ও 'জিঞ্জির' নামে, পরের বছর 'চোখের চাতক' সহ। এইভাবে কবিতা পাশাপাশি গানের রচনা হতে হতে নজরুল তাঁর উত্তরকালের গীত-ঐতিহ্য স্পষ্ট সংগীতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন।

বলে রাখি, এই মহৎপূর্ব গান গাইবার আবেগ থেকেই নজরুলের সংগীত-বাসনার মধ্যবিত্তেরা থেকেও জন্ম হয়েছিল। আর তাঁর দুঃসাহসিকতা এবং কবিতা বাইরে মুক্তির পথে পুষ্টি নজরুলের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গির মধ্যেই লক্ষণ ছিল। আর তখন সেটুকুর পরে তিনি গান রচনা করেছেন, গলা খুলেছেন, সুর দিয়ে নিজের চমকেই গেয়ে গেছেন—তখন সুরের প্রতিই তাঁর পক্ষপাত ছিল বেশি। পরবর্তী সংগীতের আরও সুসংবদ্ধ রূপের দিকেই তাঁর আকর্ষণ বাড়ে। কুড়ি-একুশ বছর পর্যন্ত সেই বাংলা উচ্চাঙ্গের লোক-কবিয়ালদের প্রতিভা যার বিকাশের সুযোগ পায়নি। এই বয়সেই পরে নজরুল তাঁর লেখাকে শিক্ষিত সমাজের কাছে পরিচিত হওয়ার জন্য। এ সময় থেকে তিনি বাংলা গদ্য উপন্যাস কিংবা কাব্যকবিতা আর গান লিখেছেন, অনেকই কাব্যেও গান দিয়েছেন। সে-সবই বিশেষে কবি ও লেখককালে গড়ে তোলার প্রথায়। অবশেষে তাঁর সাহিত্য-সাধনা এই কবিতা ও গানের পথ দিয়েই এগিয়েছে গীতিকারের দিকে প্রচুর ঝোঁক। নজর-জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর সাহিত্যসমাজ আবার অন্য আধুনিক অঙ্গনে বার বার তাঁর ডাক পড়েছে।

তবে যেহেতু গান গাইবার সহজাত নিঃশেষ বুঝে নেননি তিনি, তাই তাকেই সভাপতিত্বের গানের সভাতে গেয়েছেন। এইভাবে দেখের সমাজে নজরুলের ডাক পড়েছে কাব্যপাঠের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বোধনী ও সমাপনীতে অনুষ্ঠানিকভাবে গাইতে, কিন্তু গীতিকবিতেরই নিষ্ঠা নিতেন না। নজরুলের স্বকণ্ঠে উদ্বোধন-গীতে সভাসমাবেশের শুরু হোত। নজরুলের নিজস্ব কবিতাও গানেই, কাজেই গান আর গানের পথে বিশেষত বাংলা উৎসবের অর্থ হয়ে উঠেছে।

এইভাবে উৎসবগুলি গীতের প্রতিভা-সুরের বাণীই নজরুল দিয়ে দিয়ে তাঁর কবিতার গানের রূপও গড়ে তুলেছেন, যার একেবারে রবীন্দ্রসংগীতের পুনরাবৃত্তি থেকে। উদ্দিষ্ট হয়ে গেয়ে যেতে শিখেছেন না অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্রে অথবা অভিভাবকের হাতে বিদ্যাবয়সে কোনো সময়োপযোগী গানের কথা দিয়ে থেকে উদ্দিষ্ট হয়ে উঠেছে। তাৎক্ষণিকতাকে সংগীতে রূপ দিয়ে কর্মোদ্দীপনায় অসাধারণ নজরুলের জীবনে বারে বারে ঘটেছে। উপলক্ষের অনিবার্যতা মেনে গেছে পুষ্টির সঙ্গে, অন্যান্যদের আহ্বান বা নিমন্ত্রণের পথে হয়েছে তাদের উৎসব। সামাজিকভাবে দাবিতে এইভাবেই নজরুলের অনেক বিশেষ গান রচিত হয়েছে, তবে থেকে সেগুলি সৃষ্টির তালিকায়। পরে থেকে যেত এরকম গান সময়মতো লেখানো তার বিপুল কর্মতালিকাতে অতিরিক্ত হয়েছে। গান বিশেষ যে সময়োচিত পূর্ণতর রচনা, গানের আসরেও এই প্রসঙ্গে সেগুলি আরো উজ্জ্বল পৌঁছানো সার্থক হয়েছে। সুরের সাথেও যোগাযোগের প্রায়

একটু হয়ে গেছে সে গান। ভূমিকা বাজবারে কর্মীদের সঙ্গে দিয়ে গান যেন গাইতে গাইতে সম্ভাবনা করেছেন তিনি প্রতিটোকে বিভিন্নের পুনরাবৃত্তে সকল প্রচারশীলতা দিয়ে। সে সব গান অনেকদিনের মতো সারা জনগণের কণ্ঠে কণ্ঠে সংকেতিত হয়ে গেছে। শান্তিনিকেতনে উৎসব হয়ে গেছে সরল-গীতসমূহে এরই মধ্যেই হয়েছিল যে ভূমিকার বিশেষতা পর্বে নজরুলকে তাই গানের ভাবার পরশ পরিষ্কারে উদ্ভব করে। কোনোদিন উনি তখন থেকেই যেমনভাবে নজরুল পুষ্টতে পারছিলেন, তার অনেকেও অনুকূল অবিরত ঘুরনার কম নয়। সেইহেতু সচিত্র জীবনের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে তিনি সামাজিক পত্র-পত্রিকায় কবিতার সঙ্গে গানও পাঠাতে শুরু করেন। তাঁর গানের জনপ্রিয়তা এ জাতেই বাড়ছিল আর রবীন্দ্রনাথের গানের মতো তাঁর গানের স্বরলিপি প্রকাশেও নজরুল সতর্ক হলেন। দেখা গেল যে, অন্তত এর ফলে তাঁর কিছু গানের তৎকালীন সুর সংরক্ষিত হয়েছে, অথচ স্বরলিপি করে না রাখার জন্য অনেক জনপ্রিয় গান সুর বিস্মৃত হয়ে গেছে। নজরুলের গানে গাইবার একেবারে হয়ে পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ কোনকিছু বাড়ে পরম্পরাগত প্রচলিত হয়েছে বলে শোনা যায়। তাঁরা কেউ কিন্তু নজরুলের এই সমস্যার সমাধানে স্বরলিপির সুর সংরক্ষণের চেষ্টা করেননি। কেউ কেউ আবার দু-একটি সংরক্ষিত সুরের উপর কেরামতি করে তার সংস্কার-সাধনের চেষ্টা করেছেন। সুতরাং অনায়াসে নজরুলের নীরব বাকরুদ্ধ অবস্থা-এর বাড়া আর কান্না কোথায়।

৩

রবীন্দ্রনাথের গান নজরুলের গীতি মানসকে কী পরিমাণে পুষ্ট করেছে বা উদ্দীপ্ত করেছিল, নজরুলগীতির ভূমিকায় পরিমাপ সেই 'জল মেপে'র বিবরণও নিশ্চয় লঘু না। নজরুল প্রথম দিকে রবীন্দ্রসংগীতই অজস্র গাইতেন, তা অনেকেরই লেখা থেকে জানা যায়, কিন্তু জীবনের শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠে কী হয়েছিল, তা জানা আর সম্ভব নয়। তবে কত গভীর রবীন্দ্রসংগীত যে নজরুলকে আচ্ছন্ন করে রাখত তার সাক্ষ্য, নজরুলের গল্প-উপন্যাসে তার কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। 'বাঁধন হারা' (১৯২২ খ্রী) উপন্যাসে নজরুলের রবীন্দ্রনাথকে—তুমি সকালের সোনালো, সবুজের পরশ ছোঁয়া যায়, আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে, দিবস গেলে করব নিবেদন, এমনদিনে তারে বলা যায়, এস হে এস সজল ঘন বাদল-বরিষণে, আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমার নয়ন-ভুলানো এলে, ওগো তুমি কবি ছবি, কেন যে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়? অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন, আমি কান পেতে রই, ঝরঝর বরিষে বারিধারা, তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী—এরকম গোটা গানের উদ্ধৃতি আছে। নজরুলের মতো তাঁর পাঠক প্রতিভার কাছেও রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি অনুরাগ এমনি তীব্র। নজরুলের গল্প-উপন্যাসে মুসলমান সমাজ ও মুসলমান চরিত্র এসেছে স্বাভাবিকভাবে, অথচ সেই পরিবেশে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহারে নজরুলের সংগতিবোধ বিঘ্নিত হয়নি। 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০) উপন্যাসে—বুকের তলা জল বুদবুদিনীরে, ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ, আরো কে তোমার ঘরে, অমলধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া, অনন্তনীল দূরে পারে, কেন গেল তোমার পথ চেয়ে, কেন মেঘ অধীর

বটি—সমাপ্তি উদ্ভব ঘটিয়ে। রেকর্ডের কাছে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে আকাশবাণীর প্রচারিত হীরামন্নার উপন্যাস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এই রবীন্দ্রসংগীতের গুলি—কত এমন সুখ বুলিয়ে, প্রেমিয়া পাগলপারা নীল গগনে, মনে হয় এমন মধুর কথা, তাহারো আকাশ পরিয়ে। আবার, সখি ঝরিছে হায় হেরে দিয়ে গায়, তবে যে দুখ সব পারে সকল। ১৩৩৪ সংখ্যক পত্রিকায় প্রকাশিত বুলবুলিকা গল্প মনে রেখেছে পায় না দেখিয়ে পল্লী মাঝে। ১৩৪৭ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত শিউলিমালা গল্পে আবার গোলাপিকা এবং বুঝি কাছে গানের উদ্ভব আছে।

বাংলা নজরুলের বিষয় রবীন্দ্রসংগীত প্রীতিকে লেখক নজরুল তাঁর দুটি প্রবন্ধে আর সকলে করে তৃপ্তি পেয়েছেন। গল্প-উপন্যাসে প্রবন্ধের সংলাপে রবীন্দ্রসংগীতের এই সুসমৃদ্ধ ব্যবহার, রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি এত গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় নজরুলের সাংবাদিক গদ্য, নাটক-নিবন্ধেও, এই উপন্যাসেও। মৃত্যুক্ষুধা (১৩৩৭) গ্রন্থে সংকলিত দুটি চেনিশ আদি উদ্ভব বৈশিষ্ট্য এক সংবাদ যত্নের সাক্ষ্যপাশ দুটি পাতা। হাসনাহেনা-নিমন্ত্রণ গ্রন্থমধ্যই সাথ দেখার আদি উদ্ভবের ইংরেজ রোমান্টিকদের ধারায় নজরুল রবীন্দ্রনাথের গানের পার্থক্য রয়েছে এই ভাবে অনুসরণ-উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের উদ্ধৃতি আছে।

এখনো ভুবনে খেলা আর মেলা নিয়েছে ফুলে
আজি কি বাঁশী বাঁশি সে কথা কি গেছ ভুলে।

শীতকালে নজরুলের বিষয় বাণী-সাদৃশ্যে রবীন্দ্রসংগীতের লক্ষিত প্রভাব রোজনা লেগেছে। নজরুলের কয়েকটি গানের বাণীর দিকে নজর দিই। 'চক্রবিন্দু' ও 'বনগীতি'তে সংকলিত গানটির আদ যেমন রবীন্দ্রনাথ দেখা যাক—

তুমি সুখের মেঘে এসে বলে কত কথা কি ছবি
কত কথা যাই তোমার চোখেই নিবিড় করে কবি।

রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানের প্রেমের প্রাধান্য পাওয়া যায় নজরুলের এই গানের বাণীতে—

আমার নয়নে নয়ন রাখি
পান করিতে চাও কোন অমিয়
আছে এ আঁখিতে শুধু অশ্রুজল
মধুর সুধা নাই পরানপ্রিয়।
ওগো এ শিখী পাপিয়া মোরে
পরিতে চাও কোন মালার প্রতিমারে
ওগো এ পুজারি দেখো এ আরতি
কাপরে পাষাণ প্রাণ-দেবতারে।
এ দেহ ভুবনে যদি থাকে মন
ওগো প্রেমাস্পদ নিও হে নিও।।

নজরুলের 'কত কথা ছিল তোমায় বলিতে' 'চল মন আনন্দধাম', 'কাহারে চেয়ে কত ভালো বাসাটি', এই জাতীয় অনেক গানের ভেতরই রবীন্দ্রগীতির ধ্বনি পাওয়া যায়। 'গানের বাণীর পথ ধরে' এই বাণীর ছন্দায় পরিণতির কারণে নজরুল রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। যেমন 'আজো যে মধুপতি' সবার কাছে বুকধারার পদাবলিতে। বিশেষ গানের উদ্ভব না করলেও বোঝা যায় নজরুলের গানের আবেশ রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রিক, যেমন এই সমস্বীর্ণতি :

মেঘ ডাকলেই দোলা লেগেছে
আমার মনে কোথায় উদাস
কোকিলকণ্ঠ পলাশফুলের
দোলায় হয়ে কী দিয়ে যায়।

নজরুলের 'শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে' যেন রবীন্দ্রনাথের 'পুরানো সেই দিনের কথা'র প্রেমের। তাহারা 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে' এবং পথিক দুর্জয়ের প্রেম' বাণীতে ভাবে আসে। রবীন্দ্রনাথের 'জগতে দুঃখ না দিও শুধু দিশিল কবরী কবিতা পথ অবিনাশিতারে মনে পড়ে নজরুলের এই গানের বাণীর দিকে তাকালে—

নাই পরিলে নোটন খোঁপায় ঝুমকো জবার ফুল
এমনি এসো লুটিয়ে পিঠে আকুল এলোচুল।
সন্ধ্যাবিহীন লজ্জা দিয়ে এমন তুমি এসো প্রিয়
তোমার সুখে না মাখাতে হয় যদি মোর ভুল।

গোধূলিতে নাই করালে গৌরী উলো শাড়ি/ ভুবন ভরে নদী-র দিকে আলোর সাথে আড়ি।

যেমন আছ তেমনি এসো নাইবা তুলে শীষ খোঁপা
সেই লুটিয়ে উঠিছে বুকে আলোর অলসসুর।।

নজরুলের 'মৃদু হীনশাখিনী ছিলি তোমারে চিনি, অবনিপ্রান্তিনী চপল রঙ্গিনী', 'তুমি যদি রাধা হতে তুমি মুদিতা আনমনী', 'একলা ঝাঁপি গানের করুণ সুরের প্রেমে', 'গীতল-সিন্ধু নিয়ত নিয়ত' 'অন্তরে ধারায় বর্ষা পড়ে দোলে বিনিময় খাতে',
'শাওন রাতে যেন নিবিড়া দেয়ে আছি, অভিমানা সুরে আমার পরির নিতি দেখে যায় কমল গীতি' প্রভৃতি অনেক গানের বাণীতে নিবিড় রবীন্দ্রসংগীতের আবেশ দেখা যায়। দু-একটি গানের সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধারযোগ্য—

আমার আছে অতীত বেদন, তোমার আছে বর,
তোমার আছে পাটের তরী, আমার সাগর।
তোমার আছে ফুলের আশা,
আমার অকূল কেঁদে ভাসা,
আমার আছে দুখ অন্ধকারে, তোমার প্রদীপ-কথা।।
বাজুক তোমার দখিন হাওয়া, আমার বাজুক ঝড়
তোমার তরে চন্দ্র তারা, আমার মেঘাকার
তোমার তরে এসব হাসা,
তুমি সুখের সুখের মেলায়,
আমি দুখে-দরজার দলে,
ঘুমিয়ে তোমায় যেতে বাঁশী এল বিপুলতার।।

অনুরূপ আরো একটি গান নজরুল গীতি-সংকলনে পাই—

পরজনমে মোর নিবিড় দেখে থাকি
তোমার বনে আজ উৎসবের রাতি।
তোমার আছে হাসি, আমার অশ্রুজল
তোমার আছে চাঁদ, আমার বেদনা,
তোমার কাছে বর, কড় আমার সাথী।।

সুরের দিক থেকে নজরুলের গানে বহির্মুখ প্রভাব, এ কথাও অস্বীকার নয়। নজরুলের প্রথম লিখিত গীতিসংকলন বলে 'বুলবুল'-কেই চিহ্নিত করা হয়, তার প্রকাশ কার্তিক ১৩৩৩ (১৯২৬)। তারও আগে থেকেই [illegible] কবিতা ও গানের সংকলনগ্রন্থ ঘটেছে। নজরুলের প্রথম দিকের গান মূলত ছিল স্বদেশ-গীতধর্মীয়, [illegible] উদ্দীপিত। [illegible] শোষণ, বঞ্চনা, শৃঙ্খলিত [illegible]। [illegible] 'বিষের বাঁশি'-র 'দুর্বিনীত' [illegible] কবিতা—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] একটি [illegible] 'বোধন', [illegible] সঙ্গে—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] আত্মশক্তি, [illegible], সর্বহারা, [illegible] গান, মুক্তি [illegible] গান, [illegible], [illegible] বন্দী, শিকল-পরার গান, [illegible] গান, [illegible] গান, [illegible], [illegible] গান, [illegible] গান—[illegible] এই গান [illegible] কবিতা [illegible]। [illegible] রাজনৈতিক [illegible]। [illegible] 'কারার ঐ [illegible]'। রবীন্দ্রনাথের '[illegible]' [illegible] নজরুলের [illegible] গানই [illegible]। যেমন এই গানটি

বল নাহি ভয় নাহি ভয়
বল মাভৈঃ মাভৈঃ [illegible]।
বল [illegible]।

[illegible] এই [illegible] নজরুল-রচিত [illegible] একটি [illegible], [illegible] নজরুল [illegible]—

[illegible]
[illegible]
মুক্তি [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible] নজরুল [illegible] গান দিয়ে। [illegible] শিকল-পরায় [illegible] কথা [illegible]—

শিকল পরার [illegible]
শিকল [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] নজরুল যে গানটি [illegible] রাজনৈতিক [illegible] তুলেছিলেন তার একটি স্তবক—

এসো এসো এসো ওগো মরণ
এই মরণ-ভীতু মানুষ মেষের ভয় করো গো হরণ
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে

তাথৈ থৈ থৈ তাথৈ থৈ থৈ তাদের বুকের পরে ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন-ভরা চরণ। (প্রলয় শিখা)

[illegible] গান, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] বন্দী, [illegible] গান, [illegible] গান, [illegible] গান, [illegible]— এই [illegible]। [illegible] নজরুলগীতির [illegible] প্রকাশ করে [illegible]। [illegible] এই [illegible]। [illegible] নজরুলের [illegible]। যেমন

এসো বিদ্রোহী মিথ্যাসূদন আত্মশক্তি বুদ্ধ বীর
আনো উলঙ্গ সত্যকৃপাণ বিজলি-ঝলক ন্যায়-অসির।

(আত্মশক্তি)

বল মাভৈঃ মাভৈঃ নবযুগ ওই এল ওই
এল ওই রক্তযুগান্তর রে
[illegible]।
[illegible]।

তাহার পর (শ্রাবণ ১৩৩১) [illegible] প্রকাশ পায়। [illegible] নজরুল [illegible]। [illegible] নজরুল [illegible]।

ভাঙার গান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে জাগরণী, মিলনগান, মোহান্তের মোহ-অন্তের গান, আশু প্রয়াণ গীতি, পাহাড়ি গান প্রভৃতি গীতি গুচ্ছ। জাগরণী কুমিল্লায় রচিত বিখ্যাত একটি গণসংগীত যেটি হুগলিতে গাইতে গাইতে নজরুল পদপরিক্রমা করে সেদিন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন—ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও। হুগলির তারকেশ্বরে তৎকালীন মোহান্তের পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সেদিন সারা দেশে যে তীব্র গণরোষ জেগেছিল, স্বয়ং দেশবন্ধুও তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই মোহান্তবিরোধী আন্দোলনে তীব্র গতিসঞ্চার করেছিল বলে জানা যায়, কিন্তু তার অগ্নিক্ষরা সুরটি কোথায় গেল তা আর জানার আগ্রহ কারও নেই—

জাগো আজ দণ্ড হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী
ডুবালো পাপ-চণ্ডাল তোদের বাংলাদেশের কাশী।

'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম মোরা ঝরনার মতো চঞ্চল' পাহাড়ি গান শিরোনামে এই গানটি পরে ছায়ানট (১৩৩২) কাব্যেও সংকলিত হয়েছে। কিন্তু আপন কবি স্বভাবের যে উদ্দামতা নির্ভরতা চঞ্চলতা এই গানে নজরুলকে সঠিকভাবে শনাক্ত করে, তার সুরটি হিসেবী হয়ে গেছে। আজ যে গানে যে সুর ব্যবহৃত হয় তা নজরুলের নিজস্ব সুর নয়, তা 'তুলকাম করা বিদিশোবর্জন' মাত্র।

খ্যাতিমান ব্যক্তির আকস্মিক প্রয়াণেও নজরুল একাধিক গান লিখেছেন। আশুতোষ প্রয়াণগীতি আছে ভাঙার গানে, চিত্তরঞ্জনের বিয়োগে রচিত গান অকালসন্ধ্যা আছে চিত্তনামা-য় (১৩৩৩ আশ্বিন)। সর্বহারা (১৩৩৩ ভাদ্র) কাব্যেও উদ্দীপক গণসংগীতের অভাব নেই, কয়েকটি তো বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের অমোঘ-বিশেষের স্মারক। কৃষাণের গান (ওঠ রে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল), শ্রমিকের গান (ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল), ধীবরদের গান (আমরা নিচে পড়ে রইব না আর), ছাত্রদলের গান (আমরা শক্তি আমরা বল আমরা ছাত্রদল), কাণ্ডারী হুঁশিয়ার, প্রার্থনা (এসো যুগসারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়)—কোনোটির সুরতালের স্মৃতি আজও ধূসর হয়নি। ফণিমনসা কাব্যেও (১৩৩৪ শ্রাবণ) মন্বন্তর বিষয়ক একটি গান (আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে এলে) আছে, যার সুরটিকে এতদিনে কোনো অজ্ঞাতলোকে বিসর্জন দেওয়া হয়ে গেছে!

সর্বহারা (১৩৩৩ ভাদ্র) কাব্যেও অনেকগুলি উদ্দীপক গণসংগীত স্থান নিয়েছে, তার কয়েকটি আজও পরিচিত, কয়েকটি দুর্ভাগ্যক্রমে সুরহারা। গানগুলি এইঃ ওঠ রে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল (কৃষাণের গান), ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল (শ্রমিকের গান), আমরা নিচে পড়ে রইব না আর (ধীবরের গান), দুর্গম গিরি কান্তার মরু (কাণ্ডারী হুঁশিয়ার), এসো যুগসারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয় (প্রার্থনা)।

ফণিমনসা (১৩৩৪ শ্রাবণ) কাব্যে নবযৌবনকে উদ্দেশ করে লেখা একটি গান আছে আজ না চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে, যার সুরের ইঙ্গিত নেই। সিন্ধু-হিন্দোল (১৩৩৪) কাব্যের আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর: আমি প্রায় হয়ে আসব যখন, তুমি আমায় অবশেষে কই তো বলি বলি, তুমি মলিনতায় থাকো যখন গানগুলি গানোচিত নয়, বরং প্রেমের গান এবং কবির তৎকালীন ব্যক্তিগত প্রেমের কথা বিরামহীন স্পন্দিত। কিন্তু গানগুলির সুর সংরক্ষিত হয়নি।

পরবর্তী কাব্যগুলির অন্তর্বর্তী গান অধিকাংশই প্রেমবিষয়ক, রোমান্টিক পরিবেশে থেকে কবির সংগ্রহ সুরবহিতার পরিচায়ক। ছায়ানট (১৩২২) কাব্যের ঐ কেন বন্দী তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে (বিজয়িনী), ওরে আমার বুকের বেদনা (বেদনা-অভিমান), আমার নিশ্চিথের চাঁদের শশী (শেষের গান), নিরুদ্দেশের পথে উঠিল আবার তারা (নিরুদ্দেশের যাত্রী), এসো এসো এসো আমার কিশোর্যালোক (চিরন্তনী প্রিয়া), একটি শুধু বেদনামানিক (বেদনামানিক), আমি এমন হতে বিদায়, সেদিন মেঘ ছিলাতে (পাপড়ি খুলে), ওরে অভিমানিনী (অনাদৃতা), এই সাথে সুখে দুখের ভার (নীল পরী), ওগো এ কোন মেহেদীবধূ (মেহেদীবধূ), কোন সুদূরের চেনাবাঁশির ডাক শুনেছিস (পথহারা), আবার পিয়ালবনের পারেতে পিয়ার (অভিশাপ পিয়া), এই নীরব নিশীথ রাতে (বাদল নিশীথ) বন্ধু আমার থেকে থেকে (হৃদয় বন্ধু), কোন নবতীর মধুমাখা (মনস্বী), আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন (আপন-পিয়াসী), লক্ষ্মী তোমার ফেরার পথে আজকে অভিসার, তোমার পথে আজকে অভিসার (মুক্তিপাগল), আমার পথের ঝিল্লিরী মোর (বিদায়-গীতি), কিন্তু সেদিন বাতে বাতে (মনের মানুষ), আজ নবীন নয়ান মলিন কেন (বিদুরা পথিক প্রিয়া), তার ঠাঁই বাকিস নবীনতো আমি গো (আর কবি কাকলি), কেননি তুমি নিকুঞ্জে (পাপড়ি খোলা), এই আবেগ ফুলে মধুরাতিক ফেলে (মুক্তকেশ গান), এই নীল গগনের নয়ন পাতায় (অন্ধ স্বপন), নয়নভরা এই আমার খাতে (চিরচেনা), আমার কাজল মোদের (অভিযান), এই বাঁধা পাতে বাঁধা অশ্রুতো (আত্মস্মৃতি), এবার আমার জ্যোতির্লোকের বিভিন্ন প্রদীপ জ্বালো (ঊর্মিমালার গান) এগুলি গানের মধ্যে দুটিমাত্র সুর সংরক্ষিত হয়েছে; অন্যগুলি সব হারিয়ে গেছে। অথচ পরবর্তী কালের অজস্র প্রেমের গানের উৎসবেও তুলনায় নজরুলের এই পর্বের অনেকগুলো গানগুলি প্রায় প্রায় সবই কোনো সমকালীন ব্যক্তিগত স্মৃতির ধারা স্পষ্ট ছিল, তাঁর তরুণ মনের অনেক বঞ্চনার অভিজ্ঞতা আবেগ এগুলির সঙ্গে জড়িত ছিল। তাঁর জীবনীকারদের লেখা থেকে এগুলির কোন কিছু গানের রচনা পর্ব চিহ্নিতভাবে জানা গেছে, কিন্তু সুরগুলি বিস্মৃতির গ্রাসে চলে গিয়েছে। সবগুলিতেই কি নজরুল সুর যোজনা করেছিলেন? গানের শীর্ষে রাগ-তালের উল্লেখ সুর করেছিলেন বলেই বিশ্বাস করতে হয়। তবে এ কোন মেহেদীবধূ এবং কেমনো ধরণীর নবনবাথা গান দুটির উপর সেকালে সুরযোজনা করেছিলেন মঈনুল মোহিনী সেনগুপ্ত, সে দুটি গানের স্বরলিপিও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আজকে দেখি হিন্দোলের মধ্যমাগন বনে (কমল কাঁটা) এবং মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম (পাহাড়ি গান) এর দুটি অনন্য নিদর্শন প্রেমের গান নয়, নজরুলের স্বাভাবিক সমাজসচেতনতার প্রতিনিধি-স্থানীয়।

পুবের হাওয়া (১৩৩২ আশ্বিন), চক্রবাক (১৩৩৬ ভাদ্র), সন্ধ্যা (১৩৩৬ ভাদ্র) প্রলয় শিখা (১৩৩৭ শ্রাবণ) প্রভৃতি কাব্যোপন্যাসের কবিতার ক্ষেত্রে কিছু গানের হদিশ পাওয়া যায়। সেগুলি কবিতার সমকালীন রচনা হওয়া সম্ভব। বুলবুল (১৩৩৫ আশ্বিন) নজরুলের প্রথম গীতিসংকলন, চোখের চাতক (১৩৩৬ অগ্রহায়ণ) দ্বিতীয় গীতিসংকলন। নজরুলের গান ক্রমশই জনপ্রিয়তালাভ করছিল, রেকর্ডে তাদের পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলেছিল। কবিতার তুলিকাবিতে নজরুল তখন থেকে গীতের মতো শুধু গানই বুনে চলেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ একটি গীতিসংকলনের প্রয়োজনে নজরুল-গীতিকা প্রকাশিত হয় ১৩৩৭-এর ভাদ্রে, তখনো রবীন্দ্রনাথের গানের সংকলন গীতবিতান প্রকাশিত হয়নি। নজরুল-গীতিকায় গান ছিল মোট ১২৭টি, যার অধিকাংশ গান অর্থাৎ বেশ কিছু পূর্বের হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বুলবুল চোখের চাতক সদ্য প্রকাশিত চন্দ্রবিন্দু কাব্য (প্রথম হাসির গীতিসংকলনভুক্ত গান) থেকে সংগৃহীত। দেখা যাচ্ছে নজরুল-গীতিকাও হয়ে উঠল না পূর্ণাঙ্গ গানের সংকলন কারণ বুলবুল বা চন্দ্রবিন্দুতে বাদ গেল অনেক গানই। তারপর সুরসাকী (১৩৩৯ আষাঢ়) সংকলনের এল ৯৭টি গান, জুলফিকার (১৩৩৯ ভাদ্র) সংকলনে ২৪টি, বনগীতি (১৩৩৯ আশ্বিন) সংকলনে ৬৪টি, গুলবাগিচা (১৩৪০ আষাঢ়) সংকলনে ৮৭টি, গীতিশতদল (১৩৪১ বৈশাখ) ১০১টি, গানের মালা (১৩৪১ শ্রাবণ)-য় ৯০টি গান। একই সাথে বেরিয়েছে তাঁর গানের স্বরলিপিগ্রন্থ নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১), গীতিসংখ্যা ৩০টি, সুরমুকুর (১৯৩৪), ২৭টি। তবু

কই ?। এবং সংকলনের প্রয়াসে পরিচয় পত্র গেল, আজও নজরুলগীতি—সংখ্যাতত্ত্বে উদ্ধার তার পুরো খবর নেই। ১৯৭২-এ এদিক ঢাকা বেতারের পরবর্তীকালে প্রকাশিত গীতি সংকলন ও স্বরলিপি-গ্রন্থাদির প্রকাশ খণ্ডগত এ সংকলনের পরিকল্পনার পরিধি বড় হোল।

৪

রচনাপ্রাচুর্যে নজরুলের সাংগীতিক জীবনকে একাধিক পর্যায়ে বিভক্ত করার চেষ্টা কেউ কেউ করেছেন; তবে তার শিল্পপ্রবণতাগুলি পৃথক হয়ে যায়। কবি-নজরুলের অনুগামী—উদ্দীপন। তবে যে সময় থেকে তাঁর গান বিক্রয় সংস্থার উদ্বুদ্ধি পেল, সেতো যেন পরোক্ষ ট্রেডমার্ক, সেই সময় থেকে কবি এককাল সাংবাদিক নজরুল বিদ্রোহী নজরুল চলে গেলেন নিভৃত দেশান্তে। কবিতা ও গান নজরুলের প্রধান মাধ্যম এই দুটি ছিল পাশাপাশি, সমান জোরালো, পরস্পরিত, অসমান।

কবিতা তাঁর নজরুল মনমানসে প্রথম থেকেই গীতিকবি হয়ে উঠত। তাঁর প্রথম জীবনে লেখা অনেক কবিতা সুরারোপে না হলেও ছিল গানের মতো সুরঝংকৃত ও নিক্কণ-বাহুল্যে গীতিময়। অর্থাৎ গানের রূপগঠন অথবা প্রতি স্তবকের শেষে একটি নিয়ন্ত্রক ধ্বনিতার চয়নে। তাই কবিতাগুলি সেগুলি যেমন আবৃত্তিযোগ্য তেমনি সুরযোজনায়, ফলে গীতিরূপ পেতে অবস্থায় পড়েও সেগুলি নিজস্ব সুরবিহারী পথ হয়ে ওঠেনি। অগ্নিবীণা (১৩২৯ কার্তিক) প্রথম কবিতা
৪ গ্রামোফোন কবিতাকারে লিখিত ১০টাও বা পরে গানে রূপান্তরিত হয়েছিল তাতে নেই, তবে পরবর্তী যে-সুরে স্বরলিপি করা হয়েছে সেটি প্রণবের প্রথম সুর; অনেক পরে আবেশিত তৎকালীন প্রথম সুরটি হয়ে রেকর্ড হোল। বিষের বাঁশি (১৩৩১ শ্রাবণ) কাব্যের বহু কবি ছন্দ-নদী ছন্দ (আবাহ-নৃত্য) সঙ্গত কোনো শিল্পী রেকর্ড দেননি। অসুস্থ কবিতার আকারে এটি যেন দীর্ঘ, মেয়ো নারী চারক। পরে নজরুল বটি পৃথক ব্যবহার করেন। বিষের বাঁশি-র অধিকাংশ সুরারোপিত গানই কবিতারূপে বা সুরকবিতে। এগুলির আবৃত্তিরূপ ও গেয় রূপে কতটা প্রভেদ কবি স্বয়ং লক্ষ করেছেন, এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহল—নিবৃত্তির কোনো উপায় নেই।

৫ তবে গজল গানের আঙ্গিক প্রায় প্রথম থেকেই সুনির্দেশিত আছে গজল গান সুর আবির্ভাব আবৃত্তিযোগ্য কবিতা হিসেবে কম বলা হিসেবেই জনপ্রিয়তা পায়। যখন থেকে নজরুলের গানের উৎস খুঁজে যায়, এরা গজল গানের সাথে মিলিয়ে মনোহরক সুরের শিল্পরূপের তাঁর আন্তর্জাতিক উৎসার ও সুষ্টিশীল মানস উদঘাটিত হয়ে থাকে। যদিও প্রথম প্রকাশনায় প্রথম দিকের গজল গানগুলি, বিশেষত সেগুলোই প্রচলিত গীতিরূপে আবৃত্তিযোগ্য কবিতার বর্গ থেকে বিযুক্ত হয়নি। তার আন্তর্জাতিক সময় থেকে নজরুল যেন তাঁর গানের পরিণামধারাটি পেয়ে গেছিলেন। তার স্পর্শ তলে ধূলিধূসর সোনামুখী হয়ে উঠেছিল। অচিরেই রেকর্ড লোকের হাতে প্রসারিত হল, নজরুল বিকিয়ে গেলেন গ্রামোফোন কোম্পানির কাছে। সওদাগরপুত্র কিনে নিল আনন্দরূপে। তখন থেকেই নজরুলের শিল্প হয়ে উঠতে থাকল পণ্য, শিল্পিত হয়ে উঠতে থাকল সম্পত্তি, প্রতিভার প্রতিটি নিঃস্বিতি হয়ে গেল উৎপাদনের অংশীভূত সেরা।

এখনই ১৯২৮-২৯ সালের উল্লেখের কথা। দেশ তখন অনুগামী সঙ্গে অল্প আগেবলে উঠেছে সাধকদের জগত জৌলুস উঠেছিল। বাইরে কবিগণ ভারতের হৃদিত্ব সাহিত্যের স্রোত পেরিয়ে রাজনৈতিক মুক্ত আন্দুল তোলাতে এসেছিল। সমাজ যুব ছাত্রদিগকের বলরামিতে বাড়ে বাড়ে মিলিয়ে উঠেছিল। বিশ্বময় অর্থনৈতিক সংকটের নিদারুণ কাঙাল মহলা ও দেশ থেকে এ-দেশ অর্জিত হয়েছিল। একদিন পর এরো বাড়তে, শোষণ বাজারে জাঁক, বিলাস আনাচার, প্রাপ্তি অর্থনীতির চরম দুরবস্থা তখন। একদিকে সমাজের সেতুর মতো নবীন সাজের নিপুণ জীবনধারা গঠিত চরিত্র পাশে পরিবর্তিতরূপ নজরুলের দুয়ার খুলি, অন্তরূপ অনুগামী পুরাতন বাংলার জনমনে বাড়তের পক্ষ। সাহেব বড়বাবু মাজার বই সেলাই চরণের বরজোড়া পৌষসেমী, বিরহ-হরণ-মিলনের আয়োজনে গভীরতর প্রাচুর্য বিলাস। একটি ক্ষুদ্র রবীন্দ্রনাথের বিন্দু বই থেকেও বেরিয়ে এসেছিল সার্বভৌমতে শুদ্ধ হয়ে যেখানেও এ মনো উৎসব-প্রার্থনা। আর নজরুল তখন গ্রামোফোন কোম্পানির কর্মচারী হয়ে রাজের কাজ বাড়ে পড়েছে। বাটা মিয়ে আধুনিকতার প্রতিভাবানের কাজে অবশ্যই, কারণ তাদের তাই দিয়ে চটকদার মনোহর সুর। সেই নজরুল। তিনি এই সেদিন বাঙালী সৌখিন ও অসহায় বিনিময়ের মধ্যে সংখ্যা করতে গিয়ে, পরিণ রাজনেতাদের হাতে কলম ধরে পেশির নিয়ে লিখেছিলেন 'আমার এই সৌখিনপটি থেকে যেন তার যে সোনাটি।' কিন্তু এখন তাঁর বড়ো-কামনা সব ছেড়ে যাচ্ছে' বলা। তবে পাইরের আশা ভুলতে দেখা না। শুধু পুরাণের ছবিতে (১৯৩০ সে) বিদ্রোহী-বিপ্লবী কবি এখন উৎসাহ হয়ে জোয়ারের মতো মুঠো প্রাণ খুলেছেন, তরুণদের কোথা ছেড়ে যাবেন, বাজারের দুয়ার-খোলার গলাতে সাঁ'দি দিয়ে বসেছেন। কথায় মুখ পাখর নিয়ে বন্ধ করে তার পাশে টিকিওয়ালা বসানো হয়েছে। এখন তাঁর ঝাঁটি টিপকেই জল মাথে বেরিয়ে আসবে।

১৯১৯ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত নজরুলের সাংগীতিক জীবন সম্পূর্ণ হয় তথা পাওয়া গেছে, কোনো প্রামাণিক নজরুল-জীবনীতে এখনো সেগুলি একত্রে সংকলিত ও স্বীকৃত করা হয়ে ওঠেনি। এই বিষয়ে অবহিত পরিশ্রমী ইতিহাসকার-সমালোচক বাংলাদেশের রফিকুল ইসলামের ঐকান্তিক গবেষণা ও নিবিড় অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ রেখেও একথা বলা যায়। ইতিমধ্যেই ১৯১৯ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত গীতিকার নজরুল বিষয়ে তথ্য দুর্লভ ও অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। এই সময়কালের রচিত গানের বাণী ও উপলক্ষ উদ্ধার করা গেলেও সুর সংরক্ষণের চেষ্টা হয়নি। পরবর্তীকালে নজরুলের স্নেহের শিষ্য সংগ্রহীরা ইত্যাদি কতিপয় গায়কের আদেশেই নজরুলসংগীতের অতি সেবায়ন। কেউ কেউ নজরুলগীতির পুঁথি ঘাঁটিয়ে নিজেদের বানানো পদ্ধতি প্রবর্তিত করেছেন। তাঁরা এই সুর-উদ্ধার ও সংরক্ষণের বিষয়ে কোথায় হাত সবাই উপেক্ষা করেছেন। কারণ তাঁরা কেউ ইতিহাসের পরিকল্পনাতি করতে আসেননি, আলাদাভাবে গড় না পেলে কোনো কিছুকেই গ্রহণ করেননি। কেউ কেউ দাবি করেছেন, নজরুলের সম্মতি পেয়ে তাঁরা তাঁদের অভিপ্রেত 'আর্মী'-এর প্রণীত সুরের আঙ্গিকে অবলম্বনে সুর রচনা করেছেন। আজ তো দেখা যাচ্ছে, সুরের কাঠামো অবলম্বন করা সুর থাক, কেউ কেউ নজরুলের দেওয়া সুর

আসরেই চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে, বহিরে কথার পরে নিজেদের মোল সুরেও তারা গাইতে দিতেন। তার কারণেই গোঁড়া নজরুলের নিজস্ব সুর অবলম্বন হয়ে গেছে তাঁর পরিবেশন মধ্যে এমন অনেক গানেরই চেহারা দিয়ে যে সব রকম তাতে নতুন সুর বসিয়েছেন। যেমন ১৯৫০ সালে কাজিলাতিনের পর থেকেই সাধারণ হয়েছে এখন ১৯৪৮-৪৯ সালে রাগপ্রধানের গানের বাজার তখন ছিল এবং রেকর্ড কোম্পানি নজরুলের সেই জাতীয় গানে নজরুল-দিয়া নতুন রাগিণীতে নিয়ে সুর বসিয়ে বিভিন্ন শিল্পীকে দিয়েছেন। কিন্তু তার বাইরে অন্য গান, সুরের পরবর্তীকালে রেকর্ড হয়েছে, না আর্কাইভ—তাছাড়া তাঁর সমস্ত সুরকারদের। ইদানীং চেষ্টা করলে অনেক গানের নজরুলকৃত সুর উদ্ধার করা গেছে। প্রতিভা যেমন তাঁর স্বতিচারণের বর্ণনায়, একদা এসে তিনি যখন নজরুলগীতির রেকর্ড করতে, সেখানে নজরুলগীতি পরিবেশন করেন। তখন নিজস্ব সুরের বাড় পরিবর্তন হয়ে গেছেন। সুতরাং তাঁরাই জানেন যেমন তখন নজরুলের যাবতীয় গান রেকর্ডের জন্যে প্রচারের অধিক বস্তুত তার নিজেদেরা গাইবার অধিকারে। তিনি এমন পরিচয় করেছিলেন, যেমন তখন নজরুলের পূর্বতনীর সব গানই তাঁর কণ্ঠে; কিন্তু তাহলে তিনি নজরুলের রেকর্ডে তুলনায় গানটি একেবারে অন্য রূপে বিশেষজ্ঞেরা সহায়ে স্বরলিপি করিয়ে রাখতেন না। তাতেও তিনি তাঁদের জানেন এবং স্বতিচারণের বাইরে জানাতে চান না। তবে তিনি যদি নজরুলের কাছে শেখা প্রথম দিনের যাবতীয় গানের ভাণ্ডারী হওয়ার অধিকার চান, তেমন কারণেই না স্বরলিপিতে মর্যাদা করে নজরুল—স্মৃতি রক্ষায় তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন না।

এসব কারণেই প্রবীণ নজরুল-গীতির শিল্পীদের স্মৃতিচারণের সহায়ে একালের শ্রোতাদের সম্পদ জানতেই পারে।

১৯২৪-২৬ দ্বিতীয় পর্ব থেকে নজরুলগীতির আবির্ভাবের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, তখনও তিনি সৃষ্টির প্রেরণায় বা শক্তি প্রেরণায় সৃষ্টি, কিছুটা স্বদেশ প্রেরণায়, ব্যাপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রেরণায় সৃষ্টি বা প্রেম থেকে, প্রকৃতি থেকে, কোনো অধিরোহণী বিরহ থেকে। ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত সময়ে রচিত গানে এই ব্যক্তির প্রেরণার সংখ্যা বেশি করে এসেছে, গান রচনা নিয়েও নিজস্ব ভাব পেয়ে শুরু হয়েছে। পরবর্তীকালে নজরুলগীতি বা নজরুলসংগীত নামে যা স্বতন্ত্র একটি শৈলীশিল্পের মহিমা অর্জন করবে, এখন থেকে তাই হতে শুরু হয়েছে। নানা শিল্পীর কণ্ঠের গানে অনুরাগী পরিবেশিত হয়েছে তাঁর সুরের গানের, অথচ অবশ্যই গানের সেই বিস্তার সূচনা হয়নি, অবশ্যই বিস্তার হয়নি, রাজিমের অদ্ভুত উৎপাদনের চৌহদ্দি করেনি। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০-৪১ পর্যন্ত শেষ অধ্যায়ে সুরের পর কলকাতার অবনতির শাখা থেকে ছিড়ে নিয়ে গেছে তখন কবিতাটি, তবু সুর পাখার বিস্তারে হরণ হয়নি। অথচ সেখানে এই কটি বছরে নজরুলের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যেতে এসেছে কেবলই ক্ষতি, সন্তান বিয়োগের বেদনায়, প্রাপ্তি ও আয়ে পথ পড়ে গেছেন পত্নীর অসুখের তবু কখনো থেমেছেন, সবার গুণীজন সুরের চেতনায় তাঁর সাংস্কৃতিকভাবে মর্যাদায় উদ্বেগ পায়নি। কোনো, বিস্তৃত, গুণী ও শেষাংশের কেউ কখনো বেদনাবিদ্ধ সম্পর্কে থেমেছেন তিনি, বিরহের কষ্ট বর্ষণের বাইরে তাকে প্রকাশ করেননি। আকাশে বাড়িয়ে দিয়েছেন তবে অবিরাম স্তবক গানের মালা, অবিশ্রান্তায় কথা লেখেন বলে। এ শুধু নজরুলের পক্ষেই সম্ভব ছিল সেদিন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তাঁর গানে এই বিষয়ে বারবার ঐতিহাসিক কোনো নজির নাম পাননি। সেগুলি কি শুধু বিস্ময়ের অবকাশ সম্ভাবনা পাব?

কিন্তু তবু নজরুল তো কৃতজ্ঞ শিল্পীদের অতিরিক্ত প্রেমকাতরতায় বিশেষ না। তাই স্মৃতির কোনোদিন জানেন ঘরের শিল্পীর মধ্যে কিছু বিসর্জন প্রতিকারে হয়ে উঠেছিল। শিল্পকে সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণতা দিতে যেতে যে পুনর্মিলন মনোযোগ, যে একাগ্র একপ্রকার শক্তির, তা তাঁর ছিল বটে তাই কবিতার শুধু কথা দিয়ে যেতে দিয়েছেন, সুরের সকল যে যথাযথ গান পাননি।

কখনো সুরের আবরণটুকু দিয়ে যেতে দিয়েছেন স্বরলিপি পাননি, যেটি নজরুলের সব গীতি অভ্যন্তরে যাবে উপর বা প্রতিষ্ঠিত পূরণ পারেননি। তাই বোধহয় আজ নজরুলগীতির সমাপ্তে একটি অন্যান্যরূপ বিশৃঙ্খলা, যেটা নজরুলের শিল্পী প্রতিষ্ঠানিক, তার বাজারি নাম শিল্পীর স্বাধীনতা। রবীন্দ্রনাথের গানের সব সব শিল্পী যেন 'শিল্পী'-ই নন, তারা যেন স্বাধীনতাহীনতা প্রতীকদের, পরাধীন, সবচেয়ে সবচেয়ে আত্মীয় সবাই। আর নজরুলগীতির শিল্পীরা কী অসীম স্বাধীনতা ভোগ করেন, কী অনাবশ্যক উঁচুতে স্বাধীনতা। কী বিপুল উঁচুতে মুক্তির উল্লাস: তাঁরা নজরুলের যে-কোনো গান যেই উচ্চ স্বাধীনতার উল্লাসে গাইতে পারেন। রাগবিস্তার করতে পারেন, তোলাতে পারেন, বিস্তারের সুরকেও সুরভেদে পারেন, কারণ অসীম শিল্পীর স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। এদের অভাব নেই কোনো স্বরলিপির বাধাবন্ধ, শিক্ষকের উৎপাদনা, পূর্বতন শিল্পীর নির্ধারিত আদর্শ, সুরবিস্তারের জন্য নিষেধনা। নজরুলের অসম্পূর্ণ একটি নজরুলচর্চাই রাখতে সবাই রাজা।

প্রকারের সংগীত বিশেষে তাই নজরুলগীতির অন্যান্যতম সুরকার নজরুলকেই থেকেন। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

বিপুল তরঙ্গ রে
সব গান উচ্ছ্বসিয়া যখন নাচি অতীত অনাগত
আলোকে উজ্জ্বল জীবন চঞ্চল একী আনন্দ তরঙ্গ॥

এই বিপুল তরঙ্গের নাম যদি হয় রবীন্দ্রসংগীত, তবে তার উৎসমুখ সন্ধান করলে কেউ কি বলবেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অথবা বিষ্ণু চক্রবর্তীর নাম? অথচ নজরুলের বিস্ময়কর সংগীত প্রতিভার উৎসসন্ধানে অপ্রত্যাশিত দু-একজন নজরুল-বিশেষজ্ঞ পরীর প্রভাবের সঙ্গে উল্লেখ করেন গ্রামোফোন কোম্পানির একদা কোনোকুল সুরকার জমিরুদ্দীন খান, মঞ্জু সাহেব, নবির খান, কানন দত্ত, আফতাবুদ্দীন গোস্বামী, মস্তান গামা, কমিরা কাশ খাঁ, ওস্তাদ দিলরুবা খাঁ প্রভৃতি নাম। যেন নজরুলের বিস্ময়কর সাংগীতিক প্রতিভার কথা নিহিত আছে এদের সাহচর্যে কতার মধ্যে। কেউই অস্বীকার করেন না যে, এদের সংগীতসম্ভার থেকে নজরুল অনেক উপাদান সংগ্রহ করে নিজের গানকে সাজিয়েছেন। তাছাড়াও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের আকর্ষণী রাগ, ঠুমরি, খেয়াল, টপ্পা-ঠুংরি, টপখেয়াল, দাদরা-কাজরি-কাওয়ালি-গজলের মধ্যে কিছু দেশী আঞ্চলিক সুর, ভজন-কীর্তন, বাংলা লোকগীতির ঐশ্বর্য, ভাটিয়ালি সুর, বাউল ভাটিয়ালি—সুদিন, যেখানে যা কিছু

চিহ্নিত করে দিয়েছেন, সব মিলিয়ে নজরুল তাঁর নিজস্ব সংগীতরচনার রাগগুলিকে সহজ সরল করে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া যখন অনুপম, তখন কোনো বাণী পূর্ণ করার জন্য এছাড়া তাঁর কোনো উপায় ছিল না। তাই এই অপারেশন প্রক্রিয়ায় আত্মিক ভাবরসের এসে মিশেছিল। নজরুল শোনা শরতের পৃথ্বীসংগীতের গজল শুনে বাড়িতে ফিরে তাকে তেমন গজলভঙ্গির রাগিণী, আরবী বা ইজিপশিয়ান গানের রেকর্ড সংগ্রহ করে সেই সুরে নতুন গান লেখা, শরতের শিষ্যদের কণ্ঠ থেকে সরাসরি সুর নিয়ে তার স্বরলিপিতে গান রচনা—এসব বৃত্তান্ত নতুন নয়, সংগীতবিদদের কোনো লেখকেরা অপরিচিত নয়, যা জানিয়ে গেছেন। নজরুল কী ভাবে নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন, সুর প্রবর্তন করেছেন, নতুন রাগের নামকরণ করেছেন, উচ্চাঙ্গ সংগীত মিলিয়ে নজরুলগীতি রচনা করেছেন—এই জাতীয় বিবরণ নজরুল-সংগীত বিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থ পড়েছেন বহু মনীষার মতামত পাই যদি আমরা। অতঃকিম? অবশ্যই এই জাতীয় গুণে নজরুল ভারতীয় সংগীতের একজন শ্রেষ্ঠ কম্পোজার, সংগীতশাস্ত্রে তাঁর শক্তি ও দক্ষতা অতি বিস্ময়কর। কিন্তু তাই বলে কি কবি নজরুল থেকে গানের নজরুলকে বিচ্ছিন্ন করে নজরুলকে আমরা সংগীত-বিশেষ আলোচনার সেতুবন্ধ বানাবো? নাকি আমরা বলব, সংগীতে নজরুল প্রতিভা তাঁর কবিপ্রতিভার পরিপূরক, প্রতিস্পর্ধী নয়। নজরুলগীতি মানেই সর্বদাই আদিমতম নয় যে তার প্রতিনিধি স্বীয় শিল্পীর কালিদাসের পরাকাষ্ঠা উঠবে।

নজরুলগীতির অনুশীলনকারী প্রত্যেক শিল্পীকেই জানতে হবে, কোনটির সুর বড়ো নজরুল প্রদত্ত এবং কোনটির সুর নজরুলের নয়। যদি না হয়, তবে কাচ।

নজরুলের গানকে অ-নজরুলগীতি থেকে উদ্ধার করতেই হবে। কিন্তু ততধারে দুরূহতর প্রশ্ন, নজরুল-কর্তৃক সুর প্রদানের ও শাস্ত্রিকতা প্রাপ্ত প্রশ্ন, নজরুলগীতিকে যত চর্চাপ্রার্থী করুন, নজরুলের বাণী ও নজরুলের নিজের দেওয়া সুরই একমাত্র বিশুদ্ধ নজরুলগীতি—এই শুদ্ধতার আদর্শে শেষ পর্যন্ত এসে থাকতে হবে। নতুবা শতাব্দীর নজরুল-চর্চা অসমাপ্ত কোড়া গণ্য হয়ে যাবে।

৪

তাই দুঃখজনকভাবে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নজরুলগীতির অবহেলার পরিচয় দিতে গিয়ে কেউ কেউ নজরুলকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করতে পারেননি। অথচ নজরুল গীতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে নতুন প্রজন্মের কাছে সেই পুরোনো ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসগুলোই প্রতি বদলাতে পারে আরো। প্রথমেই আমাদের কাছে উল্লেখ করতে হয় নজরুলের গানের সংখ্যা তিন হাজারের বেশি কিংবা তারো বেশি। এবং পৃথিবীর কোনো কবিরা আজ পর্যন্ত এত গান লিখতে পারেননি। কিন্তু সন্ধান করলে দেখা যাবে, একালে কোনো জনপ্রিয় গীতিকারের উৎপাদন-মাত্রা এর চেয়েও বেশি গান বেরিয়েছে, হয়তো সেই গুণে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের একটি পুরস্কার তারই জন্য অপেক্ষা রয়। শুধু সংগীতের পরিমাণিক গৌরবের দাও হতে পারে, যদি গুণগত মানে উৎকর্ষের বিচারে অসম্ভব নয়। নজরুলের নামে যত লিখিত গান পাওয়া গেছে ও যাবে, তার অর্ধেক বাদ দিলেও নজরুল নজরুলই থাকবেন।

নজরুলের গানের বিষয়বিন্যাসেও বিশেষজ্ঞদের বিশেষ গোলযোগ। নজরুলগীতিকা প্রকাশকালে (১৩৫৭) রবীন্দ্রনাথের গানের গীতবিতান (১৩৫৪) নির্দেশিত 'ভাবের অনুষঙ্গ' রক্ষা করে গীত বিন্যাসের রীতি নজরুলের সামনে ছিল না। তাছাড়া নজরুলের জীবদ্দশায় তাঁর গীতিসংকলন, সুনির্বাচন ও সম্পাদনা-বিন্যাসের পক্ষে কখনই অনুকূল ছিল না। একালে নজরুলগীতি আলোচনার কারো বর্গ করণে তাবৎ এলো মেলো চিন্তা ও অপরিণত রয়ে গেছে। এখনো এদেশে নজরুলগীতির সমগ্র সংকলন প্রকাশিত হয়নি; তার উপর অবৈজ্ঞানিকভাবে সাজানো অসম্পূর্ণ সংকলনেও সন্ধানী মন বিভ্রান্ত হয়। ব্রতী-প্রকাশিত অখণ্ড নজরুলগীতির 'অখণ্ড' একটি প্রতারক শব্দ। কারণ অসংখ্য গানই এতে নেই। তবুপরি এর সম্পাদক গানগুলির শ্রেণী বিভাগ করেছিলেন কাব্যগীত, রাগপ্রধান, ইসলামি, ভক্তিগীতি, গজল, লোকগীতি, দেশাত্মবোধক, হাসির গান, হিন্দী গীতি ইত্যাদি ভাগে। ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে: "কাব্যগীতির মধ্যে কবির সমগ্র প্রেম ও প্রকৃতির বিষয়ক সংগীতগুলি স্থান পেয়েছে।" কাব্যগীতির এ হেন অর্থ ব্যাখ্যায় ইতিমধ্যে কৌতুকবোধ হয়। একথাও লেখা হয়েছে, "কোন কিছু সংখ্যক গান প্রেম ও প্রকৃতির আধারে গড়ে উঠলেও তাদের অন্তরাত্মায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে বিশেষ বিশেষ রাগ, রাগনির্ভর গানগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রাগ প্রধানে।" অথচ রাগপ্রধান-এর অন্তর্গত সংকলিত ৫৬টি গানের মধ্যে কৃত্রিমতাহীন কোনো অংশের মধ্যে রাগই নেই। অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী, অঞ্জলি লহ মোর সংগীতে, আজি শবনমের, কাজরি গাহিয়া এসো গোপবালিকা, উচাটন নিশিরাতে আজি কোয়েলিয়াকি বাড়ে, নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায়, শাওনী

[illegible] কাব্যগীতি নয়, তার [illegible] বোঝা যায় না। [illegible] এই [illegible] ১১২টি গান, [illegible] ১২০টি [illegible] চেনা-না-চেনা [illegible] আছে। ভক্তিগীতি ও ইসলামী দুটি [illegible] নিঃসন্দেহ [illegible] ইসলামী গানের [illegible] সেখানেই [illegible] কিন্তু উচ্চ সুরের [illegible] এই [illegible] এই বিভাজনের [illegible] সম্পর্কে সম্পাদক [illegible] উদাসীন ছিলেন না [illegible] তাই [illegible] করেছেন, "বিভাগগুলি যে সব সময় নির্ভুল হয়েছে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কারণ [illegible] মধ্যে কিছু গজল, কিছু পল্লীগীতি এবং অন্য বিভাগের মধ্যে কিছু গান অনুপ্রবেশ করেছে। [illegible] ভক্তিগীতি, গজলে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে দু-একটি অন্য শ্রেণীর গান। আগামী সংস্করণে এই ভুলত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করব।"

১৩৮৭ বঙ্গাব্দের [illegible] পরেও সে ত্রুটির সংশোধন হয়নি। [illegible] উপরে [illegible] নির্দিষ্ট কাব্যগীতি কেন [illegible] শ্রেণী, তা বোঝা [illegible] না। নজরুলের সব গানই তো কাব্যগীতি, গজল বা ইসলামি গান আধুনিক হিসেবে সব কাব্যগীতিরূপে গণ্য। [illegible] গজল, পল্লীগীতি বা লোকগীতি [illegible] সুতরাং, [illegible] নির্দেশিত, বিষয়গত নয়। অন্যদিকে দেশাত্মবোধক, হাসির গান, [illegible] ইসলামী গানগুলি বিষয় [illegible]। সুতরাং এই প্রকার [illegible] বিভাজনগুলিকে [illegible] করে। [illegible] বাংলাদেশের [illegible] সংগীত-সমালোচক [illegible] কাজী নজরুল ইসলামের গান' গ্রন্থে নজরুলগীতির বিভাজন-নির্দেশিকা [illegible] দেশাত্মবোধক, গজল, [illegible], ভক্তিগীতি, [illegible] গান, [illegible] গান এই শ্রেণীগুলির [illegible]—[illegible] বিষয় ও রীতি-বিভাজন'।

বিষয়ভিত্তিক নির্দিষ্ট নজরুলগীতিকে [illegible] সঠিক [illegible] [illegible] করা [illegible] দুরূহ, কারণ [illegible] স্বদেশী [illegible]। [illegible] ভক্তিগীতি, [illegible] সংগীত, [illegible], [illegible] সংগীত ও বিবিধ—এই জাতীয় কিছু [illegible] ইসলামী গান। [illegible] হিন্দু [illegible] [illegible]

[illegible] নজরুলগীতির প্রতি সুবিবেচনা করা হয়। [illegible] তাঁর [illegible] [illegible]

বিষয়ের [illegible] নজরুলের গানের কিছু [illegible] [illegible] নজরুল [illegible] [illegible] শিল্পী নজরুলের [illegible] [illegible]

নজরুলের সময় [illegible] নজরুলগীতি [illegible] [illegible]

৬

[illegible] নজরুলের [illegible] ইসলামী [illegible] নজরুল [illegible] ইসলামী গানে ইসলামি [illegible]

[illegible] নেই, কারণ সেই পুরাণের কীর্তনই তো গানের [illegible]। [illegible] সংগীত কীর্তনে বা অন্যান্য [illegible] রূপপূর্ণ গানের [illegible] [illegible] আঙ্গিক কারণে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কিছু [illegible] নজরুল দুই বিশেষ দিকে একজাতীয় বিশিষ্টতা [illegible] পেয়েছিলেন। যেমন, এ রকম গানের পরিবেশ দুটি এল গানে— ইসলামিয়েত [illegible] [illegible] রাধাকে [illegible] বিরহ [illegible]। [illegible] যে এখানে [illegible] যেন [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] বাঁশি [illegible]
[illegible] বাঁশি [illegible]।
[illegible]
[illegible] সেই [illegible] সেই [illegible]।
এ [illegible] [illegible]।
[illegible] সেই [illegible]
[illegible]
[illegible]।।

[illegible] তো [illegible] বুলবুলি [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] বুক [illegible]
[illegible]
[illegible] বুক [illegible]
[illegible] করেছে [illegible]
সেই [illegible]
[illegible]
কি [illegible]
[illegible] কেন [illegible]
[illegible]
দীপ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] এ বুক [illegible]।

[illegible] একটি বিশেষত্ব আছে নজরুলের গানে। [illegible] থেকে [illegible] বা [illegible] [illegible] করা হয়েছে। একটি একটি [illegible] উদাহরণ—

[illegible] তুই [illegible]
[illegible] সোনার [illegible]।।
[illegible]
[illegible]
[illegible] সোনার [illegible]।।

[illegible] যে তুই [illegible] যে [illegible]
[illegible] না [illegible] এ কোন [illegible]।
[illegible]।।

[illegible] কি বা [illegible] চাঁদের [illegible]
[illegible] যে [illegible]
দুই [illegible] মা [illegible]।।

[illegible] একটি গানে [illegible] [illegible] হয়েছে—

[illegible]
[illegible]
কি [illegible]
[illegible]
[illegible] না [illegible]।।
[illegible]
[illegible]
[illegible]।।

যে [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible]। যেমন—

[illegible] কলি [illegible] কলি [illegible] কলি
[illegible] যেন [illegible]
এসেছিল [illegible]
[illegible]।
[illegible]
এসেছিল কোন [illegible]
[illegible] দীপ [illegible]
[illegible]।

[illegible]
[illegible]।

[illegible] [illegible]। কিন্তু এই [illegible]। আরও একটি উদাহরণ—

[illegible]
কিছু [illegible] এসে [illegible] [illegible]।
[illegible] লাল গোলাপ [illegible]
[illegible]
এসেছিল তুমি [illegible]
[illegible]।
[illegible] সে যে [illegible]
[illegible]।
যে [illegible]
[illegible]
[illegible]
তব সেই [illegible] সে যে [illegible]।।

[illegible] পুরাণের [illegible] নজরুল [illegible] এমন [illegible] থেকে দু-একটি [illegible] করা যেতে পারে। যেমন,

তিমিরে যে আমি যে তোমারই চির-মায়াবিকা
হৃদ নয় মোরে প্রেমঘুমাবে ফিরি শুকতারিকা।
মন নয়ন তুমি তব মেঘেতে
দূরে ঝিমিঝিমি আবছা প্রদীপ হয়ে
এসে জ্বলব রাত ইন্দ্রধনু মোর গগনে মালিকা
মোর নাচে নাচ তব চরণে কর অবলম্বিকা
জনমে জনমে হবো শুধু তুমি আমি চির পথিকা।
শুধু নাহ তুমি নাথ মনে মনে
আমি কখনো হয়েছি পোশাকে
এসো আর প্রাণ হয় তোমারই কারণে হব শাস্ত্রসাধিকা।।

অতুলপ্রসাদ সেনের ঠুংরীরূপ আবহাওয়া করে অতুলের প্রিয় মনোরমাকে অনুভূতি মহার্ঘীয় আবেদিত বৈষ্ণবকবির বিশিষ্টতার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেন তিনি। আবার রবীন্দ্র প্রভাবও তার গানে দুঃখ হয়েছে, যেমন এই গানটি—

বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ
এক জনমের নয়
এই বেদনার পার হয় এ বিরহ
কী যেন অজানা ভয়।
বারে বারে মোরা কত যে ভুবনে আসি
খেলিয়া গিয়েছে দুইজনে ভালোবাসি
পরিয়া নতুন মিলনের সেই মালা
আবার বুঝি সে রহিল না হায়
অভিসার নিশীথের
শুধু তোমার লাগি দুটিয়ে কেঁদে ডাকি
ফিরে আর পাবনারে।
মেঘের আঁচল লুটি তুমি যাও
পারাবার যেথা পারাবার কাছে যাও
বঁধু আমি কোন দূরে তুমি দীপ সম্ভার
মনের অপার অকূল বয়।।

৭

নজরুল 'একটি ফুলে এর জল নাড়ে না ধরে।' নজরুলগীতি সম্পর্কে যেন নতুন করে প্রয়োগ করতে ইচ্ছা হয়। তবে তাঁর স্বাভাবিক নিষ্ঠা, রাগ-উচ্চার, গানের সনিষ্ঠ রাগনাম-উৎকীর্ণ করা, অসংখ্য নতুন বিশিষ্ট রাগনামের রচনা করা—এইগুলি নিয়ে ভবিষ্যতে সংগীত বিশেষজ্ঞরা বহুই উদ্বুদ্ধ হবেন, এগুলি বাংলা তথা সংগীতের ইতিহাসে নজরুলের কৃতিত্বের শেষ অধ্যায় নয়, হয়তো বা প্রাথমিক অধ্যায় মাত্র। গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডভুক্ত সংগীত-পরিচালক ওস্তাদ জমিরউদ্দিনের কাছে নজরুল সংগীতানুশীলনের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিভার অনুরাগী ছিলেন। সেই জমিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত শোকসভায় নজরুল নিজেই এমনই বলেছিলেন—

"জমিরউদ্দিন খাঁ ছিলেন আমার গানের শিক্ষক। তিনি ঠুংরি-গায়ক। ওস্তাদ জমিরউদ্দিন গানের পর তাঁর মতো ঠুংরি গাইতে আর কেউ ছিলেন না। এমন মোর নাই-ই। ঢং যেমন বিশেষ সকল দশক সব সুরেই তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডে তিনি হাজার হাজার সুর রেখে গিয়েছেন। যে কোনো সুর তিনি adopt করতে পারতেন। কত নতুনতর সুর তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তিনি জানতেন যে কোথা থেকে কী সুর তা নেওয়া থাকবে জানতে পারেননি।..."

ওস্তাদ জমিরউদ্দিন সম্পর্কে নজরুলের এই উক্তি বাংলার গ্রামোফোনের উক্তি নজরুলের নিজের সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে আমরা কি জমিরউদ্দিন ও নজরুল দুই প্রতিভাকে এক সঙ্গে মিলিয়ে দেখব? সংগীতজ্ঞরা নজরুলকে ওস্তাদ নজরুল বলিয়ে জমিরউদ্দিন খাঁ সাহেবের পাশে বসালে কি নজরুলের প্রতি প্রতিভার উপযুক্ত মূল্যায়ন হবে।

নজরুলগীতির অন্তর্নিহিত যে সব সাংগীতিক বিশেষত্ব, সাংগীতিকমার্গীয় অনুশীলন ও অধ্যয়ন তাঁর প্রতিভাভুক্ত। কিন্তু কাব্যগীতির যে ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্ত অতুলপ্রসাদের দান, সেখানে নজরুলের বহুর শিল্পগানের দিকে আসরগুলি তাঁর কবিত্বের মহিমময়। সেখানে কিন্তু শিল্পী চণ্ডীদাস রামপ্রসাদ নিধুবাবুর গানে একালের নজরুল কি অপূর্ব সাধনায় তাঁদের ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেছেন, তার উদাহরণ দিতে গেলে অনেকবার দ্বিজকবিদের গানগুলো নজরুল বা রামপ্রসাদ-কে ভুলেন না। ইসলামি গানের অভিনবত্ব, গজলের লোকায়ত প্রেমতত্ত্ব, ঔপনিবেশিকতার অভিশাপের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার অগ্নিগর্ভ বাণী—এসব কি কম গোস্বামী কাব্যের বহু অভিব্যক্তির নিত্য-সত্তার সঙ্গে? রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে তাঁর বসন্ত উৎসর্গ করেছিলেন। সেই নজরুলকে তিনি তাঁর কাব্য ও সংগীতের আসরে সাদরে বাংলা আরবী ফারসী শব্দের বিপুল আবহ উজাড় করে গানের বাণী প্রয়োগে নবাবিষ্কার ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। সে আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্ত অতুলপ্রসাদের গানেও অগোচর ছিল।

নজরুলের গান রবীন্দ্রনাথের গানের মতো মহাকবির অন্তরলোকের ভাব-ঐশ্বর্যে মহিত নয়, নজরুল সেই পথিক হয়েছেন। তাঁর গানের আবেদন অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ, সহজাত, সবল, সোজাসুজি। এই শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষকেই তা স্পর্শিত করে স্পর্শ করে প্রবিষ্ট করে। তা অভিজাত আত্মমগ্ন-সাপেক্ষ নয়। তাই প্রেমের সহজিয়া আবেদনে, লৌকিক প্রণয়-প্রকাশের উদ্দাম আবেগে, ঐতিহ্য লোককলার সংযোগে তাঁর সকল জাতীয় গান একদা লোকজীবনকে উদ্বেল করেছিল, যখন আপামর উপলব্ধি বা রবীন্দ্রসংগীতের আবেদন সীমাবদ্ধ ছিল অপেক্ষাকৃত বিদগ্ধ শ্রোতৃ-মহলে। নজরুলের ভক্তি-প্রকাশের লৌকিকতা ভক্তিকে বিপুল মনকে যে পথ করে এসেছে, তাতে কোনো আন্তরিকতার অভাব নেই। তাঁর স্বদেশপ্রেমের গানে স্বদেশের সৌন্দর্য ও মহিমা নিয়ে গর্বিত হওয়ার চেয়ে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ও ঘৃণার তপ্ত প্রতিফলন ঘটিয়ে, তার সৌন্দর্যেই সেগুলি জনপ্রীতি পেয়েছে। তাঁর প্রকৃতি-পর্যায় অন্যদের চেয়ে শব্দ ইন্দ্রিয়ের আহ্বানী বেশি। যদি সাধারণ শ্রোতার কানে

[illegible] আয়োজন ব্যর্থ হয় না। [illegible] ও [illegible] নজরুল যেভাবে [illegible] করেন, তা যদি সংগীতজ্ঞের [illegible] সুরের [illegible] যদি সৃষ্টির গভীরে [illegible] রাখায়।

তাই বলে নজরুলগীতির [illegible] শিল্প এমন [illegible] নয়। নজরুলের গানের [illegible] কিছু [illegible] শিল্পী [illegible] সংগীতের [illegible] দিয়ে [illegible] ও [illegible] সংগীতজ্ঞের [illegible] বাণী [illegible]। যেমন [illegible] নজরুল [illegible] এক [illegible] শিল্পীর [illegible]। [illegible] ও [illegible] নজরুল সংগীতের সেই [illegible] উপলব্ধ [illegible] হতে পারে। নজরুলগীতির কিছু শিল্পী [illegible] এবং নজরুলসৃষ্টির [illegible] নজরুলগীতিকে [illegible] শিল্প [illegible] দিয়ে [illegible]। [illegible] এখন [illegible] বাংলা [illegible] সেই। [illegible] উপস্থিত [illegible] না। [illegible] শিল্পী ও [illegible] নজরুলগীতির সুরবিকৃতিকে [illegible] তাঁরাই [illegible] সেই কাজ করেছেন। [illegible] দিয়ে তা [illegible] এই প্রবন্ধ [illegible]। নজরুলগীতিতে নজরুলের দেওয়া সুরেই [illegible] তাঁদের [illegible]। নজরুলের সুরগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কেউ কেউ [illegible] উল্লেখ করেন। এরা নজরুলগীতিকার [illegible] লেখা [illegible] (মাসুদের [illegible])। এই সব সুরে গান [illegible] নজরুল, না জানি তিনি [illegible] সুরকার। কিন্তু সেই [illegible] এই [illegible] গানটি [illegible]—[illegible] নজরুলের সুরসৃষ্টির [illegible] সম্পর্কে [illegible] করেছেন। [illegible] যে ভিন্ন সুরে গাওয়া হয়, ভিন্ন ব্যক্তির [illegible] সুরে, সেই [illegible] উল্লেখ করেই [illegible] তিনি। কিন্তু কোন [illegible] কেন [illegible] নজরুলের সুরকে [illegible] ভিন্ন সুরকে নজরুলগীতির [illegible]। [illegible] নজরুলগীতি-[illegible] না। নজরুলের সাংগীতিক জীবনের [illegible] বছর [illegible], [illegible] বাংলা সংগীত-[illegible] তিনি [illegible] করেছেন, কিন্তু তাঁদের [illegible] [illegible] তবু [illegible] বিদ্রোহী-বিপ্লবী [illegible] কি [illegible] দিয়ে [illegible] তাঁর যে প্রতিভা [illegible] সে প্রতিভা [illegible] [illegible] পর্যন্ত [illegible]। তাঁর ইসলামি গান [illegible] বিদ্রোহী ভূমিকা, একটি [illegible]

[illegible] ইসলামি [illegible] মৌলবাদীর [illegible] সেখানেই নজরুলের সাংগীতিক [illegible]। [illegible] নজরুল [illegible]—

"[illegible] দুনিয়ার [illegible] হয়েছে। কিন্তু [illegible] দুঃখ নিয়ে [illegible] তাঁদের দুঃখ নিয়ে [illegible] উপর [illegible]। [illegible] কিন্তু [illegible] তাঁর [illegible] দিয়েছিলেন [illegible] তোমাদের [illegible] তাতেই তোমরা আমার [illegible]। [illegible] এক [illegible] নিয়ে [illegible] ফুল [illegible] না জানি, কিন্তু [illegible] তুমি [illegible] আমায় [illegible] করবে।

মানুষের [illegible] অনুসারে পরিবর্তন [illegible] এই পরিবর্তনের [illegible] যোগাতেন [illegible]। মানুষের পেটের ক্ষুধা, [illegible] ক্ষুধার [illegible] ক্ষুধাও আছে, এ ক্ষুধা [illegible]। [illegible] মানুষ [illegible] কিন্তু [illegible] এটা [illegible]। [illegible] মানুষের মনের ক্ষুধা [illegible] ও [illegible], তাঁরা মানুষের মনের ক্ষুধা [illegible]। [illegible] তাঁরা মানুষের [illegible] তাঁদের [illegible] না। তাঁরা [illegible] থেকে [illegible]। [illegible] সৃষ্টিতেই [illegible] সৃষ্টির [illegible] তিনি [illegible]"

ইসলামি গান লেখার [illegible] নজরুলের [illegible] তাঁকে [illegible] হিন্দু [illegible] তাঁদের [illegible] এবং [illegible] হিন্দু [illegible] ইসলামি গান [illegible] করেছিলেন। [illegible] এবং [illegible] এই নজরুলকে কিন্তু [illegible] করতে [illegible] তাঁর উপর [illegible] তাঁর উপর [illegible]। [illegible] ইসলামি [illegible] তাঁর [illegible] ইসলামি গান [illegible] নজরুল-[illegible] নজরুলের [illegible]। [illegible] ইসলামি গান [illegible] নজরুলের [illegible] তাঁরা করেননি। [illegible]

"আমি মুসলিমকে [illegible] জন্য, [illegible] দূর করার জন্য আন্তরিক [illegible] মুসলমানকে [illegible] জন্য— [illegible] সত্যিকার [illegible] হয়নি—[illegible]

দিয়েছেন তাই দিয়ে অনেক লিখেছি ও নিজের জীবন দিয়ে তার সাধনা করেছি। আমার আত্মশক্তিতে প্রবাহিত বাণী অন্তত [illegible] রেকর্ডে শত শত ইসলামী গান রেকর্ড করে নিরক্ষর তিন [illegible] মুসলমানের ঈমান দৃঢ় রাখারই চেষ্টা করেছি। আমি এর [illegible] কাছে কবিতা গান কিছু চাইনি। এ আমার আল্লাহর হুকুম। আমি তাঁর হুকুম পালন করেছি মাত্র।" (১৯৪১, নবযুগ) অথচ [illegible] নজরুলকে ভুল বুঝেছিলেন। নজরুলের ইসলামি গানের একটি [illegible] খুব [illegible] তখন [illegible] হয়ে [illegible] হয়ে উঠেছি যেন কোথা থেকে [illegible]।

এটি বলা যায় নজরুলের কিছু বক্তৃতা বলতে চেয়েছিলেন, এই যে নজরুলের [illegible] এ যেন মধুসূদনের সেই [illegible] [illegible] আকৃতি—

A sigh for Albion's distant shore

Its valleys green its mountains high —

কিন্তু এভাবে কেউ দেখতে পেলেননি যে নজরুল কত অনায়াসে [illegible] ও [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] এক [illegible] [illegible] করে নীতিকুশলের [illegible] দিয়ে গেয়েছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে একটি অভিভাষণে নজরুল বলেছিলেন,

"হিন্দু মুসলমানে দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ। যুদ্ধবিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য ঋণ অভাব অন্যদিকে লোভী মানুষের ব্যাংকে লাখ কোটি কোটি টাকা পাষাণস্তূপের মতো জমা হয়ে আছে—এই অসাম্য এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে সংগীতে কর্মজীবনে অভেদসুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম অসুন্দরকে ক্ষমা করতে অসুন্দরকে [illegible] করতে এসেছিলাম—আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর। আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না—তবু [illegible] আমার [illegible] নেতৃত্বের আসনে [illegible]. [illegible] করতে পারি না। [illegible] বাঁচাতে পারি না, তবু [illegible] আমার [illegible] নিয়ে এই অনুপম, এই [illegible] [illegible] করতে ইচ্ছা করে। যদি আনন্দের প্রেমের বাণী দিয়ে আমাকে আমার একান্তই [illegible] পূজা থেকে অসময়েই নামাতে হয়—হয়তো সেদিন আমার আর কখনো না আমি সেই নজরুল। সে নজরুল অনেক দিন আগে মৃত্যুর খিড়কি দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেদিন আমাকে কেবল মুসলমানের বলে দেখবেন না—আমি যদি আসি, আসব হিন্দু-মুসলমানের সকল জাতির ঊর্ধ্বে যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম তাঁরই দাস হয়ে।..."

১৯৪১, ৫ এপ্রিল মুসলিম ইনস্টিটিউট হল-এ মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজতজয়ন্তীতে সভাপতির ভাষণ। শেষ অভিভাষণ।

এই অভিভাষণের অন্তরে কোনটি আমাদের স্পর্শ করে। অথচ অন্যদিক থেকেও [illegible] অনায়াসে বুক করে কেমন করে [illegible] [illegible] বিরূপ প্রতিক্রিয়া [illegible] শিকার হতে হয়েছিল। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] তাঁকে [illegible] [illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংগীতগতই তাঁর [illegible] ছিল, কিন্তু মুক্তির সম্ভাবনা ছিল না। তবু সত্য অভিজ্ঞতে, বক্তৃতায়, আবৃত্তি-উদ্যাপনে, সংগীতের ভাবনির [illegible] যে সমারোহে একদিন অভিষিক্ত ছিলেন নজরুল, সংগীতের [illegible] প্রতিষ্ঠা পেয়ে নজরুল একপ্রকার আত্মপ্রকাশ অনুভব করেছিলেন। ১৯৪১ এর ২ জানুয়ারি আবদুল কাদিরকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

"একটি উপন্যাসের দিন ছুটেন। তুমি আমাকে মানুষকে খুশি করতে দিয়ে আমাকে অন্যান্যতের অসম্মান অর্জন কোরো না যেন। ঐ লোগ [illegible] যে সর্বনাশ করেছে, তার ক্ষতিপূরণ বুঝি আর জীবনের হবে না। কতদিন অনাহারীদের হাতে [illegible] [illegible] [illegible] হাতের ঘুঁটি হয়ে। তাতে বুকের বাঁধা [illegible] কী [illegible]। [illegible] সেই বাঁধার বাঁধি [illegible] সুরের সুতোয় [illegible], তখন বাঁধাও [illegible] [illegible], [illegible] তেমনি [illegible] [illegible] [illegible]। আমার [illegible] [illegible] সকলের [illegible] [illegible] এসে মিশেছে। আমার [illegible] তীর্থলোকে পরিণত হয়েছে। সবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible]—এর চেয়ে বড়ো প্রার্থনা আমার নেই।"

কিন্তু সংগীত সর্বস্ব জীবনের এই আত্মপ্রসাদের [illegible] শেষ হয়নি। ১৯৩৮-এর ২৮ আগস্ট রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রয়োজনে একটি চিঠি লেখার সময় বিদেশী গ্রামোফোন কোম্পানির কাছে এই [illegible] [illegible] জন্য তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়া যায়—

[illegible]: [illegible] আপনার [illegible] [illegible] করিনি। আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিনি। [illegible] [illegible] [illegible] থেকে আমি [illegible] [illegible] নিয়েছি।

আমার এক নির্ভীক বন্ধু আমাকে উদ্দেশ করে একদিন বলেছিলেন, "তোকে কিনিটি কুকুরে কামড়েছে তাকে আমাদের সাথে নিয়ে যায় না।" সত্যি, তার হাজারই কথা। তবু কুকুরে কামড়ালে লোকে [illegible] [illegible] হয়ে অন্যকে কামড়াবার জন্য [illegible] হয়ে ওঠে। আমার কিন্তু সে শক্তিও নেই, আমি হয়ে গেছি বিষ-জর্জরিত নির্জীব।

[illegible] [illegible] থেকে সরে এসে নজরুলের সংগীতজীবনের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনায় নতুন আলো ফেলার জন্যই এই উক্তিটি [illegible] তাৎপর্যময়। আরবের মরুবাসী বেদুইন পাঞ্জল ও [illegible] [illegible] [illegible], ইসলামি জোয়ানের [illegible] ও হিন্দু পুরাণের পৌরাণিক ভক্তি, [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] নারী শক্তির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রাকৃতিক মহিমা ও [illegible] [illegible] [illegible] যায় [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে গেছে তার সংগীত প্রতিভার সামগ্রিক মূল্যনির্ধারণে কিছু [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] এসেছে। [illegible] শিল্পীর [illegible] জাতীয় চেতনা দিয়ে নজরুলগীতির মূল্য নির্ধারণের দিন শেষ হোক।

[illegible] [illegible] [illegible]

নজরুল ঃ শিশু ও কিশোর সাহিত্য

রেখা দে

বাংলা ভাষায় শিশু ও কিশোর সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অসামান্য ও চিরন্তন। দেশাত্মবোধ কবিগুরুর মত উজ্জ্বল ও প্রখর। শিশুমনকে সহজেই জয় করে নেয়।

শিশু ও কিশোর সাহিত্যকে মোটামুটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক ঃ শিশুদের দ্বারা বা তাদের বা কিশোরাবস্থায় রচিত সাহিত্য এবং দুই ঃ শিশুদের জন্য বা শিশুকে নিয়ে সৃষ্টি সাহিত্য।

কাজী নজরুল ইসলাম এই দুই পর্যায়েই শিশু সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা। তিনি তাঁর শিশুকালে ও কৈশোরাবস্থায় প্রচুর সাহিত্য রচনা করেছেন—কবিতা, ছড়া-কবিতা, ছড়া, প্রহসন ইত্যাদি। কয়েকটি শিশু মনস্তত্ত্বের হলেও অধিকাংশই রসাত্মক ও উদ্দেশ্যমূলক এবং সবই বাংলাদেশের হয়ে গেছে। শিশুমনকে প্রভাবিত করে সহজেই। আবার পরবর্তীকালে শিশুদের জন্য তাঁর রচিত ও সৃষ্টিসম্ভার—শিশুমনকে যে অভূতপূর্ব এক আনন্দের খোরাক দেয়।

প্রথমে আলোচনা করছি তাঁর শৈশব বা কৈশোরাবস্থায় রচিত সাহিত্য সম্পর্কে।

বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রাম—যেখানে বিখ্যাত রাজা নরোত্তম বাস বা শিয়রে গড় আর দুটি পাথরের একটি দীঘি পীরপুকুর—সেই গড় আর পীরপুকুরের পাশে একটি ছোট মাটির ঘরে নজরুলের জন্ম। পবিত্র নজরুলের আব্বার মাটি। যেই মাটির কাহিনী মানুষজনের মুখে শোনার ছবি এখেছে তার রচিত সাহিত্য। বাল্যকালের লেখা সাহিত্যগুলিও এর থেকে বাদ যায়নি। কবিতা যাতে মাটির গন্ধের এই গড়টি প্রাচীনকালে একসময়ে রাজা নরোত্তম ছাড়ার রাজধানী ও দুর্গ নির্মাণের ক্ষেত্র ছিল এবং যা পুরাকীর্তিরূপে সংরক্ষিত। শিশু নজরুলকে এই গড়টি আকৃষ্ট করত। তাঁর শিশুমনে এই রহস্যময় গড়টি অনেক জিজ্ঞাসার কারণ হত। এই জিজ্ঞাসারই প্রতিফলন হয় তার বাল্যকালে রচিত এই রহস্যপূর্ণ সম্পর্কিত একটি কবিতায়

(ঐ) গাঁয়ের পশ্চিমে দাঁড়িয়ে কে তুমি যুগ যুগ ধরি একা গো?
তোমার বুকে ও কিসের গভীর রেখা গো?
এ কোন্ দেশের ভগ্নশেষ?
কোন্ নিশিথের কাহিনীর দেশ?
আর অতীতের আবছায়াটুকু পাষাণের গায়ে লেখা গো—
তোমারি উপরে কোন্ সিপাহের বিদায় অশ্রু রেখা গো!

নজরুলের আব্বার রচনা হয় "দুখু মিঞা" তখন তখন থেকেই "আমার বাংলা" ও "নজরুল বাণী" নামেও তাকে ডাকা হত বোধহয়। সাহেব পাশে পাশাপাশি রেখে তাঁর জীবনে দুঃখের সহাবস্থান দেখি আমরা তাঁর পরবর্তী জীবনে তার দুঃখের অনুভূতি—যা তাঁর বাল্যাবস্থায় রচিত উপরে উল্লিখিত কবিতাটিতেও প্রকাশিত। শিশু নজরুলের মন যেন এই রহস্যের

একাকীত্বে ও তার অন্তিমতার বীণাতে।

মাত্র নয় বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ। আর তখন থেকেই পরিবারের এই পিতৃহীন শুরু হয় জীবন সংগ্রাম। নয় বছর বয়সে নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দারিদ্র্য অভাবের জন্য পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সেখানে মাজারের কাজ করায় শুরু করেন কখন মক্তবে, কখন বা হাজী পালোয়ানের মাজারে বা পীরপুকুরের মসজিদে ইত্যাদি। এর ফলে নজরুল বিদ্যালয় না হয়ে উঠলেও প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অভিজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রথম বয়সে লেখা 'মক্তব' নামক গল্পে।

নজরুল মক্তবে থাকার সময় উর্দু ও ফারসী শব্দ দুহাতে দুই দিয়ে তাহার দীর্ঘছন্দে পদ্য রচনা করতেন। যেমন ঃ

মেরা দিল্ বেতাব কিয়া তেরী আব্রু যে কামান,
জ্বলা যাতা হ্যায় ইশক যে জান পেরেশান।
দেখে তোমায় জানি
হয় অলকিনী
ধরি কি যে কাঁপায় শোনা, আরাধনা প্রাণ।
বুলবুল করাতে এসেছে হাতী মধু পান।

—নজরুল (মক্তবে)

নজরুলের জীবনী নিয়ে এক দল চুরুলিয়ার মক্তবের শিক্ষক গ্রামবাসী কাজী ফজলে আহমদের ও সম্পর্কিত কাকা কাজী বজলে করীমের কাছে। দশ বছর বয়সে বালক নজরুল পড়েন উপার্জনে বাধ্যতাই লোকদের কাছে 'লেটো' নাচ-গান আর তাহার দলে। এর ফলে অল্প বয়সেই পরিচিত হলেন লেটো কবিদের ছন্দ-পয়ার রচিত নাটক, গ্রাম্য কবিদের সঙ্গীতের শৈলী, কবির লড়াই, বিয়ে বিয়ে ও পাশে পাশে মোল্লা ও দরবেশদের মজলিসের সঙ্গে আসর সঙ্গে। পরিচয় ঘটলো এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির সাথে। অল্পকালেই ঐ সব 'লেটো'র দলে উপযুক্ত নাটক ও পালা রচনার শিক্ষক হয়ে উঠলেন নজরুল। এ সম্পর্কে নজরুলের এক আত্মীয় লিখেছেন ঃ

"অতীব অসাধ্য ব্যাপার ছিল না যেই নজরুল এইসব 'লেটো'র দলে গান এবং নাটক রচনা করে নিজে দর্শ উপস্থিত করতেন। তাঁর রচনা দেখা যেতো যেমন হয়ে যায় ঐ দলের জন্য তাঁর এর তাল হয়ে লাগতো যে ক্রমে তিনি নিমসা ও চুরুলিয়া এবং রাখাখুড়া এই তিনটি 'লেটো দলের' পক্ষে নাটক রচনার ভার পেলেন। এই সময় তিনি অনেকটি ছড়া বড় বড় ঐতিহাসিক নাটক ও 'মেঘনাদ বধ' নামে একটি নাটক রচনা করেন।" (নজরুলের জন্মজীবন—কাজী আবদুল ওদুদ উদ্ধৃত)। প্রকৃতপক্ষে লেটোর দলেই কাব্যিকাপ্রতিভার কবি ও শিল্পী নজরুলের জন্ম।

বাল্যকালেই নিমসা গ্রামের লেটোর দলে তিনি ওস্তাদ পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ওস্তাদ হিসাবে রচনা করেছিলেন অনেকগুলি সঙ্গীতবহুল আখ্যানমূলক নাটক এবং কবির লড়াই-এ অংশগ্রহণ করে আসর মাত

করতেন। কিশোর বয়সেই মুখে মুখে তাৎক্ষণিক ছড়া ও কবিতা রচনা করতে পারতেন। তাঁর অবসরকালীন নাটক রচনা লিখতেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

চুরুলিয়ায় ঐ চাকলেন বিদ্যার কবিয়াল "লেটোকবি" শেখ চকোর নজরুলকে বাঙালি আখ্যা দিয়ে কবিতা-বাণী বলেছিলেন, 'এই বাঙালি একদিন বড় হয়ে নাম রাখবে।' লেটোকবির ভবিষ্যৎ বাণী যে কত সত্য হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নজরুলের বাল্যকালের রচনা 'চাষার সং', 'মেঘনাদ বধ', 'শকুনি বধ', 'দাতা কর্ণ', 'রাজপুত্র', 'আকবর বাদশা' প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক দুষ্টক নাটক ও প্রহসন আমাদের জাতীয় রচনা হিসেবে গণ্য।

কিশোর কবির রচিত ব্যঙ্গধর্মী নাটক ও ব্যঙ্গাত্মক জাতীয় রচনার উদাহরণ :

হাত করে দেয় কচিয়ে
হবে নাকো প্রমাণ এতে
কেননা কবি 'হীরালাল',
কেরাণীর কবি 'মানবেন্দ্র',
অহংকার করিয়ে মন দিয়ে
চিন্তা কি যে এই ভাবেতে।
রূপক
জীবন বাণী অঁচিতে
হাত কর মিলি-প্রাণে
করে যদি সুখেতে
এ পৃথিবী আমাতে

('চাষার সং' নাটিকা—নজরুল রচনাবলী)

এই রচনাগুলি নজরুল বাল্যকালে রচনা করলেও পরিণত প্রাণবন্ত। তাছাড়া কবিতা লেটো দলে গাওয়া ভক্তিমূলক গান : 'মন তুমি কৃষিকাজ জানো না, এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা'।

'চাষার সং'-এর এই সমস্ত গান নজরুলের পরবর্তী জীবনের অন্যতম সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছে। যেমন :

'যদি আমায় নাচে বীর সুনারি এবার মনের মাটি
কেন্দ্রে ফসল ফলিয়ে রাতে কিষাণদের খাঁটি।'

কিশোর নজরুলের রচিত রসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক গান, যা আমাদের কবিগানের ভাষা ও রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়।

পিতা হয়ে পরাজিতে পড়াতে সাধ
জ্ঞান নাই কি তোমার বাবাজান হয়েছিল উন্মাদ।
তাজ হতে কোন সাহসেতে
বাদ সাধিল প্রভুজীর ব্যাপার পাকে
কেন হতে প্রভুর সাথে নীর তুমি বাদ।

('শকুনি বধ'র একটি গান)

'শকুনি বধ' পালায় আরো লিখেছিলেন :

'পাণ্ডবায় কয়, 'পাণ্ডব দল' শোনো শোনো মোর বাণী যজ্ঞিক।'
অন্য কয়, 'প্রভু! সব খেলার পরিণত উঠিছে যজ্ঞীরা।'
শিব কয়, 'প্রভু, সুখী বানালো টুপী দাড়িয়ালা বুড়ী।'

কিশোর নজরুল কবিগানের অনুসরণে পালায় ছন্দের বিচিত্রিত রচনা করতে লিখেছিলেন :

তুমিময় নাম এইসব পুত্রের (পাড়ায়) অপমানে হে।
কোথা বিধিলে এ প্রাণ আমারে বলনা হে।
মোদের হিয়া কঠিন অতি
কাননে পাখি প্রেমের গীতি
তাই নিরাশে প্রেমের গতি
মাৎ যদি হেলেনে হে।

কিশোর বয়সেই রচনা করেছিলেন হাস্যরস ও শীতলীর মধ্যে কিছু ব্যঙ্গ কীর্তি। এই সব ব্যঙ্গ গীতিকাগুলিতে মজাদার করার জন্য ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষার মিশ্র শব্দের ব্যবহার রয়েছে এবং প্রতিশব্দের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করে গাওয়া হয়। একটি নমুনা দিচ্ছি :

ওরে ছুঁচো that পামারি
মত্ত বড় mad
চেহারাটাও monkey like
দেখতে ভারী Cat
Monkey সাজাতে বাবর কা সাজ,
ইয়ে বড় ফাজিল বাত,
ফাজিল এ, মেটে হাবাধ
চাষাটি has led
শোনো ও ভাই brother মেয়েছেলে।
মাতৃর জন্য সব করেছে পণ
পথে দাঁড়িয়ে বাজার মাঝে
শকুন বড় Sad
এ তাই থাকে বড় Sad।

কবিগুরু ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ইঙ্গ-বঙ্গ রচনায় যেমন ব্যঙ্গ নজরুলের তেমন একটি মজাদার রচনা—'বদনা তৈলাক্তপুর আই অ্যাম ক্যাবলাকান্ত গোপীন'।

বদনা তৈলাক্তপুর
আই অ্যাম ক্যাবলাকান্ত গোপীন
তব সব ইংলিশ ফেলেন,
আমার মতি কি পাইটিনি ?
ইংলিশ ফেলেন যদি হতে
নাকি কি সুন্দর হয়ায়।
দেখলে বন্ধু দেব ভোলায়
কামন্ ডিয়ার গুড ঘণ্টি।

কবির নিজের বাণী ছিল বদনে প্রেমের গীত। তাই অনুরোধে রচেছ তাঁর রচিত 'রাজপুত্র' নাটকের মধ্যে :

চলো ওরে নদীপুর বারো হাজারো ফিরে
উদ্যানের মধ্যে মহিমা দেখি নাই কেন দেশান্তরে।
অনাথ গ্রাম-নগরী,
পুণ্যভূমি পবিত্র অতি, বন-নদ-নদী,
দেখিলাম, কিন্তু নিরবধি বদনে কাঁদিয়ে যাইতে।

আগেই উল্লেখ করেছি প্রকৃত পক্ষে লেটোর দলেই নজরুলের জন্য হয়েছিল ভবিষ্যতের জনপ্রিয় কবি ও শিল্পী নজরুলের। এ যেন লেটোর দলে তাঁর হাতিখড়ি এক বছরের বেশী নয়। লেটোর দল ছেড়ে নজরুলের জীবনযাত্রা আবার হয়ে যায় অস্থির ও অনিশ্চিত। কখন চ-

সেখানে গড়েন কাব্য, গুণে বাড়িতে বসবাসের কাজ অথবার কখন বা অনুষ্ঠানের বিদ্যুতিদের জন্য স্কুলে যাতায়াত।

স্কুলে পড়াকালীন কিশোর নজরুলের কবিতা বাংলার পুরোনো আরো শিশুদের (কিশোর) বিদায় জানে। কবিতার লেখা বিদায়-অভিনন্দন লেখা করতেন তিনি। অভিনন্দন পত্রে নজরুলের নাম অবশ্যই লেখা নয়। কিন্তু তিনি পুরাতনকে অন্যান্য রচনার প্রতিভার প্রভৃতি এই কাজগুলিতেও নিজের নাম রেখে দিতেন। এই রকম একটি বিদায় অভিনন্দন—"করুণ গাথা"।

> অনে না আর না যাবা সঙ্গে লাগে আর,
> অনেক উঠিল ডাকি ঘোর হায়হায়।
> একটি একটি করি নিভিছে দেউটি দ্যুতি,
> যে আলো ঢলিয়া যায় নয়ন ঢলিয়া যায়,
> কেন্দ্রে নিয়ে কেলে মোর কাঁদায় আমার'
> বেদনা মোহ ভোরে বেদনা গো অব।
>
> মিনতি করিয়া কহে মোর দিও না
> ভোলো এ অতীত স্মৃতি ভুলনা কোলের মাঝে
> দুর্ব হয়ে না যাক আমার পড়িছি আমি
> যবে শহিয়া আছে বেদনা বেদনা।
> আর একটি বিদায় অভিনন্দন—'করুণ বেহাগ'

(ওহো) বিদায়-বেদনা বিজড়িত এই গোধূলির সেই স্মৃতি
> না বুঝিতে হায়, পুনঃ জেগে ওঠে—জেগে ওঠে প্রীতি।
> দুখি দুখি সেই দুর্দিন—বিদায় করুণ স্বরে,
> তুমি নিভাইয়া রক্ত-আভা বক্ষ বাঁধিয়া করে।
> বিদায়ের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে পুরানো বিরাট দীপ
> অশ্রু ঝরিয়া উঠিছে যে আঁখি, কাঁদিছে হৃদয়-দীপ।
> থাকে না যদি স্পন্দন মন দু'হাতে বক্ষ চাপি
> আকুলি বিকুলি বুক বুকে এসে করুণা ওঠে কাঁপি।

দুটি অভিনন্দন পত্রেই বালক হৃদয়ের বেদনা ও আবেগ পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত।

শিয়ারশোল স্কুলে পড়াকালীন একজন আরো দুটি কবিতা লিখেছিলেন বাস্তবে দেখা একটি প্রাচীন বাড়ির চিত্রকে নিয়ে। কবিতা দুটির নাম— একটি 'রাজার গড়' এবং অপরটি 'রানীর গড়'। রাজার গড় :

> বন্ধু তোমার পথ ছুটিয়া গেছিল,
> বহুরাজন রাজ-দেবালী।
> রাজে নাকি ছিল প্রবল রাজার দুলালী।
> আঁধারের কোণ এখন দেখায়
> থিতিয়ে রয়েছে অনেক শাহার
> সকাল সাঁঝে খেলতো যেথায় সুবাস ফুল দেয়ালী
> হায়রে হাতে ধরে আসতো সেথায়—আসতো রাজার দিয়ালী।

রানীর গড় :

> এই বাড়িটার পাহাড় নীরব নিঝুম রানী যায়।
> এসে বন্ বন্ স্থানে দেখে আলো আলো আলোয়ায়।
> এই দিকে যায় এই স্থানে পাঠ

সকাল হোলো শিশু পিয়ে ছোটে,
দিনে তার দেখে কাজ গড়ে উঠে
অবশ্য দেখেনি প্রতিদিন।
এই দেখো বাসা দু'পাশে চাপে
কচিদের মুখে প্রকাশ।
ওগো তাদের আহা ঝরী মার।
এই কাজ এর শাবক
নিজের চিরদিন বাঁচী যায়।

নজরুলের শিশুমনের স্কুল জীবনে লেখা আর একটি কবিতা 'চড়ুই পাখির ছানা'। এটিও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। এক সময়ে বাড়ির বাইরে চড়ুই পাখির বাসা। ঐ বাসা থেকেই নিচে পড়ে যায় এক চড়ুই ছানা। তাদের জন্য তার আকুল কান্না বালক নজরুলকে উদ্বেলিত করে তোলে, আর সেই বেদনার প্রকাশ ঘটে কবিতার মাধ্যমে বালক নজরুলের লেখনীতে।

> ঐ যে বড় অশ্বত্থ-গাছটির উঁচু শাখে ঐ কচির ফাঁকে
> ছোট একটি চড়ুই ছানা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে মাকে।
>
> (চড়ুই পাখির ছানা)

একথা আলোচনার প্রতি নজরুলের পরবর্তী জীবনে শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত সৃষ্টি সম্ভারের। যখন নজরুল প্রতিষ্ঠিত লেখক ও কবি, যখন নজরুল দেশ-মাতৃকার বন্ধন মোচনে বিদ্রোহী ও সংগ্রামী সৈনিক তখনও নজরুলের লেখনীতে শিশুমন দিয়েছে শিশুদের জন্য। ভোর হয়েছে। পাখিরা জেগেছে সবাই। শিশু জীবনে তার হয়ে জেগে ওঠার পালা। তাই কবি যেন শিশুকে দাঁড়িয়ে আহ্বানে বলছেন :

> ভোর হোলো দোর খোলো
> খুকুমণি ওঠ রে!
> ঐ ডাকে জুঁই-শাখে
> ফুল-খুকী ছোটে রে!
>
> খুলি হাল তুলি পাল
> ঐ তরী চললো,
> এইবার এইবার
> খুকু চোখ খুললো। (প্রভাতী)

শিশু-সাহিত্যে নজরুল আজোও অমর হয়ে আছেন। সংখ্যায় কম হলেও শিশুদের জন্য তার রচিত কবিতা, ছড়া ও নাটিকাগুলি শিশুমনকে নিমেষেই জয় করে নেয়। বাংলার প্রথম জাতীয় পদাতিক কবি শিশুদেরও প্রিয় কবি। তা হতে পেরেছেন তার কারণ কবি নিজে ছিলেন শিশুর মতই সরল। অন্যান্য কবিদের এই কবির মধ্যে একেবারেই শিশুদের, শিশুর মত অবস্থাকেন। শিশুদের খুশী ভালোবাসতেন। অত্যন্ত আকুল কল্পনায় শিশুদের মতন। তাই শিশুদের জন্য তিনি অনেক কবিতা ও ছড়া লিখেছেন তার প্রত্যেকটিতে কবির নিজস্ব ভঙ্গী ও বাস্তব সম্পূর্ণ রক্ষিত।

শিশুর মন যেমন কল্পনাপ্রবণ ও খেয়ালী নজরুলের মনও কল্পনাতে ভরা ছিল। সবার শিশু হিসেবে শিশুদের সাথে তাঁর খুবই নিকটে ছিল। তাই তিনি নিখুঁত ও সার্থক শিশুসাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

'ঝিঙেফুল', 'সাতভাই চম্পা', 'পুতুলের বিয়ে' (নাটিকা), 'ঘুম জাগানো', 'মক্তব' ইত্যাদি সবগুলোই শিশুমন জয় করে নেয়। 'খুকী ও

'কাঠবেড়ালী' কবিতাটিতে শিশুমনের কল্পনা ও কাঠবেড়ালির সম্পর্ক ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে।

কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি-নেবু? লাউ?
বেড়াল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা? তাও?

কাঠবেড়ালি! তুমি আমার ছোড়দি হবে? বৌদি হবে? হুঁ!
রাঙা দিদি? তবে একটা পেয়ারা দাও, উঃ!

...

ইস্! খেয়ো না মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!
আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও!

(খুকী ও কাঠবেড়ালি)

শিশু পাখি ভালোবাসে। আকাশের বুকে পাখির উড়ে। শিশুর মনও উড়ে চলে। তাই কবি লিখেছেন:

আহ্লাদী! সাতভাই
আকাশ পাড়ার দেশ রূপার!
মুখ পাখি! বাবুর মেঠো
ধান খেতে তুই কোন্ আকাশ?
কোথা মেঘের পাখী হবি,
পরিস্থানের দেশ্ কিশোরী
হালকা পাখার উড়ে চলে যায়।
নিয়ে বাঁশের সাথে আজ।
পাকা-ফুলে ঘুম ভেঙে চল,
মেঘের দেশ আকাশে! (সাতভাই চম্পা-১)

মানুষ শুধু নয়—প্রকৃতির চিত্রপটের সাথে সম্পর্ক। মানুষ সাথে পশুদের অনুরূপ ঐক্যটি। তার দাদুকে নিয়ে মজা করে বলে:

অ মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খাঁদা নাকে নাচছে ন্যাদা—নাক ডেঙা ডেং ড্যাং!

দাদু বুঝি চীনাম্যান্ মা, নাম বুঝি চ্যাং?
তাই বুঝি ওঁর বুবতি অমন ব্যাঙের মতন ঠ্যাং!
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন!
অ মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙা ডেং ড্যাং!

বাঁশির মতন নাসিকা মা মেলে নাসিকে,
সেথায় দিয়ে চল দাদু দেখন-হাসিকে।
সেথায় গিয়ে কাঁদনারু পান্তু দেখেন খান,
খাঁদু-দাদু নাকু হবেন, নাক ডেঙা ডেং ড্যাং। (খাঁদু-দাদু)

মামারাও বাড়ি পায় না। মামার বিয়ে আনন্দ-ভাবনিয়ার কাছে অভিনব উৎসবের ব্যাপার।

হাতীর আসছে এ বর
বোতাম কোমরে আবার!
কাজ কি মজার খবর।
আমি তোকে করব বিয়ে।
(মামার বিয়েতে খোকার উক্তি)

নজরুলের কয়েকটি কবিতা শিশুমনের কল্পনাকে ধরে রেখেছে। শিশুরা কল্পনা-বিলাসী, মন দিগদিগন্তে ঘুরে বেড়ায়—রাজার ও চাঁদের দেশে অথবা পরি-মায়ার দেশে শিশুর মন চলে যায়। তাই কবি লেখেন:

ওরে সাবিত্রি দিয়ে আমায় নিয়ে
চল না কল্পনাটি দিয়ে দেশে।

শিশুরা যেখানে থেকে গিয়ে থাকতে চায় সবগুলি অমৃত। পৃথিবীতে থাকবে না আর জরা, মৃত্যু। শুধু থাকবে চিরসবুজ কৈশোর। নজরুল 'জাগো সুন্দর চির কিশোর' কবিতাটিতে এই অপূর্ব কল্পনাটি রূপ দান করেছেন।

'ঝিঙে ফুল' কবিতাটিও শিশুমনকে দেয় অনাবিল আনন্দ।

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ঝিঙে ফুল
ঝিঙে ফুল
পউষের বেলা শেষ পরি' জাফরানি বেশ
মরা মাচানের দেশ করে তোলো মশগুল
ঝিঙে ফুল
শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে
আলুথালু ঘুমু যাও রোদে-গলা দুকুরে। (ঝিঙে ফুল)

শিশুকালেই মানুষের শিশুদের মনে কল্পনার রং ধরিয়ে দেয়। শিশুর বাল্যকাল খেলাধুলোর মধ্যে অনেক সময় কাটে। অনেক শিশু বড় হলে কল্পনার দেশ থেকে পরীর মতন উড়ন্ত কী আনতেন ঘরে। তাই কবিও রচনা করে গেছেন:

কাগজ 'জালি'র মতো হলে সুন্দরী এক মেয়ে,
তারই সে তার ঝিনুক সকল দুধ-আলতার ছেয়ে।
তাই না দেখে' মৌমিনিরা কাঁদে সেদিন মেয়ে',
"লাল দাড়িম কাহারো তুমি শীতকালে এক এসে?"
কাঁচু আমি মৌমিনিরাও—" এ তোমাদের ফুল,
আর ছেড়ে কথ, সোনার-কলি ফুটেছে ফুলফুল!"
(আমার উড়িবার)

অথবা

সুন্দরী গো সুন্দরী
কাঁচটি তোমার কোন্ গোরী?
সুন্দরী গো সুন্দরী!
কোন সে পাখির কাঁকনটিতে
কথাটি দিয়ে কাঁকনটিতে,
অন্দরে যাও আর চমকে চাও
ঘুমিয়ে কর সুন্দরী?
সুন্দর গো সুন্দরী। (সুন্দরী)

নজরুলের লেখা কয়েকটি গান ও হাস্য কবিতা শিশুমনে দোলা দেয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার বিশেষ করে ইংরেজী ও হিন্দী শব্দের সংযোজন লক্ষণীয়।

নিব জুতো দই দিয়ে
ঝিম ধরেছে তোমরা।
মিঠে ধ্বনির নূপুর বাজাও,
ছুটুর নাচো তোমরা। (প্রকৃতি প্রেম)

হুমকা
ওরে হুলো has পালাবার
মস্ত বড় road
(হুলো বেড়াল [illegible])

নজরুল-সাহিত্যের আঞ্চলিক ভাষার ছড়া দেখেছেন তাঁর 'ঝিঙেফুলের' প্যাঁচা 'জানিস্কি' পত্র।

ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়
যাইতে যাইতে খাড়া খায়।
কাওয়ারা সব লইল পাছ,
প্যাঁচায় দিল উইড়্যা গাছ।
প্যাঁচার ভাইপুত্র ভোলা বাদ
কইল চাচা শব দেখ চাঁদ।
প্যাঁচা কয়, বাপ বাহিরে যাও
পাখ লইয়া সব হুতুমের ছাও।
ইঁদুর কপাই লইয়া যায়
ধোঁয়া নাকে পাক খাওয়ায়।

বাংলা ও ইংরেজী শব্দ মেশানো আর একটি কবিতা :
তোমাদের কথি দেখিয়ে তোমরা পারো হাসি, দাদী, কেটি,
এদিকেতে যাহা পার বলে, তোমার বাপের বলি, 'ছি-ক্রেট'।

শিশুরা দুষ্টুমি করতে ভালবাসে। শৈশবকালে কবিও ছিলেন দুষ্টুমিতে পাকা। তেমনি লেখাতেই 'মেকনাত বধ', 'সাপুড়ি বধ', 'চোরের বধ' প্রভৃতি গল্পগাথা রচনা করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে বাল্যকালীন—তা অপূর্ব পরেছি। এতে কবি প্রকাশ্যভাবে ভালোবাসা ও প্রশংসা কুড়োলেও তাঁর শৈশবটা এতটুকু কমেনি। শিশুর মেজাজের তার দুষ্টুমিতে পরিচিতি হয়ে উঠে। তাই তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নজরুলের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেয়। রানীগঞ্জের কাছাকাছি শিয়ারশোলের রাজস্কুলে ও দরিরামপুরের হাইস্কুলে নজরুল কিছুদিন পড়াশোনা করেন। তাই নজরুলের সাহিত্যে শিশুদের দুষ্টুমিও ধরা পড়েছে। লিচু চুরি করতে গিয়ে মালীর হাতে মার খাওয়া নজরুলের লেখনীতে আমার হয়ে আছে।

বাবুদের তাল পুকুরে
হাবুদের ডাল-কুকুরে
সে কি বাস্ করলে তাড়া
বলি থাম্, একটু দাঁড়া।
পুকুরের ঐ কাছে না
লিচুর এক গাছ আছে না।

.....
পাঁচিল পড়ে নামিত তাড়ী
সে ছিল গাছের আড়ি
ব্যাটা ভাই বড় নচ্ছার,
ধুমাধুম গোটা দুচ্চার।
দিলে খুব কিল ও ঘুষি
একদম জোরসে ঠুসি। (লিচু চোর)

তুলনা নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের নজরুলের স্বাধীনচেতনা ও খেয়ালী মন মেনে নিতে পারেনি। হঠাৎ-ই স্কুল ছেড়ে দিয়ে তিনি একটি রুটির দোকানে মোটের কাজ বা খাটি অলস বালক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। সমাজের অনাচার ও দারিদ্রের জ্বালা কাছে থেকে উপলব্ধি করেন। তাই শিশুদের অসহায় শিশুর অবস্থার নিখুঁত চিত্র তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে।

এই যে মায়ের অনাদরে ক্লিষ্ট শিশুগুলি
পরনে নেই ছেঁড়া কানি, সারা গায়ে ধূলি,—
সারাদিনের অনাহারে শুষ্ক বদনখানি,
খিদের জ্বালায় ক্ষুণ্ণ, তাতে জ্বরের ধুকধুকানি,
অযতনে বাছাদের হায়, গা গিয়েছে ফেটে
খুদ খাটা তাও জোটেনিক সারাটি দিন খেটে
এদের ফেলে ওগো ধনী, ওগো দেশের রাজা
কেমন করে' রোচে মুখে মণ্ডা মিঠাই খাজা।

তোদের পাশের ঘরের মানুষ, তাদের সোনার পাঁড়,
এরা যে না খেতে পেয়ে হয় একটি টুকরো হাড়।

দুখ এদের কেউ বোঝে না খোঁজ সবাই করে,
আহা, এদের বল্লাই যেন সবেই দুখে মরে।

([illegible])

কবি-কিশোর মন হয়ে সমাজকে উদ্দেশ্য করে কবি দেখেন এই সব সমাজই একদিন সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে উল্লিখিতের সুখের পৃথিবী গড়ে তুলবে। তাই কবি দেখেন :

চঞ্চল চপল তরুণ দল জীবন-ধারা।
চল্ সবার সমুখে চল্ আজি' আগা,
আগড়ে কাঁদে নব শক্তির ইশারা।।
জল ছেড়ের ঝিলমিল
আয়রে তোরা ওরে চল,
তোদের আমি' কথা নহিরে
পাহাড় দিয়ে বাড়াবাড়া।।

([illegible])

তারুণ্য,
মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক্,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠা বিহীন
নিত্য কালের ডাক।
আমরা তাজা খুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল
আমরা ছাত্রদল।।

(ছাত্রদলের গান)

নজরুলের পূর্বসূরিদের মধ্যে যাঁরা শিশু-সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁদের মধ্যে নজরুলের একটি বিশেষ স্থান আছে। তাঁদের রচনা ছিল প্রধানত নীতি-উপদেশ ও শিক্ষামূলক। তাঁদের অনেকেরই উদ্দেশ্য থাকত তাঁদের রচনাবলীকে পাঠ্যপুস্তকের উপযুক্ত

করে রচনা করা। স্বাভাবিক ভাবেই শিশুমনে ছাপ পড়ে। কিন্তু নজরুলের রচিত শিশুকবিতাগুলি শিশু মনে দেয় অনাবিল আনন্দ। শিক্ষার ভারে তারা শিশুমনকে ভারাক্রান্ত ও পীড়িত করে তোলেন না। অবশ্য নজরুলের 'মা' কবিতাটি শিশু পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে। ১৩২৮ সালের শ্রাবণ মাসে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হয় এবং সেই সময়ে কবিতাটি জনমনে সমাদৃত হয়।

যেখানেতে দেখি যাহা
মায়ের মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনখানে কেহ পাইবে না ভাই

...

পাতে লইয়ে
ইঁদুর কচাই কইয়া খায়
বোঝা নাকে, ফ্যাচফ্যাচায়।
আয় তবে ভাইবোন
আয় সবে আয় শোন্
গাই গান, পদধূলি শি'রে নিয়ে মা'র—
মার বড় কেউ নাই—
কেউ নাই কেউ নাই!
নত করি বল্ সবে "মা আমার! মা আমার!"

এবারে নজরুলের শিশুক ছড়ার কথা বলি। তাঁর রচিত ছড়াগুলিতে পল্লীগ্রামের পরিবেশ ও লৌকিক আচার বিচারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন :

ঘুম-পাড়ানী মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভরা পান দেবো গাল ভরে খেয়ো
ঘুম আয়রে, ঘুম আয় ঘুম।
ঘুম আয়রে, দুষ্টু খোকায় ছুঁয়ে যা
চোখের পাতা লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে যা:
ঘুম আয়রে, ঘুম আয় ঘুম।

নজরুল সাহিত্যে শিশুদের জন্য ও শিশুকে নিয়ে যে সমস্ত রচনা সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে কোন জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই। সেগুলি মণিমুক্তোর মত উজ্জ্বল তাই স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি চিরকাল শিশুমনে অমর হয়ে থাকবে।

এখনো কলের গানের রেকর্ডে নজরুলের গাওয়া সেই গানটি কানের পর্দায় ভেসে যায় :

আমার খোকার মাসী
শ্রী অমুক বালা দাসী।
তাকে দেখেই সর্বনাশী
উঠে খিলখিলিয়ে হাসি।
সে খান্দানো পান জর্দা
তার চেহারাও মর্দা মর্দা।
তবু বুকনে কিনা বড়মা
আমি তারেই ভালোবাসি।

নিষিদ্ধ গ্রন্থ তালিকায় নজরুল ও তার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

বাঁধন সেনগুপ্ত

মধ্যবিত্ত বাঙালির মনোচিন্তায় নজরুলের রাজনৈতিক ভাবনা ও তার মূল্যায়ন আজও তেমন পরিকল্পনা অনুসারে করবার কাজে কেউ এগিয়ে আসেনি। ফলে নজরুল যতখানি আবেগ ও রাজনৈতিক প্রবাহে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী মানসকে উদ্বেলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই তুলনায় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা এবং তাকে বিস্তৃত তুলোকে আমাদের কোনো বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা অনুপস্থিত। অথচ জাতীয় প্রেক্ষাপটে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়েই ছিল প্রতিবাদ আর বিক্ষোভ, বিদ্রোহ আর সশস্ত্র আন্দোলনের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিপ্রেক্ষিত। বলতে গেলে উত্তাল অগ্নিগর্ভ বাঙালী যুব সমাজের চোখের সামনে তখন ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন। দেশের তখন দেশের নানা প্রান্তেই বিপ্লবী ভাবনার অগ্নিশিখা জ্বলেছে। তার মধ্যে বিদেশ থেকে সাগর পার হয়ে আসা গোপন অস্ত্রশস্ত্রে দেশের যুবসমাজ সেদিন সশস্ত্র সংগ্রামের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। সে যেন এক ঝড়ের সময়। আর তার মধ্যে হয়, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সেই ঝড়ের প্রধান পথিক। বোমার বাজিকর যেন তখন তাঁর ঝড়ের সোপান।

কবি নজরুলের রাজনৈতিক ভাবনা ও প্রতিবাদের বিদ্রোহী সন্ধান মেলে শিয়ারশোল রাজ স্কুলে ছাত্রাবস্থায় শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার মধ্যে। যুগান্তর দলের গোপন বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র সেদিন শিক্ষকতার আড়ালে সশস্ত্র দেশপ্রেমিক ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নিবারণচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোপন নির্বাচন হয় কাজী নজরুল ইসলাম। শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসেই পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। আদালতের রায় অনুযায়ী ১৯১৭ সালের ১৯ মার্চ তিনি পাঁচ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু সত্যসন্ধানী আলোচনায় সেই উত্তালে সময় থেকেই হয় নজরুল নিবারণচন্দ্রের দ্বারাই প্রথম গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নিবারণচন্দ্রের সমিতি বিপ্লবী সেই যুগান্তর দল (চক্রবর্তী) প্রতীক তাঁকে বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আর এদেরই নীচে ছিলেন বিপ্লবী বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়। নিবারণচন্দ্রকে সেদিন শিক্ষকতার পদ থেকে বহিষ্কারের সময় বলা হয়েছিল, 5th master Babu Nibaranchandra Ghatak has been arrested on suspicion on some political crime. Resolved that he be summarily dismissed (Carried unanimously)... It is a matter of deep regret and abhorrence that Babu Nibaranchandra Ghatak against whom a serious charge is now pending should have at all belonged to the teaching staff of the school... (Resolution dt. 20th January 1917 Searsol Raj High School).

বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের অপরাধে একদিন নজরুলের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে এসেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, Kazi nazrul Islam of the same class be given Rs 5 (five) a month from the time it has been discontinued up to the Matriculation Examination 1918. বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, নিবারণচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগেই নজরুলের মাসিক ৫ টাকা হারে তার বৃত্তিটি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আর নিবারণচন্দ্রের কর্মচ্যুতির মাস কয়েকের মধ্যেই ১৯১৭ সালের ২৩শে মে তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা সম্ভবত শ্রেণীর সেরা ছাত্র নজরুলের বিরুদ্ধেও গৃহীত হ'ল। পরবর্তীকালে নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে নিবারণচন্দ্রের অনুসরণেই বিপ্লবী ভূমিকায় 'প্রমত্ত' চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছিল। কয়েকমাস পরে আর্মির ভুক্তি হাতের পর বাইশ নিবারণচন্দ্রের স্কুলের মুক্তির দ্বারে গোপনে বাড়িতে কিছু না জানিয়ে সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়ে নজরুল ঊনপঞ্চাশ (49th Bengali Regiment)-এ চলে যান। অনেকেরই বিশ্বাস, যুদ্ধ শিখে অস্ত্র চালনার শিক্ষা আয়ত্ত, তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। নজরুলের জীবনে প্রাথমিক পর্বে সশস্ত্র বিপ্লব ভাবনা ছিল তাঁর দেশপ্রেমের অন্যতম একটি পর্ব। তারই পরবর্তী ধাপে তাকে সৈন্যবাহিনী থেকে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে নজরুলের 49th Bengali Regiment ভেঙে দেবার পর কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর থেকে।

প্রথমে 'নবযুগ' ও 'সেবক' পত্রিকায় সাময়িক নজরুলের রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ ও প্রসারে নজরুলের অসামান্য প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারপরই সম্পূর্ণ একক সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল নজরুলের 'ধূমকেতু' পত্রিকা। অর্ধসাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত ধূমকেতু প্রকাশকাল (১৯২২) কবির বয়স মাত্র তেইশ। বলতে গেলে নজরুলের সবচেয়ে রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন এই পত্রিকায় স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়ে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই পত্রিকার (১৩শ সংখ্যা/১৩ই অক্টোবর ১৯২২) সম্পাদকীয় অংশে 'ধূমকেতু'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে নজরুলই প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে দিয়েছিলেন :

'স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেন না, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার,

সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছেন, তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তাঁরা শুনবে না। তাঁদের এতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকে দূর করতে হবে।

সেই সময় একজন কবির মুখে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি এইভাবে সর্বপ্রথম নজরুলের মাধ্যমেই উচ্চারিত হয়েছিল। সেকালে এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তার কারণ, সেপ্টেম্বর মাসে (২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২২) প্রকাশিত হয়েছিল নজরুলের কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে'। কংগ্রেসের কাছে যা প্রত্যাশা করেনি। ফলে তিন সপ্তাহ পরেই যখন তাঁরা 'ধূমকেতু' পত্রিকায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলা হল তখন শঙ্কিত ইংরেজ প্রমাদ গুনলেন। ফলস্বরূপ সম্পাদকীয়তে পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক দেওয়ার এবং 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশের কারণে ইংরেজ সরকারের পুলিশ 'ধূমকেতু' পত্রিকার অফিসে হানা দিয়ে ঐ পত্রিকার অবশিষ্ট কপি তুলে নিয়ে যায়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এর ধারা অনুসারে ৮ই নভেম্বর ১৯২২ নজরুল ও পত্রিকার মুদ্রাকর-প্রকাশক আফজাল উল্ হকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোল। কেবল একজন এর আগে উচিত প্রচার সরকারী পত্র-পত্রিকায় তেমন একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি। অবশ্য এর আগেই নজরুলের প্রবন্ধের বই 'যুগবাণী' ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সরকার ফৌজদারী বিধির ৯৯-এ ধারানুসারে সেদিন বইটি বাজেয়াপ্ত করে। সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তির তারিখ ছিল ১৬৬১/পি ২৩শে নভেম্বর ১৯২২। 'যুগবাণী' বাজেয়াপ্ত করার কারণ হিসেবে দেখানো হয়, It breathes racial hatred directed mainly against the British, preaches revolt against the existing administration in the country and abuse in the very strong language the 'Slaveminded' Indians who upholds the administration. The three articles are 'Memorial to Dyer', 'Who was responsible for the Muslims Massacre?' and 'Shooting the blackman' are specially objectionable.

মজার ব্যাপার হল, ১৯২২ সালের বাজেয়াপ্ত বইটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও তা প্রত্যাহৃত হতে কেটে যায় আরও কুড়ি বছর এবং পুনরায় ছাপা হয় ২৭ বছর পরে ১৯৪৯ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর। পাশাপাশি 'ধূমকেতু' পত্রিকা, তা ছিল 'হপ্তায় দু'বার দেখা' দেবার কথা, তা বাজেয়াপ্ত করার পেছনে ছিল সমকালীন কিছু মৌলবাদী শক্তি। সেসময়ের 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকা 'ধূমকেতু'কে 'শয়তানের আস্তানা' বলে আখ্যায়িত করে এবং নজরুলকে 'উদ্ধত সেচ্ছাচারী নাস্তিক' আখ্যা দেয়। তাদের মতে, ধূমকেতু হল 'নবনীতি বিবর্জিত'। এবং এদের বিবেচনায়, দুই ধূমকেতু ও উহার যুক্তিহীন নাস্তিক এখন কেবল কিছু গুজবের উপরে নির্ভর করিয়া না থাকিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী শরা-শরিয়তের উপরও নির্ভীক সবলে আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাই, সর্বত্র মুসলমান সমাজে ভীষণ ও ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে।'

নজরুলের রাজনৈতিক ভাবনার বিরোধী ছিল মূলত এইসব পত্র-পত্রিকা। 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় নজরুলকে খোলা চিঠি (১৯২২) আক্রমণ করতে গিয়ে লেখা হয়েছিল এইরূপ ভাষায়: এদের ইসলাম ধর্মের কাছে কি, সেজন্যই নজরুল স্বয়ংই পূর্ণভাবে। একটা ধর্মজ্ঞানশূন্য যুবা কবিকে কিভাবে—কাফের, মূর্খ শয়তানের শিষ্য ছাড়া কি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।' এই প্রবন্ধের লেখক ছিলেন মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ।

অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, ইংরেজ সরকার নজরুলকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার পরও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তাই জেল থেকে মুক্তি পাবার পরও নজরুলের রচনা দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশি' ও 'ভাঙার গান' ১৯২৪ সালে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। এর পরেও ১৯৩০ সালে কবির 'প্রলয় শিখা' ও ১৯৩১ সালে নজরুলের 'চন্দ্রবিন্দু' কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হল। লক্ষণীয়, তৎকালীন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের আরও সুপারিশ ছিল যাতে নজরুলের 'অগ্নিবীণা' (১৯২২), 'সঞ্চিতা' (১৯২৮), 'ফণিমনসা' (১৯২৭), 'সর্বহারা' (১৯২৬) ও 'রুদ্রমঙ্গল' (১৯২৬) গ্রন্থগুলির প্রকাশের সাথে সাথেই বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নজরুলের বাজেয়াপ্ত অনুরূপ গ্রন্থের সংখ্যা ছিল পাঁচ। আর কোনো বাঙালী লেখকের আর পাঁচ একসাথে গ্রন্থ নিষিদ্ধ বলে কোনো সরকারই ঘোষণা করেনি। আর নজরুলের গ্রন্থগুলি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করার মূলে ছিলেন এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক সরকারী পদাধিকারী অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত। তিনি ছিলেন ইংরেজ অনুগত রাজ-কর্মচারী, তিনি ব্রিটিশের মন জয় করবার জন্যে এ ব্যাপারে অত্যধিক বা দুষ্টবুদ্ধিতে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

আসলে, সমস্ত বাধাবাধি প্রয়োগের পিছনে রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া কাজ করেছিল বলে সহজেই অনুমান করা যায়। ১৯২১ সালে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গোপনে গঠন করবার পরিকল্পনার কথা কি তখন ইংরেজ শাসকদের কাছে অজানা ছিল? মনে হয় না। কেননা, মুজফ্ফর আহমেদের অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে অনুজ নজরুল ইসলামও সেই পরিকল্পনা রূপদানের কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়েছিলেন। আর সেকালে মুজফ্ফর বা অন্যান্যদের তুলনায় নজরুলই ছিলেন অধিক পরিচিত এবং সৈনিকবৃত্তি থেকে ফিরে আসা অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি।

সেকালের অন্যান্য সতীর্থদের মত নজরুলও গোড়ায় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেছিলেন। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং নজরুল কেউই এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তখনো যে সমগ্র জাতির মুক্তি আন্দোলন ও কংগ্রেস ছিল সমধর্মী রাজনৈতিক চেতনার অন্যতম উৎস। কিন্তু নজরুল ও শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের সংগঠনের কাজেও নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। তবে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ সেদিন শরৎচন্দ্র বিনা করেননি। যেমনি কারাগার থেকে মুক্তিলাভের (১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৩) চার মাসের পরে (২৫শে এপ্রিল ১৯২৪) আশালতার সঙ্গে বিয়ের পর নজরুল আরও ঘনিষ্ঠভাবে রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। বিয়ের কিছুদিন পর সর্বভারতীয় কবি ও কংগ্রেস কর্মী বাগান মোহেরে আমন্ত্রণে এসে ওঠেন। পরে গিয়ে ওঠেন অনুরাগী বন্ধু হাফিজুর নামে লোকের বাড়িতে। কংগ্রেস কর্মীরাই তখন তাঁর সর্বক্ষণের সাথী। এখানে

পশ্চিমের সময় তাঁর প্রথম সন্তান কামাল আতাউর রহমান বুলবুল জন্ম ও অকালমৃত্যু ঘটে। রাজনৈতিক তৎপরতার তখনও বিরাম ছিল না। রাজনৈতিক বন্দীদের পরিপ্রেক্ষিতেই নজরুলের হুগলী অবস্থানকালে প্রকাশিত 'বিষের বাঁশি' ও 'ভাঙার গান' নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কারাগারে অনশনকালে যে বই লেখা হয়েছিল ('বিদ্রোহী প্রেম') তার ২০০ টাকার বেশি মুনাফা বোমায়েকদের স্বাস্থ্য সাহায্য চিঠি করতে দান হয় কিছি। হুগলীতে সেবারই মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন। নজরুলের সাথে প্রথম গান্ধীজীর সাক্ষাৎ ও পরিচয় হল। নজরুল তাঁর লেখা গান হিসেবে কবিতা 'চরকার গান' গান্ধীজীকে গেয়ে শোনালেন। পরের বছর (১৯২৫) যে মাসে ফরিদপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে গিয়ে কবি যোগ দেন। সেই অধিবেশনে নজরুলের অন্যান্য দেশের বন্ধুরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী অন্যতম হাবিব। নজরুল হুগলীর প্রার্থনা সভায় গান্ধীজীকে প্রথম যে গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন ফরিদপুর অধিবেশনে এসেও গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী কবি সেই 'চরকার গান'টি গান্ধীজীকে গেয়ে শোনান। গান্ধীজীর হুগলী সফরকালে অর্থাৎ ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদানের আগে হুগলীতে আগমনের সময় তাঁকে নিয়ে নজরুল 'বাংলার মহাত্মা' নামের আর একটি কবিতা রচনা করেছিলেন।

হুগলীতে থাকাকালে তাঁর চারপাশে ছিলেন ভূপতি মজুমদার, সুশান্ত রায়, মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নিবারণ ঘটক, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্রেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কংগ্রেস কর্মী ও অনুরাগী বৃন্দ। হুগলীতে থাকার সময়েই তিনি বাঁকুড়া সফর করেন। কবির বয়স তখন মাত্র ২৬। সেখানে বাঁকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব সভাপতিত্বে জাতীয় বিদ্যালয়ের সামনে কবিকে সংবর্ধনা প্রদান করে বরণ করেন। সাবিত্রী তখন বৈদিক সংঘের অধিনায়ক হিসেবে কবিকে যুক্তি দিল কবির নিষিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশী', আর তুলনা করলেন যাতে ছিল কবির আর একটি নিষিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'ভাঙার গান'। সেবার কবি বহু উদ্বোধন করেন গঙ্গাজল জাতীয় বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের নামকরণ হয় শহীদ অমরের নামে 'অমরভবন'। তখন প্রথম নামে নজরুলের এই লেখা কবিতা এটি 'গান বিজলী' পত্রিকায় যে সময় প্রকাশিত হয়। যে সময়টি কবি বিপ্লবদালীদের আক্রমণের কথা মনে রেখে হুগলীতে বসে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'আমার কৈফিয়ত'। অন্যদিকে তাঁর যোগদান রাজনৈতিক বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কুতুবউদ্দিন আহ্‌মদের উদ্যোগে শুরু হয় তাঁর সাপ্তাহিক 'লাঙল' ভাবনা জড়িত কবিতা সংকলন 'সর্বহারা' (অক্টোবর ১৯২৬)। তখন নজরুল বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমিতি ও আন্দোলনে নিয়মিত যোগদান করে চলেছেন। কিন্তু ১৯২৫ সালের শেষ থেকে নজরুল তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা কেবলমাত্র গান বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আর সীমাবদ্ধ না রেখে মজদুরদের কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে সাম্যবাদের কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের একাংশও এ কাজে নজরুলকে সাহায্য দেন। সহযোগী মধ্যে ছিলেন বন্ধু হেমন্ত সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, কুতুবউদ্দিন আহ্‌মদ, শামসুদ্দিন আহ্‌মদ প্রমুখ সহযোগীবৃন্দ। অবশেষে ১৯২৫ সালের শেষ দিকে এঁরাই গঠন করলেন ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অন্তর্ভুক্ত 'মজুর স্বরাজ পার্টি' (The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress)। পার্টি গঠনের পর মুখপত্র হিসেবে 'লাঙল' প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত

হল। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কবির দৈনিকের সঙ্গী শ্রীমুজফ্‌ফর মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় নাম থাকলেও আসলে প্রধান পরিচালক হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামই এর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে নজরুলের রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার মেরুকরণ প্রকট দেখা যায়। প্রথম সংখ্যাতেই ছাপা হল তাঁর 'সাম্যবাদী'র কবিতাবলি, যা পত্রিকার ভাবনা ও চিন্তার সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সেই দলগঠিত মজুর স্বরাজ পার্টির উদ্দেশ্য ও গঠন প্রণালীর অন্যতম বিষয় ছিল :

(১) নারী পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা সুরক্ষা করবার মতোই এই দলের উদ্দেশ্য।

(২) বিভিন্ন দল-আন্দোলনে সম্ভাব্য শক্তি প্রয়োগ।

(৩) দেশের শতকরা অধিকার আদায়ে সেই শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের ক্ষমতায় অধিকার লাভে সাহায্য করা যাহাতে তাহারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া নিজেরা সংঘবদ্ধ এবং নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাশালী স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠিতে সক্ষম হইতে পারে।

এ থেকেই বোঝা যায় এই সময় নজরুলের চেতনায় তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শোষিত শ্রেণির অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন করা। বোঝা যায়, তখন সাম্যের ভাবটি ছিল নজরুলের ভাবনায় তাঁর নিজের হৃদয়ে। এই দল গঠনের সময় প্রধান হিসেবে বন্ধুটি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ইতিমধ্যে নজরুলের সঙ্গী হিসেবে সংস্থার কাজে আলমোড়া থেকে ফিরে সেখানে প্রকাশনার কাজে এসেছিলেন।

১৯২৬ সালের ৩রা জানুয়ারি নজরুল হুগলি ত্যাগ করে সপরিবারে হুগলী থেকে কৃষ্ণনগরে চলে আসেন। বন্ধু হেমন্ত সরকারের পরামর্শে তখন হেমন্ত সরকারের গোলাপপট্টি বাসভবনে, পরে মুসলিম ও খ্রীষ্টান অধ্যুষিত কৃষ্ণনগরের গ্রেস কটেজ এলাকায় কবি বসবাস করতে থাকেন। এখানে আসার পর নজরুলের রাজনৈতিক তৎপরতা আরও বেড়ে যেতে থাকে। মাস দুই পরেই তিনি ফরিদপুরে গিয়ে মাদারীপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগ দেন (১১-১২ই মার্চ ১৯২৬)। সম্মেলনের জন্য কৃষ্ণনগর থেকে লিখে নিয়ে যান 'ধীবরদের গান'। ক্ষেত্রেরই সম্মেলনে সেটিই ছিল সেখানে উদ্বোধনী সঙ্গীত, যা কবি স্বয়ং সেদিন পরিবেশন করেছিলেন। অথচ নজরুল তখন খুবই অসুস্থ।

দু'মাস পরেই কৃষ্ণনগরে যে বারে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। কৃষ্ণনগর কলেজস্ট্রিটে (২২শে মে) কংগ্রেসের সেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। নজরুল সংগীতের অনেকগুলি গান-কবিতা রচনা করেছিলেন। সেই প্রাদেশিক সম্মেলনেই সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের প্রভাবে উঠে আসে প্রস্তাবিত বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পর্কিত হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট। এতে মুসলিমদের কিছু কিছু রাজনৈতিক সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে চিত্তরঞ্জনের প্রয়াণের সুযোগ নিয়ে সম্মেলনে প্রস্তাবিত সেই বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল হয়ে গেল। ১৯২৬ সালে ২রা এপ্রিল থেকে, কৃষ্ণনগর সম্মেলনের মাত্র ৫০ দিন আগে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রকাশ্যে বহির্বিশ্বকে জেনে

কথা-কাহিনীকার নজরুল

অনিমা ভট্টাচার্য

"মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী
আর হাতে রণতূর্য—"

রণতূর্য আর বাঁশি, মধুর এবং গম্ভীর, শঙ্খনির্ঘোষ এবং কোমল বংশীধ্বনি, প্রকৃতিপ্রেম আর মানবপ্রেম—এরই নাম বিদ্রোহী কাজী নজরুল। বাংলার রোমান্টিক কবি-গায়ক-গীতিকার নজরুল প্রকৃত অর্থেই তাঁর সময়ের স্রষ্টা, তাঁর জীবনের প্রতিফলক। এই আবেগই তাঁর লেখাকে উত্তেজনার উত্তাপে সৃষ্টি করে, এই আবেগই দুঃখ কষ্টে দুঃখক্লেশে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই আবেগের গভীরতাতেই ব্রিটিশ শাসনকালে দ্বিতীয় অসহযোগের সময়ে তাঁর [illegible]। এই আবেগের প্রাচুর্যেই শোষিত মানুষ বঞ্চনা বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীতে, তাঁর কণ্ঠে উচ্চারণ করে, সামাজিক প্রথা-বন্ধনকে ভেঙে চুরমার করবার পথ দেখায়। 'অগ্নিবীণার সুরে কম্পিত' [illegible] সৃষ্টি করে। তাঁর ভাষার যতি [illegible] আবেগের প্রাচুর্যেই নিজের জীবনও 'বে-পরোয়া', ছন্নছাড়া, উদ্দাম হয়। সংসার, [illegible] সুন্দর বন্ধনে বাঁধা পড়বার মত বন্ধনই তাঁর মনো ছিল না। এই [illegible] মন, সাহেবের বাবুর্চিখানা, পল্টন, কবিগানের আসর, [illegible] বন্ধনেই ছুটে যান না, 'খেয়ালী কবি' আখ্যা [illegible] সেটা [illegible]—এই সময় [illegible] নজরুল [illegible]। দুঃখের থেকে [illegible] বিদ্রোহী রূপে সাহিত্যের অঙ্গনে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হলেন, সাম্যবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক-কৃষক-হিন্দু-মুসলমান-নারীর জন্য কলম [illegible] সাম্যবাদী [illegible] জীবন-পুরাণ [illegible] এবং [illegible] জন্য [illegible] জীবনপথের [illegible]—সঙ্গীতের জগতে [illegible] এবং [illegible] তাঁকে [illegible] সেই আবেগেই [illegible] দিয়ে গেল সম্পূর্ণ [illegible]। এক [illegible] জীবন।

নজরুল যখন বাংলা সঙ্গীত-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন —তখন রবীন্দ্র [illegible] সমস্ত জাতির [illegible] সংস্কৃতি জগতে [illegible] মত দাঁড়িয়ে আছেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব। কাব্যে, গদ্যে, উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে চিত্রায়—সেই প্রতিভার দীপ্তি। কিন্তু তারই মধ্যে দু'একজন নিজস্ব স্বকীয়তায় দীপ্তিমান হয়েছিলেন। নজরুল সেই দু'একজনের মধ্যে একজন। তিনি কবিতা [illegible] একেবারে নিজস্ব ভঙ্গিতে, সঙ্গীত রচনা করলেন আপন ভঙ্গিতে সুর দিলেন, গাইলেন তাঁরই সঙ্গে—তিনি যদি বাংলা সাহিত্যে [illegible] দুর্ভিক্ষ [illegible]। নজরুল যখন [illegible]—তখন [illegible] বিদ্রোহী [illegible], [illegible] প্রভৃতি [illegible] বাড়ি [illegible] [illegible], প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ার বিপ্লব, [illegible] এবং রাজনৈতিক জগতে এক মহা দুর্যোগ—এক [illegible]। তখন [illegible] কোন [illegible] পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব ছিল না।

নজরুলের তো নয়ই।

এইরকম সময়েই তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এলেন নজরুল। ব্রিটিশের শাসন [illegible] করবার জন্য [illegible] শক্তি [illegible]। অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে [illegible] সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে [illegible]। তাই বক্তৃতা নয়—কবিতা এবং গানই হল তাঁর [illegible] জাগাবার [illegible]। একমাত্র [illegible] [illegible] দিয়ে, [illegible] আগুন জ্বালিয়ে, [illegible] গাইলেন—

আমার ঐ [illegible] দেখ [illegible]
কিংবা—[illegible]
[illegible]

[illegible]—তিনি [illegible] [illegible]—[illegible] হিন্দু-মুসলমানের। এক হাতে বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণতূর্য।

এই নজরুলকে আমরা মর্মে মর্মে জানি—কিন্তু আর এক নজরুলকে আমরা খুব বেশি জানি না বা জানবার সুযোগ ঘটে নি—তিনি হলেন [illegible] ও উপন্যাসের লেখক নজরুল। [illegible] নাটকেরও লেখক। যদিও এ সব সৃষ্টিকর্ম তাঁর 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'বিদ্রোহী', 'আমার কৈফিয়ৎ' ইত্যাদি [illegible] সমতুল্য হতে পারেনি। তবুও এই গদ্য সাহিত্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে নজরুলের বিদ্রোহী চিত্ত, বিদ্রোহী সত্তা প্রতিটি [illegible] স্ফুট। তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি নিয়ে বাঙালি কখনও সরব হয়নি, আলোচনাও করেনি, [illegible] উপেক্ষিতই বটে। তাই আমরা এই প্রবন্ধে তাঁর সেই অনালোচিত দিকটিকে কিছুটা উন্মোচিত করতে চাই পাঠকের কাছে।

তাঁর উপন্যাস সৃষ্টির মধ্যে তিনখানা—'বাঁধন হারা', 'মৃত্যুক্ষুধা', 'কুহেলিকা'। গল্পগ্রন্থগুলি যথাক্রমে—'ব্যথার দান'—ছটি গল্পের সমষ্টি। 'রিক্তের বেদন'—আটটি গল্পের সমষ্টি, 'শিউলি মালা'—চারটি গল্পের সমষ্টি। [illegible] উপন্যাসে তো বটেই, গল্পগুলিতে দৈনিক জীবনের [illegible] যেতে পারে।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'বাঁধন হারা' বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রকাশিত পত্রোপন্যাস। এর পত্রসংখ্যা ১৮। করাচির সেনানিবাসে এর সূচনা ২০শে জানুয়ারি ১৯২০ (সম্ভবত) আর সমাপ্তি—কোলায় ২৩শে চৈত্র। এই উপন্যাসটি 'মোসলেম ভারতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। প্রথম পত্রের উক্তি—'ভাই রবু' অর্থাৎ রবিউল, পত্রলেখক, 'তোমার [illegible] নতুন কথা'। এই উপন্যাসের পত্রগুলি কখনও করাচি, কখনও সালার, আবার কখনও বাঁকুড়া, কখনও শাহপুর—এইরকমই নানা জায়গায় লেখা। কখনও [illegible], কখনও পুরুষ, কখনও নারী, কখনও '[illegible]' এইরকম আরেকটি [illegible] নানা মানুষের মানসিক অভিব্যক্তিগুলি প্রকাশ পেয়েছে। পত্র সাহিত্যের চরিত্র [illegible] পত্রকারের ব্যক্তিত্বগুলি উদ্ঘাটিত

কান্না—শেক্সপীয়রের কথায় 'unlocks the heart' এক একটি চরিত্র তাকে তাকে চলৎচিত্রে মেলাতে থাকে। এই উপন্যাসে যাদের পাওয়া যাচ্ছে—তারা হচ্ছেন কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরুল হুদা, সোফিয়া, রাবেয়া, মনুয়ার, আয়েশা, মাহ্‌লিকা। নুরুকে কেন্দ্র করেই প্রতিটি চরিত্রের পরিস্ফুটন। নুরু যুদ্ধে গেছে। "সেকালে শত শত ভারতীয় যুবক দেশত্যাগ করে তুরস্ক ও মধ্য এশিয়ার দিকে যাত্রা করেছিলেন। এঁদের দেশত্যাগকে 'মোহাজির' আন্দোলন বলা হতো। এঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা কলুষিত পরাধীন দেশে বাস করার পরিবর্তে দেশান্তরী হওয়া পুণ্য কাজ বলে মনে করতেন। এঁদের একাংশ মধ্য এশিয়ার লালফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের শৌর্য বীর্যের খবর নজরুলকে অনুপ্রাণিত করেছিল। 'মোহাজির'দের অভিজ্ঞতা নিয়েই 'বাঁধনহারা' রচিত। এই গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি পত্রেই বিশেষ করে নুরুর পত্রগুলিতে যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্র এবং নুরুর যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার প্রতিক্রিয়া বারবার ব্যক্ত হয়েছে। কদাচিৎ যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ে রচিত পত্রটি অনবদ্য সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ ভাববিন্যাস সমৃদ্ধ। নুরুর ভাবী রাবেয়া তাঁকে লিখেছেন : 'খোদা তোর বিজয়ী বীরের বেশে ফিরিয়ে আনুন—যে মহাপ্রাণ, অসহ উৎসাহ আর অসীম সাহসিকতা নিয়ে তরুণ যুব তোমরা সবুজ বুকের তাজা খুন দিয়ে বীরের মত স্বদেশের মানসম্মান রক্ষা করতে দুর্দিন দূর করতে ছুটে গিয়েছ...এ অন্য আকাঙ্ক্ষার প্রাণটি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছ, এ গৌরব রাখার ঠাঁই যে আমাদের ছোট বুকে পাচ্ছিনে ভাই।" সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে যেভাবে দিকে দিকে ভিতরের প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীকে সাহায্য করতে থাকে বিপ্লবকে পরাস্ত করার জন্য। অন্যান্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশের সঙ্গে এদেশ ভারতীয়ও মধ্য এশিয়ার লালফৌজের নেতৃত্বে সংগ্রাম করেছিল এর বিরুদ্ধে। নজরুল এই লালফৌজের অভিলাষক হয়েছিলেন—'বাঁধনহারা' গ্রন্থে নুরুল এই লালফৌজে যোগ দেওয়া যুবক। মুজফ্‌ফর বলেছেন—'জগতের সবচেয়ে পুণ্য কাজ লালফৌজে যোগ দেওয়া' কিন্তু 'বাঁধন হারা' যেহেতু জীবনী নয়—উপন্যাস—তাই কাহিনীতে মাহবুবার প্রেম আখ্যান আছে। নুরুকে তার প্রেম বেঁধে রাখেনি অনেক ক্রোধের জন্যে মাহবুবা মা বাবার স্থির করা চল্লিশোর্ধ্ব অগাধ সম্পত্তির অধিকারী এক জমিদারের ঘরণী হয়ে গেল প্রেমের সমাধি রচনা করলো। 'আমার স্বামী আমার বাপকে জেনেছিলেন রূপার দরে খাঁটি করতে... এই তো আমাদের বাংলার—অন্তত শরিফ মুসলমান মেয়েদের—চিরকেলে একঘেয়ে কাহিনী।' এই মর্মন্তুদ বেদনায় জীবনের কথা লিখেছে মাহবুবা সাহসিকাকে। এই কাহিনীটি সোনা দিয়ে পাঁড় বাঁধার মোক্ষম বলে বলে। নুরুল হুদা তাঁর শেষ পত্রে ইঙ্গিতেই এই প্রেমের করুণ পরিণতির কথা বলছে—'যে মেহবুবা একদিন তোমার অন্যকে পাওয়ার লোভ দু'হাতে ঠেলে দিয়েছিল—আমার নষ্ট জীবন পাছে বিবাহের জন্য নিষ্ফল হয়ে যায়। তাই অন্যকে নিজে হাতে মরণের মুখে পাঠিয়ে দিলে।" মাহবুবা এই

অভিশপ্ত পৃথিবী সন্তানহীনা—[illegible] মতো রাত্রিবেলা ঘাড় থেকে [illegible] [illegible]। কিন্তু তার জন্য 'অন্তরের কাপড়ে ঢুকে বসে পড়ি। মন আমার [illegible] উপকূলে [illegible] মাথা খুঁড়ে মরতে চায়।' কাব্য সেখানে যে তাঁর প্রার্থিত নূতন রূপ। শরৎচন্দ্র যেমন বলেছিলেন—'উনি ২৫ বছরেই উঠলে না বুড়ো ঠেকিয়ে দেখ।' নূতন জীবনে [illegible]। 'ঐ যে মানুষগুলির জন্যে তুমি [illegible] হাতে সঁপে দিলে নিজে, তা সেই না কি [illegible]। একটু ভাবলে না যে তাতে কারো একজন কেন [illegible] হয়ে গেল। পরিবারে [illegible] গল্প দিয়ে [illegible]। [illegible] উপরেই দুজন পিতৃহীন, কিন্তু [illegible] একটি [illegible] মুক্ত করা হয়েছে।

[illegible] দুই শহর পিয়েছে—দুজ ছেড়ে গেছে। [illegible] কি বিপুল [illegible] দুঃখ শেষ হয়ে গেলেও দেশে ফিরবে না বলে [illegible] নতুন করে বুক বাঁধ লিখিয়েছে—'আমি আর ফিরব না। আমার [illegible] একটা [illegible] হয়ে গেল—[illegible]।' এই অভিমানের [illegible] নিয়েই 'তীরে ঘর' [illegible] হয়েছে। একজন কন্যা নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে প্রাণ [illegible]। [illegible] তাঁর [illegible] জীবন তাঁর অভিমান, তাঁর [illegible] সব [illegible] হয়েছে।

এই উপন্যাসে [illegible] অর্থ [illegible]—[illegible] মনোভাব, নারীর প্রতি [illegible], [illegible] নিয়ে [illegible]—সে [illegible]—[illegible] নারীর [illegible]। [illegible] কিন্তু একটি মেয়ে [illegible] এসে তাঁর সামাজিক জীবন [illegible] তিনি [illegible]। [illegible] তাঁর এই [illegible]—[illegible] কিন্তু তাও [illegible]। [illegible] নারীর মুক্তির কথা [illegible] যেতে পারে। 'উপন্যাস [illegible]' পত্রিকা এই উপন্যাসটি সম্পর্কে [illegible]—'[illegible] একটি জীবন নাটকের tragedy—'। [illegible] যে একজন [illegible] হতে পারতেন [illegible]—শুধু তাঁর [illegible] জীবনের [illegible] তা হতে দেয়নি। [illegible], [illegible] যেন [illegible]। [illegible] উপন্যাসটি, [illegible]—[illegible] নতুন। বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার উপন্যাস সৃষ্টির পথ [illegible]।

তাঁর 'সুরা [illegible]' উপন্যাসটিতে [illegible] এসে পড়েছে। [illegible] ১৩৩৬ সালের [illegible]। উপন্যাসটি [illegible] ১৯২৯-৩০ সাল। কবি সেই সময়ে [illegible]—তাঁর [illegible] এ কথা [illegible] আছে। এই সময়েই তাঁর [illegible] [illegible] হয়। [illegible] তাঁকে [illegible]—[illegible] তাঁর [illegible] হয়ে এসেছিল। এই উপন্যাসটি যেন সেই [illegible] এক [illegible] কাহিনী। [illegible] 'শুধু হবে [illegible]'। এই উপন্যাসটিতে [illegible] ও

মুসলিম সম্প্রদায়ের [illegible] ঐকান্তিক [illegible]। [illegible] এই দুই সম্প্রদায়ের [illegible] মনে তাঁর [illegible] হয়েছিল—এই দুই সম্প্রদায়েরই [illegible] এই উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। [illegible] এই উপন্যাসে এসেছে। [illegible] হারিয়েছে না। [illegible] খেতে [illegible], [illegible] এবং [illegible] বস্তির। উপন্যাসের [illegible] বৌ [illegible] এবং উপন্যাসের [illegible] বস্তি। [illegible] কাহিনী 'সুরা [illegible]' [illegible] (আমেন [illegible]) [illegible]। [illegible] সামনে [illegible] একটি টিউবওয়েল ছিল। এই টিউবওয়েল থেকে জল নিতেন [illegible] খ্রীষ্টান ও মুসলমান মেয়েরা। এই জল [illegible] দুই দলের মেয়েদের মধ্যে [illegible] ঝগড়া [illegible]। দুই দলের [illegible] থাকতো সঙ্গে সঙ্গে। [illegible] খ্রীষ্টান দলের [illegible], মুসলিম মেয়েদের [illegible] ছিল [illegible] না [illegible] 'মেজ বৌ' [illegible]।

এই [illegible] চিত্র [illegible] দুটি [illegible] [illegible] শিকার [illegible]। [illegible], [illegible] [illegible] সম্পর্ক, [illegible] চেতনা, [illegible], [illegible] আদর্শ, [illegible] কবি [illegible] মধ্য দিয়েই উপলব্ধি [illegible]। এই প্রসঙ্গে [illegible] 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের [illegible] স্মরণ করিয়ে দেয়। খ্রীষ্টান মেয়ে মুসলমান মেয়ের [illegible] [illegible] 'মুসলমান [illegible]' বেঁধে গেল। তারপর [illegible], [illegible], [illegible] 'আ-[illegible]' হয়ে [illegible] মাটিতে ফেলে দিয়ে ঝগড়া করায়। লেখকের [illegible] এতে প্রকাশ পায়—[illegible] তিনি [illegible]—'এ [illegible] যদি এমন এই [illegible] না হয়ে উঠত, তাহলে [illegible] হয়ে [illegible]। [illegible] দুঃখ [illegible] দিয়ে।' এই [illegible] দুই সম্প্রদায়ের [illegible] 'খ্রীষ্ট', 'মুসলিম', 'সুর' [illegible] [illegible] তিন শ্রেণী [illegible] গেছে, [illegible] নিয়ে বিপুল [illegible] উপায় [illegible] বিরল [illegible] [illegible] না। তাই [illegible] শীতকালে [illegible] [illegible]—[illegible] ঘরে [illegible] দিয়েছে [illegible] [illegible]। [illegible] নেই, [illegible] নেই, শিক্ষা তো নেই-ই, [illegible] পৌঁছেনি। এই [illegible] খ্রীষ্টান-মুসলমানের [illegible]। এখানে তাই ধর্ম হিসাবে [illegible] অনেক [illegible]। [illegible], [illegible], [illegible] ধর্ম [illegible]। [illegible] বৌ খ্রীষ্টান হয়ে যায়। এই [illegible] হয়ে উঠলো। এইভাবেই তিন [illegible] জীবন [illegible]। এই [illegible] বিদ্বেষী [illegible] আবির্ভাব। [illegible] শিকার যেন দুর্বিষহ, [illegible]। [illegible] [illegible] এইরকম—'[illegible]' [illegible] টুপি, [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible]। [illegible] হিন্দু-মুসলমানের [illegible] একটা [illegible] বিপুল।' [illegible] যেন [illegible] না-ভাই [illegible] এই [illegible]। [illegible] [illegible] সঙ্গে

দুই—ময়মনসিংহ, সিলেট, ত্রিপুরা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম—'চট্টগ্রাম রোমান্টিক পত্রে তাও লিখিয়েছেন। 'চিঠি দিও পত্রের খুশবো পাবার' কিন্তু 'জেল থেকে ফিরে এসে অবধি আমার রাজনৈতিক মন থমকে গেছে। এখন মনে হচ্ছে "সুতোয় অকাজ হয়, দেশ স্বাধীন হয় না।" কহিয়া আবার বন "চরকা ঘরে ঘরে বারো মাস ঘুরে গাঁটা পড়ে গেছে, দেশে কিন্তু দুর্দিন নেমেছে প্রতিবাদী হলে।" পার্টিতন্ত্রে অবিশ্বাস থেকে উঠেছিল আক্ষেপের মে মনে করে "আর সব দেশ বাধা ভেঙে স্বাধীন হতে পারছে না, আর এ দেশ কি সুতো কেটে স্বাধীন হবে? দেশের বাপচাচেরা যেভাবে যোগাড়ে এতোদিনে পাথের কাছে এসে ঠেকেছে"—রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণটি মনে পড়ে 'বাক্য গড়ে বড় নতশির'। নজরুল তাঁর জীবনের একটা পর্বে প্রতিক মজুর শক্তি পড়েছিলেন, তাইই হল অন্যান্যের প্রতিক্রিয়ার পড়ার কারণ কথায় তাতে, 'এখানে একটি শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ে তুলতে এসেছি। উত্তেজক জেলার আসানসোল শ্রমিক সংগঠনে একটি অংশ গড়ে পারবে। আমাদের সেই শতাব্দী ধরে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়...

কহিয়া যখন বলে 'তুলোয় আর তোমার রাজনীতি—'

অনন্যার জবাব দেয়—'তুলোয় চরকাকে দিয়েছি। রাজনীতিটা দিয়ে পারবো না কোনদিন।' বিপ্লবী রাজনীতিতে আত্মদানের তাড়না। এই রাজনৈতিক শিক্ষাটেই অনন্যার যেন নৌকোর ট্রাইন কর্মীবন্দরের সম্পাদকে প্রাণের মানুষের থেকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখে। তাও এর যে শীত মেয়ো মৌলবিদের ধর্ম ব্যবসায় মুখোশ—ধর্মব্যবসায়ীর শাস্তির জন্য যেটা ইন সড়ক সংগঠনে ব্যবস্থা করেছে শক্তি দুর্দশার। শীতকালে যাকে তার সকল বস্তি বাগান বিক্রি করে পঁচাশো টাকা ক্রমশঃ উপহার না দিলে সমাজে 'পতিত' হবে। সে বলে "সেজ বৌ হলেও উচিত লাভ হলো শীত বার করলো সাহেবদের। আর মজার কথা পীরজাদা মা—মোল্লা পাঁজাওয়ালা রায় করুণা মো এবনিই পুড়েছে, সৌভাগ্য বাকি ছিল—ক্রোধে তা শেষ করে গেলেন। খাজনা কটী ও ধর নজম"—বেশী বয়সের পূজারীরা মানুষকে কেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, চৈতিক দিক থেকেও প্রতারিত করে এইসব সামাজিক শোষকশ্রেণী। বলিষ্ঠ তার্কিক পিতা বাদিতে মানুষকে ধর্মান্ধ করে তুলে লোকজনের সাধারণতা নষ্ট করে পুরোহিততন্ত্র। এই কথা প্রতিধ্বনিত তাঁর কবিতার চরণে—মানুষ পূজা তোমা—

হায়রে ভজনালয়
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।
মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি।
ও মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে।
যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল

নজরুল দূর থেকে ফিরে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সাথে এক ঘরে থেকে, একসঙ্গে কাজ করে শ্রমিকশ্রেণী কৃষকের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হলেন। তাই তাঁর সৃষ্টি আসলোর লোকের শক্তির সাড়াজাগানো, কোরান ... কেতাবেন, রাজর্ষিকে, কুলি মজুর, মেথর প্রভৃতিদের নিয়ে অসংখ্য কবিতা তুলেছে। 'সাম্যবাদী' বললে মনে হয়ে যে, পাশ্চাত্যের সাম্যবাদিকদের অনুপ্রাণ এসেছে শোক কোপায়ে সে তার কবিতাকে রূপ আন্দোলন মধ্যে বাঙালিত্ব কোথায় আমরা পাই না, সে জানে শুধু কার্ল মার্ক্স, লেনিন, ট্রটস্কি,

জুলিয়াস, কৃষক বাদিষ, শহীদদের অর্থনীতি 'অন্যদের চেয়ে সমাজ। বস্তুর্নিষ্ঠ হয় বলে মানবের প্রেরণা হলো বিলায় লেখক তবে যে তারা অন্যদের দিয়েছিল তা একজন কবিতার লেখকদের কারণ, 'আমার বিশেষ কারণ তোমাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরাগ, তোমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞার শক্তি কিছুতেই ছেড়ো না।' উপন্যাসটি বাদল। অন্যাবাদের উদ্দেশ্যে পুলিস সম্পর্কে বলছেন—"এই মোসাহেব গোলামদের আমাদের মতই রক্তমাংস, সুখী। পেটের দায়ে পাপ করে, দেশদ্রোহী হয়। দেশের জন্য জন, পুলিস পরে এরাও আমাদের তোমাদের ঘরোয়া হয়।" কিন্তু অন্যদের এবং জাহাঙ্গীর পরিণতি বড়ই করুণ—স্বাধীনতাকামী স্বদেশের হিতৈষণা আসামের বুকে ফেরা শেষ অমৃত গ্রহণ করে যাব বেশ। তুমিও, প্রেমশিশুর অস্তর প্রণয়েরাও লেখকদের মতো জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন প্রেমের কথা নিয়ে, তবুও তার প্রতিহার্যতার বল দিয়ে চলে গেল। 'যেতে দেবো পুরস্কার করো' আমাদের রক্তের আগুনের প্রেরণা প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকলো। তোমাদের নজরুল বিপ্লবীর প্রেমকে কি সুন্দর পরিণতি দিলেন।

উপন্যাসের উপন্যাস তাঁর 'কুহেলিকা'। এটি তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস। এর প্রকাশ কাল ১৩৩৮ সালে (১৯৩১)। 'মৃত্যু ক্ষুধা' নজরুলের সমাজ সচেতনতা প্রধান ছিল, সঙ্গে ছিল অন্যান্যের রাজনৈতিক ভূমিকা। কিন্তু 'কুহেলিকা'-তে কবি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি সচেতন। তিনি এ উপন্যাসে বিপ্লবদের দীক্ষিত জীবনের কথাই লিখেছেন। কোনো সাহিত্যিকের ভাষ্যিকায় বলা হয়েছে—"A story of a rich youth who joins the revolutionary movement, and is eventually arrested and transported for life." এই বিপ্লবী যুবকের কাহিনীই মূলতঃ এই উপন্যাসের কাহিনী, বিপ্লবী যুবক জাহাঙ্গীর এই বিপ্লবীদের সম্পর্কে বলে এই যে শক্তিটি এখন সেটি প্রতিভা—"যাহারা জানে এই বিপ্লববাদীদের, অসহায়ী বলিয়ে, কি যেন্‌ যারা শিরাই না ইহাদের বুকের আগুন জ্বালায় তারা।...দেশের শত্রু, সমগ্র মানবজাতির শত্রু, সকল কল্যাণের শত্রু ভাবিয়া যাহাকে হত্যা করিয়াছে, তাহারই শিশু পুত্রকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিয়াছে, ইহারাই বিপ্লবী।" নজরুল তাঁর সময় দৃষ্টিতে রাজনীতি সমাজ এতদিনের কথা বলেছেন, কিন্তু 'কুহেলিকা'তে তিনি বিপ্লবীদের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

উপন্যাসের সবগুলি চরিত্র এবং জাহাঙ্গীর অত্যন্ত বলিষ্ঠ। জাহাঙ্গীর মাতৃত্ব পারিবারিক বন্ধনে পরিণত হয়েছিল। হারুণ অত্যন্ত পবিত্র পরিবারের সন্তান। জাহাঙ্গীর ধনী জমিদার পুত্র কিন্তু নানা ঝামেলার মধ্য দিয়ে জাহাঙ্গীর বাবলের মেয়েকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের মা ধনী হলেও তাঁদেরকে সকল পরিচয়া করা সমাজে এসে মুখী অর্থাৎ হাতে থেকে সমাজকে অস্বীকার করে দিয়েও এসেছিলেন। অস্বীকার হলো কিন্তু বিয়ে শেষ পর্যন্ত আর ঘটে ওঠেনি। জাহাঙ্গীর প্রথমের সামাজিক পরিপূর্ণতাকে কাটিয়েছে অন্যেদের, দেশমাতার বেদীমূলে নিজেকে সমর্পণ করে দিল। বিপুল পরিমাণ সম্পদ, জমিদারি একেটি বা সম্ভাবই অস্তুষ্টানে আছে তা সে দেশের হাতে করলো—বিপ্লবীদের হাতে সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘটেছে। জাহাঙ্গীরের জীবনে একটি গোপন কাহিনী আছে যা তাকে সংসার থেকে দূরে আরও দূরে হটিয়ে নিয়ে গেছিলেছে। "জাহাঙ্গীর যখন 'জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলিয়া সংস্কারে প্রথা নিবেদন করিতে শিখিয়াছে, সেই

[illegible] অত্যাচারিত— [illegible] মানুষ [illegible] যে [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] হলো। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible] [illegible] হলো না। [illegible]—এই [illegible] [illegible] কোথায় ছিল? [illegible] বললো 'কে তোমাকে এমনটা [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—'আমি [illegible] [illegible]। [illegible] আগে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এ [illegible] না [illegible], তুমি আমার [illegible] [illegible]।' [illegible] [illegible] গেল। '[illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible],—[illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible]।'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনেক [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়া গেছে, কিন্তু উপন্যাসে [illegible] [illegible] [illegible] নজরুল [illegible] [illegible], [illegible], এবং পূর্ববর্তী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেছেন। [illegible] [illegible] এ বিষয়ে [illegible] [illegible] হয়েছিলেন [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] নজরুল এক নন, কিন্তু [illegible], একথা [illegible], [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছেন কবিতায় [illegible], [illegible] উপন্যাসেও সেই [illegible] [illegible] [illegible] কবির [illegible] [illegible] '[illegible] [illegible] [illegible]' এমন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি সৃষ্টির পাশাপাশি [illegible] কিন্তু [illegible] নজরুল [illegible] [illegible]—[illegible] মূল্য [illegible] হিসেবে [illegible] [illegible] তুলনায় [illegible] [illegible] বেশি [illegible] রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] বিরুদ্ধে ক্ষোভ, বিদ্রোহ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মানুষের [illegible] [illegible] [illegible] 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' [illegible] [illegible], '[illegible]', '[illegible]', '[illegible]', '[illegible] [illegible] কে?', '[illegible] ও [illegible]', '[illegible] [illegible]', '[illegible]', '[illegible]' ইত্যাদি কেন কিছু। এর মধ্যে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' [illegible] ইতিহাস হয়ে আছে। 'ধূমকেতু' পত্রিকার ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের [illegible] সেপ্টেম্বর সংখ্যায় '[illegible] [illegible]' প্রকাশিত হওয়ায় কবির বিরুদ্ধে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] তাঁকে [illegible] করে [illegible] পাঠানো হয়। আদালতে বিচারের [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] কবি যে [illegible] [illegible] পাঠ করেন, সেই [illegible] প্রবন্ধটি ঐ নামে '[illegible]' [illegible] প্রকাশিত হয়েছিল। [illegible] [illegible] [illegible] ব্রিটিশ [illegible] [illegible] কবির তীব্র [illegible], [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] হয়েছে—'[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। এটা [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না, [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]—এ কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?' '[illegible] [illegible]' প্রবন্ধে তিনি [illegible] [illegible] নীতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] direct action. [illegible] [illegible] [illegible] নীতির [illegible] communalism [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নয়। [illegible] [illegible] নীতির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], দ্বিতীয় নীতির [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]।' '[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] দিন।'

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।' '[illegible] [illegible] [illegible] না [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], রাজনীতি, সমাজ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ে [illegible] তাঁর [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]। '[illegible]' প্রবন্ধে [illegible]—'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।'

এরই প্রতিধ্বনি শুনি '[illegible] [illegible]' কবিতায়

[illegible] [illegible] [illegible] না [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] একটু [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]...

[illegible] রাজনৈতিক, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মানুষের [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উদাহরণ। '[illegible] [illegible] [illegible] কে?'—এই [illegible] বিরুদ্ধে কবির [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নয়। '[illegible] [illegible], এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]? আমরা কি [illegible] [illegible]? [illegible], [illegible]। [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible]।' এই প্রবন্ধটি রচনা এবং প্রকাশের পর কবির উপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছিল।

[illegible] [illegible] বিশ্লেষণ করে এটা উপলব্ধি হলো যে, উপন্যাস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কবি [illegible] উপস্থিত [illegible]। [illegible] [illegible], [illegible] সেই [illegible] নজরুলকেই [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] নজরুলের [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] উপন্যাস-[illegible] [illegible] হয়েছে। [illegible] [illegible] [illegible] উপলব্ধি [illegible] [illegible] [illegible]।

অনুবাদক নজরুল

আবদুল কাদির

কাজী নজরুল ইসলামের লেখক-জীবনের পরিধি ১৩২৬ সাল মোতাবেক ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৪৯ সাল মোতাবেক ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৪ বছর। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা : 'মুক্তি' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৬); দ্বিতীয় কবিতা : 'কবিতা সমাধি' (সওগাত, আশ্বিন ১৩২৬); তৃতীয় কবিতা : 'আশায়' (প্রবাসী, পৌষ ১৩২৬); চতুর্থ কবিতা (গজল) : 'চিঠি' (নবযুগ, [illegible] ১৩২৭) এবং পঞ্চম কবিতা : [illegible] (নূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭)। তন্মধ্যে [illegible] 'আশায়' হাফিজের একটি গজলের অনুবাদ এবং [illegible] নজরুলের কবি-জীবনের এই সূচনাতেই দেখা যায় : মৌলিক কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে ফারসি থেকে অনুবাদের দিকেও তাঁর ঔৎসুক্য আছে।

সেই প্রথম জীবনে ইংরেজি থেকে বাংলা গদ্যে কিছু অনুবাদও তিনি করেছিলেন। ১৩২৭ বৈশাখের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার' 'সংকলন' বিভাগে 'অমরীদের প্রতি', [illegible] ও 'জীবন-বিজ্ঞান' [illegible] শিরোনামে তাঁর তিনটি ছোট লেখা ছাপা হয়; তার শেষে বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত আছে : "Englishman-এর Magazine Section" হইতে। এই লেখাগুলির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় ইংরেজী বাক্যগুলো অবলম্বনে লেখা হলেও এগুলি ঠিক অনুবাদ নয়। তবু নজরুলের অনুবাদ-কার্যের ইতিহাস লিখতে গেলে এগুলিরও উল্লেখ দরকার।

১৩৬৯ জ্যৈষ্ঠের 'পূরবী'তে জনাব আনোয়ার রহমান 'অনুবাদক নজরুল' প্রবন্ধে বলেছেন : "হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের অনুবাদ একত্রে প্রকাশিত হয় নাকি 'মোহাম্মদী'তে নজরুলের সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বে। তিনি কোরআন এবং হাফিজের কবিতার অনুবাদ করেন এই সময়েই। ...তিনি কোরান শরীফ এবং দেওয়ান-ই-হাফিজ-এর অনুবাদ শুরু করেন প্রায় একই সময়ে।"

১ নজরুলের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বলেছেন "কাজী নজরুলের প্রথম জীবনের রচনা এই কাজী [illegible] অনুবাদ [illegible] মনে পড়ে। [illegible] অনুকরণে 'শাতিল আরব শাতিল আরব' ঐ স্বাধীন অনুবাদ।"—১৩২৭ জ্যৈষ্ঠের 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয় নজরুলের 'শাত্‌-ইল-আরব'—এ 'অনুবাদ' নয়, মৌলিক কবিতা—একটি ছবি দেখে রচিত, সে ছবি মুদ্রিত আছে পত্রিকার frontis-piece রূপে এবং ছবির পাশে আছে পত্রিকায় [illegible] ১৩৪ পৃষ্ঠা।—লেখক

কিন্তু আমরা যতদূর জানি, নজরুল [illegible] 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' থেকে কয়েকটি গজলের অনুবাদ শুরু করেছিলেন। তিনি এ-প্রসঙ্গে তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' পুস্তকের 'মুখবন্ধে' বলেছেন :

আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরিজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন। তাঁর কাছে প্রথম আমি ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই প'ড়ে ফেলি। ...এর অনেক বছর পরে হাফিজের 'দীওয়ান'

অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। তাঁর 'কাব্যে আমপারা' (১৩৩৮) প্রকাশের প্রায় ১১ বছর পূর্বে, ১৩২৭ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' সেই 'অনুবাদ' থেকে দুটি 'গজল' প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ বৈশাখের 'প্রবাসী'তে তাঁর 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' : 'গজল ৭' প্রকাশিত হয়; তাতে শিরোনামের নীচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা আছে 'প্রথম দুটি গজলের কবিতার-অনুবাদ 'মোসলেম ভারতে' বেরিয়েছিল। এগুলি ঠিক অনুবাদ নয়। ভাব অনুবাদ বলা যেতে পারে।" ১৩৩০ বৈশাখের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' থেকে অনূদিত তাঁর আর একটি 'গজল' প্রকাশিত হয়। এ-সকল অনুবাদে নজরুল মূলের ভাব ও ছন্দধ্বনি যথাসম্ভব বজায় রেখেছেন। 'গজল-২' থেকে দু'চরণ উদ্ধৃত করছি :

১ ২ ৩ ৪

ও গো মোর সুন্দর! চাঁদের উদয় মুখ তোমার যৌবন রূপ দেখেই
উদয় হেরিনু তোমার চেহারার চিবুক শারদ ফুল ফোটেই।।

এখানে প্রতি চরণে চারিটি পর্ব (measure) এবং শেষ পর্বটি অপূর্ণ; পূর্ণপর্বে চারিটি স্বর (Syllable), তন্মধ্যে প্রথমটি যুক্তস্বর এবং অবশিষ্ট তিনটি লঘুস্বর; অপূর্ণ পর্বটিতে তিনটি স্বর, তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি লঘু এবং দ্বিতীয়টি যুক্ত। উপর্যুক্ত চরণগুলিতে প্রস্বরের (accent-এর) এরূপ পর্বায় বিন্যাসের ফলে তাঁর হাতে ফারসীর লঘু-গুরু-ধ্বনির তরঙ্গ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। নজরুলের সুপ্ত ছন্দ-প্রতিভা তাঁর অনূদিত গজলে এনে দিয়েছে নতুন বৈচিত্র্য। নজরুল যেখানে ছন্দকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন [illegible], সেখানে বাণীর আবেদন হয়েছে অধিকতর তীক্ষ্ণ ও চমৎকার। উপর্যুক্ত 'গজল-৭' থেকে নমুনা দিচ্ছি :

১ম মাধুরীর শাখে 'শিরাজ'-সুন্দরী কৌতুকিনী [illegible] কেশ-কাজল
কেন খুলে দিয়ে বেণী 'তিরেব'-তন্বী [illegible] দিলে হিয়া পোশাকে।
তব এলোচুলে আজ ফুলে কেন ঘন কালো দিয়ে কেন বাঁধিয়াছে,
ঐ কালো কেশে আমি আঁচলেতে পেতে [illegible] ফিরি কাঁদিয়া রে।

উপর্যুক্ত গজলটি মাত্রাবৃত্ত (MORAIC) ছন্দে বিরচিত; তার প্রতি চরণের গোড়ায় একটি দ্বিমাত্রিক অতিপর্ব (hyper-measure), অতঃপর চারিটি পর্ব, তন্মধ্যে প্রথম তিনটি পর্ব ষণ্মাত্রিক এবং চতুর্থ পর্বটি

মনুষ্যত্বিক। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'হাফেজ' অবলম্বনে 'প্রিয়া হবে পাশে' লেখেন; তার থেকেও এবার হয় তুলনি :

> আমাদের এই প্রেমিক সমাজে আদর আবার নাই,
> নিয়াম কেশের সুরভিতে তোমা ছবর সর্বদাই।
> পাবের বুকনী চুমি অধি যদি লক্ষ্য আর ছবি'
> আদি হাফি' দেখি সুখের পেয়ালা—হবে তব সুন্দরী।
>
> প্রীতি প্রতিম

সত্যেন্দ্র দত্ত (১৮৮২-১৯২২) এ অনুবাদ করেছেন প্রচলিত লঘু-ত্রিপদী ছন্দের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। কিন্তু এ অনুবাদে কাব্যের অভিব্যক্তি ও আবেদনের অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে? আবোলাবার সত্যেন কি বলতে চান যে, এ অনুবাদ 'মৌলিক কবিতার মতো', আর নজরুলের অনুবাদ তার অপেক্ষা 'দীনতর'।

হাফিজের সুপ্রসিদ্ধ 'আগর আঁ তুর্কে শিরাজী' গজলটির অনুবাদ মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) করেছেন এভাবে :

> শীরাজের সেই তুরানী রূপসী
>
> যে-নারী,
>
> যদি কোনোদিন করে দেয় এ
>
> সুখ-হাতায়,
>
> তবে সে গালের কালো তিলটির
>
> বদলে গো,
>
> দিতে দিতে পারি সমরকন্দ
>
> বোখারা আর!
>
> সেই শরাব পড়ে আছে শেষ—
>
> ঢালো সাকী।
>
> বেহেশতেও যে পাবে না এমন
>
> আছে না কি?—
>
> রোকনাবাদের তীর মনোহর
>
> কিনারাটি,
>
> গুল-গুলবাগের পরিষ্টি এমন
>
> মুসল্লাহ!
>
> —(স্বপন-পসারী, 'হাফিজের অনুসরণে')

এ অনুবাদে গজলের শব্দসংখ্যা মূল থেকে বেশি হলেও শব্দগত অভিব্যক্তি ও বিন্যাস বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কাব্যের আবেদন হয়েছে ক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত। ফারসী ভাষাও অনেকখানি সৃষ্টি হয়েছে। এর ছন্দও কলাবৃত্তিক, কিন্তু প্রবহমান (Stress-এর) সুষম প্রয়োগে এর রূপ হয়েছে স্ফুর্তি ও গতিময় স্বচ্ছন্দে যা পড়তে ভালো।

শেখ হাবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'আবেহায়াত' (১৯১৫) গ্রন্থে হাফিজের কয়টি গজলের পদ্যানুবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাতে হাফিজের সুবিখ্যাত "বোতরোরে দোস্ত নাঘরা বেগো জাজা বরাদর না কনদ" গজলটির অনুবাদ :

> দাও হে সাকী, দাও হে মদ্য
>
> নূতন নূতন করাতে
>
> দুনিয়া বসিয়ে সুমধুর সুর
>
> নূতন নূতন ধরাতে।

এ আক্ষরিক অনুবাদ (literal translation) হলেও ভাবানুগামিতায় মূলাশ্রয়ী হয়েছে কি না বিচার্য। ১৩৩৭ বাংলা সনের 'প্রবাসী'-তে নজরুল হাফিজের উপরোক্ত গজলটির ভাবানুবাদ করেন এভাবে :

> আবার নূতন নূতনতর দেখাও রীতি সাকীওয়ালা।
> আবার বানাও শরাব তাতে, কাবো জন্যে হুকুম যাবে।।

হাফিজের 'দীওয়ান' থেকে নজরুল মোট কতগুলি গজলের অনুবাদ করেন তার সঠিক তালিকা তৈরী করা যেতে পারে।

অযোধ্যার প্রথমে "হাফিজের রুবাই অনুবাদ" গ্রন্থে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক' (১৮৬৪) কাব্যখানির নাম উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'প্রকৃত বন্ধু ঈশ্বর,' 'দুঃখ বিনা সুখ হয় না' প্রভৃতি পাঠক মহলে পরিচিত কুলগাথা পুরাতে অমৃত সিঞ্চিত হয়ে থাকে। প্রথমোক্ত ১৪-পংক্তির পদ্যটির শেষ শ্লোক—

> হৃদয়েতে দিও দেখী অমিয়-ধারা
> যে করে সমান প্রেম সকল দারা।
>
> —(সদ্ভাবশতক, ১৫ পৃঃ)
>
> দ্বিতীয়োক্ত ৮ পংক্তির পদ্যটির শেষ শ্লোক—
>
> কত যেতে বিরহ দহন বিপু-তরে
> হায়রে! বিধুর কেন-প্রতিতে-প্রাণ?
>
> —(সদ্ভাবশতক, ৮১ পৃঃ)

বলা বাহুল্য যে, হাফিজ থেকে ভাব নিয়েই কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এ-সকল কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তাঁর বড় গৌরব এজন্য যে, আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ১২৭১ সালের ১লা আশ্বিন তাঁর 'সদ্ভাবশতক' প্রকাশের ফলে ইরানী-কবি হাফিজ বাঙালী পাঠক-সমাজের ঘরে ঘরে পরিচিত হয়েছিলেন।

তার প্রায় ১৫ বছর পরে (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে), কবি গিরিশচন্দ্র সেনের 'হাফিজ' (দিওয়ান-ই-হাফিজের অনুবাদ, প্রথম খণ্ড) আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর দুরন্ত পরিশ্রমের 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেনের ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে,—নজরুলের অনুবাদের অনেক পরে। গিরিশচন্দ্র সেনের মতো এঁরাও হাফিজের অনুবাদ করেছেন ইংরেজী থেকে' নয়—মূল ফারসী থেকে।

২

গিরিশচন্দ্র সেনের 'কোরান শরীফের তর্জমা' প্রসঙ্গে আবোয়ার রহমান বলেছেন : "তাঁর (গিরিশচন্দ্র সেনের) প্রায় সমসাময়িককালেই তাসলিম আলী নামে একজন মুসলিম সুধী কোরান শরীফের বাংলা অনুবাদ করেন।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০) তিন খণ্ডে 'কোরান শরীফ' অনুবাদ ও প্রকাশ করেন ১৮৮১-১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে; আর মওলানা মোহাম্মদ আব্বাস আলীর 'কোরান শরীফ' প্রকাশিত হয় তার প্রায় তিন দশক পরে—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে কোরান শরীফের প্রথম অনুবাদক মওলানা মোহাম্মদ নঈমুদ্দিন (১৮৩২-১৯০৮) তাঁর 'আমপারার কোরান শরীফ প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে; তিনি দশ পারা অনুবাদ করেন, দশম পারা আধা শেষ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তিনি পরলোকগমন করেন। নজরুলের 'কাব্যে আমপারা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৪

অনুবাদে— 'দীওয়ান-ই-হাফিজের অনুবাদ শুরু' করার প্রায় ১৫ বছর পরে। দুটি নমুনা তুলনীয়।

বল রে বিহগিণী, তোমরা আমার
সুরা ধর, যদি সুরা নাহি না তাহার

মূল রুবাইয়াৎ

তুমি কি জানো, তবে ধর্ম বিধান নেই।
নির্ভুলীয় রাতটিতে শেষ পারি এই।

মূল উর্দু

এ অনুবাদদ্বয় অত্যন্ত দুর্বল। দুটোর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সংরক্ষণ করতে যেয়ে এটিই এর কারণ এবং তাতে শৈথিল্য প্রকাশ করে থাকে নাজরুল।

১৩৩৮ বৈশাখে নজরুল 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' অনুবাদ শুরু করেন। তাঁর অনূদিত ১৩টি রুবাই ১৩৩৮ বৈশাখের 'জয়তী' তে প্রকাশিত হয়। উক্ত রুবাইগুলোর অধিক মাত্রা লিখিত প্রতিলিপি 'নজরুল রচনা-সম্ভার' পুস্তকে দেখা লাভ করেছে। এ-অনুবাদের শেষ রুবাইটি :

সব আগুনের দৌলতী কল—
পান করে এ খারাব হাল,
যেমন মনে তেমনি ক'রে
খোদার পানে উঠবে তাল।
এই যে যদি বক্ত বই
শরাব এবং প্রিয়ার নিয়ে,
স্বর্গ থেকে উঠবে আরো
এই পাগল এই দিল-দেওয়ানা।

১৩৩৯ সালে কলকাতার আবদুল চক্রবর্তী এও নামে নজরুলের 'রুবাইয়াৎ-ই হাফিজ' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এ-পুস্তকের রুবাইগুলি "এখানে প্রকাশিত হয় মাসিক মোহাম্মদী-তে—নজরুলের সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্ব" —কাজী আবদুলের মন্তব্যের এ অংশটি বিতর্কিত।

১৩৪৩ কার্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষের মাসিক 'মোহাম্মদী'তে নজরুলের অনূদিত ওমর খৈয়ামের ৫২টি রুবাই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় ২৬-বছর পরে—১৩৬৬ পৌষে, তাতে মূল পাঠ রয়েছে ১৯৭টি রুবাই। প্রথম রুবাইটি এই :

বাহুর ভীষণ উর্ধে ক'রে আকাশ তল ঐ প্রহরে,
জাগো সকী! সকল বেলায় যৌবতি কারো আমার সাথ।
কোনো কোনো দিনের স্মৃতি। এমনি প্রভাত আসবে রে,
ঘুমিয়ে থেকো এইখানে কেন, করবে করুণ নয়নপাত।

২ নজরুলের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থের ভূমিকায় তৈমুর মুনশির ভাষী বলেছেন : 'তিনি (নজরুল ইসলাম) খৈয়ামের শেষ অনুবাদক 'আখতার' আলা রূপে অনুবাদ করেন—তাদের সেটি প্রকাশিত হয়েছে।'—কিন্তু 'ছায়া' অর্থাৎ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে 'অমর ভারতবর্ষ'র দ্বিতীয় সংকলন। —লেখক

কিন্তু মাসিক 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত ১২৪ রুবাইটির রূপ ছিল এই :
পূর্বাকাশে ঐ ছিটিয়ে হাতে ছিটিয়ে-বিদায় কিরণ-তীর।
আয়েশাতের শব্দ নিয়ে করছে যেন সব কোলাহিত।
জোছনা এর লেবি-কূলে ১২৬ নিয়ে কর মুসাফির—
জাগো জাগো, প্রভাত সেরে উঠবে যাত্রীর লাল পানির।
পার্থক্যটা চোখে পড়ে, পরবর্তীকালে নজরুল তাঁর অনুবাদ প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করেন। রুবাইগুলি সজ্জিত করেন নূতনভাবে। যেমন, মাসিক 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত ৭নং রুবাইটি গ্রন্থে হয়েছে ১২৮ নং রুবাই। মাসিক 'মোহাম্মদী'র ১২না ও ১৭নং রুবাই দুটি হয়েছে গ্রন্থে সর্বশেষ ১২৫নং ও ১১৭নং রুবাই। গ্রন্থে কোনো কোনো রুবাইয়ের চরণ বিন্যাসেও বদল হয়েছে। যেমন, মাসিক 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত ৫নং রুবাই গ্রন্থে হয়েছে ১৪৪ নং রুবাই এবং এতে আগেকার প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ যথাক্রমে হয়েছে দ্বিতীয়, চতুর্থ, তৃতীয় ও প্রথম চরণ।

(১) রুবাই ছন্দবদ্ধ (metrical stanza) বা শ্লোক বিশেষ, তাতে চারিটি পদ বা চরণ থাকে, তার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল হয়, তৃতীয় চরণ সাধারণত অমিল (blank) থাকে। আইরিশ কবি এডোয়ার্ড ফিটজেরাল্ড (Edward Fitzgerald : ১৮০৯-১৮৮৩) ফারসী রুবাইয়ের এ গঠনপদ্ধতি বজায় রেখেই ইংরেজিতে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের এক স্বচ্ছন্দ অনুবাদ (free translation) বেনামীতে প্রকাশ করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর Rubaiyat of Omar Khayyam প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়, তাতে ৭৫টি রুবাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং মূল্য ছিল মাত্র ২৫০ পেনি। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তার সাথে ৩৫টি রুবাই যোগ ক'রে দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হয়; কিন্তু পরবর্তীকালে সে-সংকলনের ১৪, ২৮, ৪৪, ৭৭, ৮৬, ৯০, ৯৯ ও ১০৭ সংখ্যক রুবাই ৯টি পরিত্যক্ত হয়। প্রত্যেক সংকলনেই অনুবাদের ভাষায় কিছু কিছু পরিমার্জনা করা হয়। আমরা আগে দেখিয়েছি যে, নজরুল ওমরের ১নং রুবাইটির যে অনুবাদ প্রথমে প্রকাশ করেন, পরে তার পরিবর্তন করেন। ফিটজেরাল্ডের প্রথম সংকলনে এ রুবাইটির অনুবাদ :

Awake! for Morning in the Bowl of Night
Has flung the stone that puts the Stars to Flight
And Lo! the Hunter of the East has caught
The Sultan's Turret in a Noose of Light

চতুর্থ সংকলনে (১৮৭৯)-এর অনুবাদ—

Wake! For the Sun, who scatter'd into flight
The Stars before him from the Field of Night
Drives Night along with them from Heav'n, and strikes
The Sultan's Turret with a Shaft of Light.

ফিটজেরাল্ডের মতে, ওমর-খৈয়াম ছিলেন বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদী (the material Epicurian)। অন্যপক্ষে প্রসিদ্ধ নিকলসনের মতে, ওমর খৈয়াম ছিলেন হাফিজের মতো মরমী সূফী (mystical Sufi)। এই দুই মতের সমর্থকদের বিতর্ক অদ্যাবধি নিষ্পত্তি হয়নি এবং কোনোদিন হবেও না। ওমর খৈয়াম নিজে বলেছেন :

গাহিয়ার কে বিদায়ক্তে হিমাৎ বিয়োগাত
দার তোমারে নাৰ মেহার ও নাগাহ্ বাসোদ্দে
মেকিয়াকে আফতাম্ হাদ্দার ওমরাণ চনুরাম্
নাদান আস্তা দরাম্‌সাদাম্ বাদ্‌তোমার

কান্তিচন্দ্রের অনুবাদ—

খৈয়াম যে জানেন তাঁবু করল সেলাই জ্ঞানীজন,
অগ্নিকুণ্ডে প'ড়ে সে আজ লভিছে মরণ আলয়ন।
তাঁর জীবনের সূত্রগুলি মৃত্যু-কাঁচি কাটিল হায়,
তুচ্ছ দামে বিকায় তারে ভাগ্য নিলামওয়ালা ধন।

মূলের প্রতি সত্যানুসারে অনুগত থেকে নরেন্দ্র দেব এ অনুবাদ করেছেন। ভাব ও ছন্দ মূলানুগত হ'লে তাঁর অনুবাদ কোনও কোনও স্থানে কিছু আড়ষ্ট লাগে, কিন্তু ফিটজেরাল্ড পরিবেশন কাব্যগুণ সুরুচি মৌলিক সৃষ্টি মতো অনবদ্য হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "কবিতা জিনিসটা ভারি মতো এক ভাষার অন্তঃপুর থেকে অন্য ভাষার অন্তঃপুরে আনতে গেলে মারা যায়।" যাঁরা নরেন্দ্রদেবের "মৌলিক রচনার তুলনায় অনুবাদের অন্তঃসার" লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের এ-কথাটি মেনে নেবেন।

১৩০৯ পৌষের 'প্রবাসী'তে রজনীকান্ত প্রকাশিত রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের "অনুবাদক হিসেবে কান্তি ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, সত্যেন্দ্র দত্ত প্রমুখ কবির উল্লেখ করে জনাব আবদুল কাদির নাম দিয়ে জানান যে, "তাঁরা মূল কবিতার আক্ষরিক অনুসরণ করেন নি।" মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ স্পষ্টতই বলেছেন: নজরুল 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের' অনুবাদে "অনেক নিখুঁতভাবে ফারসী আঙ্গিকের" এবং "এর আগে ফারসীর আর কোন অনুবাদে রুবাইয়াতের আঙ্গিক পুরোপুরি অনুসৃত হয়নি।"

নজরুলের অনুবাদের প্রায় ৩০ বছর আগে, অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০—১৯১৮) "ওমরের অনুবাদ ও অনুসরণ" ক'রে বাংলা ভাষায় প্রথম রুবাই পরিবেশন করেন। তাঁর অনূদিত ৮০টি রুবাই তিন কিস্তিতে, প্রথম ২২টি রুবাই ১৩১১ বৈশাখে, ৫০ থেকে ৫০ সংখ্যক রুবাই ১৩১৮ হিসাবে এবং ৫৪ থেকে ৮০ সংখ্যক রুবাই ১৩২১ জ্যৈষ্ঠে 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। তিনি ১ রুবাইয়ের অনুবাদ করেন এভাবে—

আর ঘুমায়ো না, শাস্ত্র, খোলো নয়ন।
শশী হাতে মুঠা, মুঠি প্রভাত-কিরণ।
প্রাসাদের শীর্ষমিনি পলায় তারকা
অকালে বুঝায়ে তার ধরেন গগন॥

অক্ষয় বড়াল তাঁর অনুবাদে ফারসী রুবাইর মিলবিন্যাস (rhyme structure) রক্ষায় যত্নবান। তিনি এখানে 'তাঁর প্রিয় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এই পয়ারছন্দ সুগম্ভীর ভাব বহনের জন্য অতিশয় উপযোগী; কিন্তু ফারসী রুবাইর 'মিত্রিক' ভাব, শব্দ 'হিল্লোল' ও ললিত 'লালিত্য' প্রকাশের পক্ষে এ ছন্দ কতখানি অনুকূল সে পরীক্ষা অক্ষয়কুমার আর চেষ্টা করেন নি।

১৩১৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তীর্থসলিল' প্রকাশিত হয়; তাতে 'রুবাইয়াৎ' শিরোনামে 'ওমর খৈয়াম' থেকে ১৪টি রুবাইর অনুবাদ পরিবেশিত হয়েছে। তার প্রথমটি হচ্ছে ফিটজেরাল্ডের প্রথম সংস্করণের ১১নং ও চতুর্থ সংস্করণের ১২নং রুবাই—

তরুচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই যদি একখানি,
পাই যদি একপাত্র মদিরা, আর যদি তুমি, রাণী!
সে-বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া গাও গো মধুর গান,
বিজন হইবে স্বর্গ আমার, তৃপ্তি লভিবে প্রাণ।

সত্যেন্দ্র দত্ত এখানে রুবাই-র মিল-পদ্ধতি রক্ষা করেন নাই, তাঁর "ছিন্ন মুকুল" কবিতার ছন্দে—অন্ত্যমিলবিশিষ্ট মাত্রাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এর ছন্দে রয়েছে নূতন রীতিবৈচিত্র্যের স্বাক্ষর। লোকছন্দ (folk-metre) স্বরবৃত্তে ৭১টি রুবাই অনুবাদ ক'রে কান্তিচন্দ্র ঘোষ ১৩২৬ সালে তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' প্রকাশ করেন। তার ১নং রুবাইটি এই:

রাত পোহালো—ওঠ সখি, ঐ উষার আহ্বান।
শাস্ত্র তারা বলি ওরে কি পালিয়ে গেছে নিশিদিন।
পূব গগনের সেই শিকারীর স্বর্ণ-উজল কিরণ-তীর
শাহের এসে রাজপ্রাসাদের মিনার হেথা উজলিল॥

মাত্রা গোনার অনুবাদে ছন্দ হয়েছে দুটি সবিল কাপলেট (rhyming Couplet-এর) সমষ্টি, তার সাথেও রুবাইর বৈশিষ্ট্য হয়নি। কিন্তু স্বরবৃত্তের ঝংকৃত (Syllabic) ছন্দের চটুলতা ও লালিত্যে তাঁর অনুবাদকে করেছে লোকপ্রিয়।[১]

অতঃপর প্রকাশিত হয় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ সাহিত্যরত্ন কর্তৃক অনূদিত 'রুবাইয়াৎ'। ১৩২৯ কার্তিকের 'ভারতী'-তে এই অনুবাদখানির পরিচয় প্রসঙ্গে এক প্রবন্ধে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন:

বাংলা সাহিত্যে ওমরের রুবাইয়াৎ সিরিজের তৃতীয় প্রয়াস বিজয় বাবুর 'রুবাইয়াৎ'। ... তাঁর অনুবাদের একটি বিশেষত্ব দেখি এই যে, তিনি ওমরের মূল কবিতাবলি ও তার অনুবাদ পাশাপাশি সাজিয়ে তাঁর অনুবাদের সৌন্দর্য বিচারের ভার পাঠকের হাতে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছেন।

বিজয় বাবুর অনুবাদ ছন্দোমাধুর্যে উৎকর্ষ লাভ করেছে। তাঁর সহজ প্রকাশ ভঙ্গি শব্দের মাধুর্যে সকলকেই মোহিত করে।

বিজয় বাবুর বইটি আমি দেখিনি। তিনি ১৩২৯ কার্তিক, ... 'ভারতী'-র শেষ কবির 'ওমিক' অনুবাদ ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে রুবাই ছন্দে অষ্টাদশ-মাত্রার চতুষ্পদী' (tetrastich) লেখেন, তার ৯২নং চতুষ্পদীটি এই:

হে পাঠক! যদি পাঠ কর তুমি এই গুলিতাবলি,
'খুদি' শব্দেতে প্রার্থনা করো তাঁহার মুক্তগতি;
কবি এ ধীমান নিয়েছে যেন সবে গো কল্যাণ তাঁর,
মর্তের কবি যুক্তিতে তাঁর নিয়ে কাড়ে এর বাণী।

উক্ত চতুষ্পদীগুলি প'ড়ে আমার ধারণা হয় যে, বিজয় ঘোষ তাঁর 'Fitzgerald বইতে অনূদিত' 'রুবাইয়াৎ' এই অনুবাদে নির্ভর করেছিলেন।

১৩৩০ সালে (যে ১৯২৩) নরেন্দ্র দেবের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিনি স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের নানা ছন্দোবন্ধে ৫১০টি স্তবক রচনা করেন। কিন্তু একটি

১. অক্ষরবৃত্ত প্রসঙ্গে আলোচনা: কবি মোহিতলাল অনূদিত "অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অনুদিত।" দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) তাঁর 'ত্রিবেণী' (১৯১২) গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় 'অক্ষর' অর্থে 'Syllable' বলেছেন এবং 'মাত্রিক' অর্থে 'Syllabic' বুঝিয়েছেন। কিন্তু সাধারণতঃ অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে তানপ্রধান বা কলাবৃত্তিক (mosaic) ছন্দ এবং স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দকে শ্বাসাঘাতপ্রধান Syllabic (দলিক) ছন্দ বুঝানো হয়ে থাকে।
—লেখক

রুবাইয়াত-এর রুবাই-এর ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনূদিত প্রথম রুবাই :

জাগো জাগো, রাত ফুরালো
উষার প্রভাতে [illegible]
তাঁর ছোড়া ঝিকিমিকির দ্যুতি।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ওমর খৈয়ামের রুবাই-এর বাংলা অনুবাদ শতাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের Bodleian Library-তে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি কাওয়েলের যে প্রতিলিপি থেকে ফিটজেরাল্ড তাঁর অনুবাদ তৈরী করেন তাতে ১৫৮টি রুবাই আছে—সেগুলি ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত হয়েছিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মুদ্রিত একটি মুদ্রিত সংস্করণে আছে ৪৩৮ রুবাই, তার পাণ্ডুলিপি আছে [illegible]। [illegible] প্রতিপাদিত [illegible] একটি কবিতায় আছে ২১৬টি রুবাই। [illegible] হেরন-এলেন একটি [illegible] ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যে পাঠ প্রস্তুত করেন, তাতে ৪১৬টি রুবাই আছে। বলা বাহুল্য যে, এসব প্রতিলিপিতে অনেক প্রক্ষিপ্ত রুবাই সংযোজিত হয়েছে। সে যা হোক, নজরুল শেষ ১১০টি রুবাই-এর ভাবানুবাদ [illegible] করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ [illegible] "[illegible]"। [illegible] 'পরি' [illegible]। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, নজরুলের অনুবাদ ছন্দ-প্রসাদে [illegible] মূলের [illegible] থেকে অনেক বেশী নির্ভরশীল।

নজরুল মাঝখানে, হাফিজ এবং ওমর খৈয়াম ছাড়াও কিছু বিদেশী কবিতার ভাবানুবাদ করেছেন। ১৩৩৭ সালে 'মোসলেম ভারত'-এ তাঁর 'বিরহ-বিধুরা' প্রকাশিত হয়, তার প্রথম দু স্তবক :

চাবি তাদের হাতে সোনাদুর
মায়াময়ীর আর দেখাবো না।
দুখী তোমার বাকল হবে
অহংকার আর দেখাবো না।

কবিতাটির নীচে পাদটীকায় লেখা আছে : "[illegible] কবি [illegible] একটি কবিতার ভাব অবলম্বনে।"

৮ বৈশাখ ১৩৩৪-এর 'সওগাত'-এ নজরুলের সুবিখ্যাত 'অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত' ছাপা হয়। তার শুরু :

জাগো—
জাগো অনশন-বন্দী, ওঠো রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত ।।

২১ বৈশাখ ১৩৩৬-এর 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হয় তাঁর 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'—"[illegible]" লেখা। এ দুটি লেখার নীচেই রচনার স্থান ও তারিখ মুদ্রিত আছে : "কলিকাতা ১লা বৈশাখ, ১৩৩৪।" ১৩৩৪ [illegible] 'সওগাতে' নজরুলের দুটি কবিতা : 'অভয়-শক্তি' প্রকাশিত হয়। কবিতাটির শিরোনামের পাশে তারকা-চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় ছাপা হয় : "হুইটম্যানের অনুসরণে" (সওগাত, ৫ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ৪৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই কবিতাটির বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান তাঁর 'নজরুল ইসলাম' পুস্তকে মন্তব্য করেছেন : "[illegible] ইংরেজী কবিতার [illegible] পৃথক, [illegible] পর্যন্ত [illegible] হয়েছে" (২৩ পৃ:) "অথচ তার স্বীকৃতি কোথাও নেই" (১১ পৃ:)। এই মন্তব্য পড়ে মনে হয়, উপরোক্ত পাদটীকাটুকু জনাব আলী আহসানের দৃষ্টিতে পড়ে নি। বলা বাহুল্য যে, সাহিত্যবিশ্বাসের মূল্যায়নের জন্য এ-ধরনের খুঁটিনাটি বিষয়ও লক্ষ্য করা দরকার; অন্যথা অনেক সময় অসম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয় [illegible]। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, নজরুল-সাহিত্যের মূল নিদর্শন আলী আহসান সাহেব [illegible] পরিচয় দিয়েছেন প্রচুর, যদিও তাঁর উপকরণের পরিমাণ কম। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, নজরুলের জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য যত বেশী সংগৃহীত হবে, তাঁর রচনার বিচার ও বিশ্লেষণ তত বেশী সুবিহিত ও সার্থক হবে।

[illegible]
[illegible]
২। [illegible]
৩। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

নজরুল ও চলচ্চিত্র

অরুণকুমার রায়

কাজী নজরুল ইসলামের বৈচিত্র্যময় বিভিন্নমুখী সৃষ্টির কথা আমরা জেনেছি। আমরা জেনেছি তিনি কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে একাধারে গল্পকার, নাট্যকার, সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক, পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, অনুবাদক এবং গীতিকার ও সুরকার। একই সঙ্গে আধুনিক একটি মাধ্যম চলচ্চিত্রের সঙ্গে নজরুল দীর্ঘ ১১ বছর ধরে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই নতুন মাধ্যম সম্বন্ধে কৌতূহল থাকলেও এর শুরুর দিকে তিনি বেশি সময় ব্যয় করেন নি। তিনি ছায়া-কলায় ছবির বিভিন্ন বিভাগে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। হয়তো এই মাধ্যমের ব্যাপক প্রভাবের কথা বুঝেই তিনি মানুষের কাছে আরো বেশি পৌঁছানোর তাগিদে চলচ্চিত্র মাধ্যমের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

নজরুলের জীবদ্দশায় চলচ্চিত্রের দুটি যুগ এসেছে। নির্বাক ও সবাক। নির্বাক যুগে নজরুলের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোন যোগাযোগ ঘটেনি। সবাক যুগের প্রথমেই ১৯৩১ সালে নজরুলের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যোগাযোগ ঘটে। 'নবশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে দেখা যাচ্ছে

নজরুল ইসলাম ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড-এ
সুর ভাণ্ডারী নিযুক্ত

ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড বাঙলা গানের টকি নির্মাণ করিতেছে। প্রসিদ্ধ কবি ও গীতিকার নজরুল ইসলামকে সুর-ভাণ্ডারী নিযুক্ত করিয়াছে। তাহাদের এ মনোনয়ন যথার্থ হইয়াছে, কারণ অধুনা বাঙলার তরুণ কবিদের মধ্যে নজরুল ইসলাম গীতিকার ও সুরকার হিসাবে শ্রেষ্ঠ। বর্তমানে কিছুকাল ম্যাডান কোম্পানি নট-নটীদের সুর পরীক্ষার জন্য কেবল গান, আবৃত্তির সবাক ছিত্রই নির্মাণ করিবেন, পরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' তাহারা সবাক করিয়া তুলিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।" [নবশক্তি, ২১শে ফেব্রু, ১৯৩১]

ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড বাংলা ছবির জন্য বিভিন্ন নট-নটীর স্বর পরীক্ষার জন্য গান ও আবৃত্তির সবাক চিত্রগ্রহণ শুরু করে ১৯৩১ সালেই। কাজী নজরুল ইসলাম ম্যাডান থিয়েটার্স-এ যোগদানের পর ৩০/৪০টি নির্বাচিত দৃশ্য (নাটক ও সংগীত) সবাক হিসেবে ১৯৩১ সালের ১৩ই মার্চ মুক্তি পায়। কালীশ মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস' গ্রন্থে এই সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। এই দৃশ্যাবলীর মধ্যে নজরুলের 'নারী' কবিতার স্বকণ্ঠে আবৃত্তির দৃশ্যও ছিল বলে মনে হয় কারণ নজরুল গবেষক অশোককুমার মিত্র তাঁর 'নজরুল প্রতিভা পরিচিতি' গ্রন্থে বলেছেন—"ইং ১৯৩১ সালে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সম্পদ লইয়া যখন সবাক চিত্র সর্বপ্রথম কলিকাতার চিত্রপুরে আত্মপ্রকাশ করে এবং যখন ক্যালকাটার ম্যাডান থিয়েটার্স লিঃ কর্তৃক পরিবেশিত হয়, তখনই আমরা

ধ্রুব ছবিতে নারদের ভূমিকায়

দেখিয়াছি, সবাক চিত্রের মাধ্যমে কাজী নজরুলকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি

সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ ও নারী
কোন ভেদাভেদ নাই।......

অর্থাৎ ১৯৩১ সালে সবাক যুগের গোড়াতেই নজরুলকে চলচ্চিত্র মাধ্যম ধরে রেখেছিল। এবং এটিই বোধ হয় নজরুলের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রথম সরাসরি যোগাযোগ।

১৯৩৪ সালে পায়োনিয়ার ফিল্মস্-এর প্রযোজনায় 'ধ্রুব' ছবিতে নজরুলের প্রথম আবির্ভাব একাধারে সংগীতকার, গীতকার, অভিনেতা এবং পরিচালক হিসেবে। অবশ্য তাঁর সঙ্গে এই ছবিতে যৌথ পরিচালনা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দে। আলোকচিত্র পরিচালনা করেন টিমসে মাধনী। এই ছবিতে কবি নজরুল নারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ

প্রযোজিত। সংগীতকার হিসাবে নজরুল এই ছবিতে মোট আঠারোটি গান ব্যবহার করেন। এর মধ্যে সতেরোটি গান তাঁর নিজের রচিত এবং সুরারোপিত। বাকি একটি গান গিরিশ ঘোষের। ছবিতে একটি গানে অংশ নেন। ধ্রুব-র ভূমিকায় অভিনয় করেন [illegible]। এই ছবি সম্বন্ধে শিল্পী ধীরেন দাসের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় কবি কিভাবে ছবিতে অভিনয় করতে এলেন—

"অবশেষে ফিল্মের ডাইরেক্টর সত্যেন দে মহাশয় এলেন, তাঁর সঙ্গে এই সম্বন্ধে আলোচনা হল, কোথায় কোন অবস্থায় উনি যে গান ছবিতে থাকবে তার ঠিক হলো। তারপরই কাজী সাহেব জানালেন যদি নিজেই নারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন—এতে ডাইরেক্টর মহাশয় অভিযোগ তুলে বললেন, এই কাজী সাহেব, আপনি এ কথা তো আমাকে বলেন নি। এতক্ষণ তো শুধু সুনীতি, সুরুচি ও ধ্রুব চরিত্রের গানের কথাই হল, আপনাকে দুটো একটা গানের খোঁজ—তখন আপনাকেও গাইতে হবে—সেই কোন কোন 'সিচুয়েশনে' আপনার গান দেওয়া হবে।' এরপর নারদ রূপে ছবিতে আবার ঠিক করে গানের ব্যবস্থা হল। শেষ পর্যন্ত সেদিন নারদের বিষয়ে কথা বলতে কবি খুব বিব্রত বোধ করেছিলেন—কিন্তু পরে অনেক আনন্দ ছিল।" এখানে বলা যায় নজরুল শুধু নিজেই নয় বাংলা ছবির পরিচালক হিসেবে যে অবদান রেখেছেন বিভিন্ন গ্রন্থে দেখছি এটি নজরুল ও সত্যেন দে-র যৌথ পরিচালনায় তৈরি। এই স্মৃতিচারণ থেকে আরও জানা যায় উদ্বোধনের দিন দর্শকের জনতার কবি নজরুলকে পুরো ছবিটা না দেখেই প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল।

এই ছবিতে নজরুল নারদের ভূমিকায় করতে গিয়ে প্রচলিত নারদের পোশাক ব্যবহার করেন নি। প্রচলিত নারদের ভূমিকায় অভিনেতারা সাধারণতঃ দেবর্ষির সাজে সাজতো। নজরুল এক নতুন সাজে সজ্জিত হলেন, তখনকার দিনে প্রাচীন নারদের চরিত্রের মতো দাড়ি এবং জটা নিয়ে ছিলেন বৈদিক যুগের ঋষিদের মতো বাবরি চুল, হাতে বীণা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে নামলেন না। তাঁর পরনে ছিল নিজের পাড়ওয়ালা লুঙ্গির মতো ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি, মাথায় মুকুট চূড়া, হাতে ফুলের মালা জড়ানো, হাতে একতারা। তখনকার দিনে সংবাদপত্রে অনেকেই এই নারদ সাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা লেখেন। তারা বলেন, "এ কি রকম নারদ? এ যে দেখি ফিটফাট ম্যাটিনী আইডল!"

অথচ কবি এক চিঠিতে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখলেন, 'আমার নতুন সাজ দেখে অনেকেই আপত্তি তুলেছেন। কিন্তু নারদের বয়েসের উল্লেখ কোথাও কি আছে? তাকে বৃদ্ধ সৈন্যাসী বেশে দেখানো হয়েছে কেন, তারপরই এখন নির্ভর করে বলা, তাকে চির তরুণ রূপেই সমধিক জানা আছে। চির তরুণ, চির সুন্দর সকলের প্রিয় আমাদেরই রূপ দেবার চেষ্টা করেছি।"

[চলচ্চিত্রে নজরুল। আসাদুল হক পৃ. ২৯]

ধ্রুব ছবির পরে নজরুল পাইওনিয়ার ফিল্মস্-এর 'পাতালপুরী' ছবিতে সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে তাঁর কাহিনিতে সংগীত যোজনা করেন নজরুল। ছবিটি ১৯৩৫ সালের ২৩শে মার্চ রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। কবির কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় জানা যাচ্ছে যে এই ছবির গান রচনা করার আগে তিনি বর্ধমানের কয়লাখনি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। কয়লাখাদের কুলি-কামিনদের জীবনের মেলামেশা ও তাদের সঙ্গে সুর ও তাদের গাওয়া গান কবির খুব ভালো লাগে। কবি সেখান থেকে ফিরে এসে সেই কুলি-কামিনদের মুখে শব্দ চয়ন করে গান রচনা করেন এবং একই ধরনের সুর যোজনা করেন।

নজরুলের সংগীত পরিচালক হিসেবে তৃতীয় ছবি হল বাণী পরিচালিত 'গ্রহের ফের'। ছবিটি ১৯৩৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর কলকাতায় মুক্তি পায়। এই ছবিতে গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের রচনায় নজরুল সুরারোপ করেছেন।

নিউ থিয়েটার্স-এর ছবি 'বিদ্যাপতি' ১৯৩৮ সালে মুক্তি পায়। এই ছবির পরিচালক ছিলেন দেবকীকুমার বসু। কবি নজরুলের রেকর্ড নাটিকা 'বিদ্যাপতি' অবলম্বনে ছবিটি তৈরী হয়। ছবিটির সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায় রাইচাঁদ বড়াল সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন, তবে অনেকে বলেছেন যে কয়েকটি নজরুলের এবং সুর করা গানও এতে আছে। বাংলা ভাষায় 'বিদ্যাপতি'-র সঙ্গে হিন্দী ভাষায়ও 'বিদ্যাপতি' নির্মিত হয়। এই ছবিটি অসম্ভব জনপ্রিয় হয় এবং কাহিনিকার এবং সঙ্গীতকার হিসেবে নজরুল হিন্দি ভাষাভাষি দর্শকের কাছে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। এ সম্বন্ধে ১৯৪২ সালের ২রা অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকায় এক খবরে দেখা যায়—'কাননবালা, পাহাড়ী, ছায়া, পৃথ্বিরাজ, কে. সি. দে অভিনীত এবং কবি নজরুলের লেখা কাহিনী ও সঙ্গীত অবলম্বনে নিউ থিয়েটার্সের 'বিষ্ণুপ্রিয়াসের' ছায়াছবি 'বিদ্যাপতি' নিউ সিনেমায় প্রত্যহ ৩টা, ৬টা এবং ৯টায় দেখানো হচ্ছে।' বা ১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর-এর কাগজে—"Greatest of all popular composers whose name is a majic in the world of melody. Songs composed and tuned by Kazi Nazrul Islam."

১৯৩৮ সালে নরেশ মিত্রের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ছবিটি নির্মিত হয়েছিল। প্রযোজক ছিলেন দেবদত্ত ফিল্মস্। কাজী নজরুল ইসলাম এই ছবির সঙ্গে পরিচালকরূপে যুক্ত হয়ে সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। নজরুল এই ছবিতে পাঁচটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন। ১. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, ২. [illegible], ৩. সখি প্রতিদিন হায়, ৪. ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি, ৫. তোমার ডাক এ [illegible]। নজরুল নিজের রচিত "উষা এল চুপি চুপি" গানটিও ব্যবহার করেছিলেন। এই ছবির সঙ্গীত ব্যবহারের অনুমতি পাওয়ার বিষয়ে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটে। নিতাই ঘটকের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় নজরুল বিনা অনুমতিতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন এবং সেইজন্য বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে ছবির অনুমতি বন্ধ হয়েছিল। পরে রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে সুষ্ঠু সমাধান হয়। কিন্তু পরিচালকের তৎকালীন শিক্ষক শৈলজারঞ্জন মজুমদারের

স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যেসবকথা এ সময় পানীয় 'জুলফুরে' মোহ মুকুল হবে' ছবিটি নিয়েই বিতর্ক হয়েছিল। পরে নরেশ মিত্র, শচীন ও নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন এবং রবীন্দ্রনাথ নিজে অনুমোদন দিয়ে সাক্ষর করে দেন।

১৩৪৪-র আশ্বিন (১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) সংখ্যার মাসিক 'বসুমতী'তে প্রকাশিত নজরুলের একটি কবিতা থেকে তৎকালীন চলচ্চিত্র ও সেটি নিয়ে জন-আগ্রহ সম্পর্কে নজরুলের সমালোচনার সুর স্পষ্ট শোনা যায়। কবিতাটির নাম ছিল 'ট্রেড শো'। এখানে পুরো কবিতাটি উদ্ধৃত করা হলো—

"'ট্রেড শো' দেখিতে গেছিনু সেদিন সকালে কলকাতাতে,
সারল' তরুণ 'সরল সরল' চিৎকারি চারিদিকে
ঝাঁপুটি করে ছুটাছুটি দেয় ছুটোছুটি করে সবে,
একটেরে বসি চাই'—বাবা গাড়ী কি এল তবে।
এল রবীন্দ্রনাথ কি, এল কি সুভাষ, জহরলাল!
ঘাঁড়োঘাড়ি করে সারল' তরুণ
ছুটি খুঁজি ঐড়া ধরি সকলন
খুন হয়ে গিয়ে নয়ন অরুণ যেন বন-মাতোয়াল।
এল কি সুভাষ, এল কি জহরলাল?
কোথায় সুভাষ। সুধান হঠাৎ আসে ছায়ানট-নটী
তীব্র জয়রব শাড়ি পরে লাল রেশমি ও বরণটি।
হিন্দু-মুসলমানের এমন মিলন দেখিনি আর,
সিঁড়িওলা আর অফিসের বাবু হয়ে গেছে একাকার।
বিলিতে শাড়িতে কড়াকড়ি হয় হড়াহড়ি পান-বিড়ি,
কোট-প্যান্ট-লুঙি-ধুতি উলাউলি সারা ভুঁড়িওয়ালা সিঁড়ি।
কেহ বলে, "ধীরে যাব যাব এই অনুরাধা টিপ-পায়;
এই যে কি বলে, উনি এস-টি-র নয়াতর আবগোলা।
ভাগ্যক্রমে শাড়ি বিকমিক এই যে অমুক দেবী—
এরোপ্লেনে বসি উঠছি প্রতিমা জানি নিরাভিলি সেবি।"
কলাম-আঙুলিও তুষন কিড-চাপে থাকে চুপ
অভিনয়-থিয়েট-ভার্কী নিরাশ-পরা করকম চুপ
বলে, "ওই ওই পাহাড়ি, দুর্গাদাস, সাইগল ওই,
ওই পঙ্কজ, অমর মল্লিক—দেবকীকুমার কই?
কেহ বলে "বীতশোক ইহারাই অশোককুমারে দেখে,
মনে হয় যাই দূর খোঁজাই আসে ভাব মেখে।"
'অনাথ চিত্রিকা' কোম্পানী প্রতিমা একদম ছুটে আসে,
হায় যে বিদেশ-সন্ধানী, হায় বাঙালির যৌবন!
নিশি অলি হাজারটি প্রেমে পড়িয়াছে জনগণ।
অন্তরে পায় কি ধারা আনন্দ, কথা কোথায় রয়?
নাচিয়ে যা ফুটে ওঠে তা কি এই জীবনের ছায়া।
এই বিকৃতি-কদাকার মুখ এই মরীচিকা মায়া?
পর্দায় দেখি যে-সব পুরুষ নারী যেতা নিরালিনি,
ঘরেতে পায় কি চিনিয়ে পায় কি এরা সব কোন্ মিনি।
ইহাদের বাপ, ইহাদের মা, ইহাদের ভাবভাব

[illegible]

দেখেছ কি কেহ—দেখেছ অন্তরে এক-পায়ে যেন তার।
শহীদ-শালায় ওরা ছুরিয়েছে, আজকালে শিশু বুকে
চিত্র বিচিত্র বাজাইয়ে বাঁশি বাজে যমুনার কূলে।"

লক্ষ্য করার মতো লাইন 'অপর্ণিমায় যা ফুটে ওঠে তা কি এই জীবনের ছায়া।' অর্থাৎ নজরুলের কামনায় ছিল একটি সুস্পষ্ট চিন্তাধারা। আবার এই কবিতায় উল্লেখিত ছায়াছবির জগতের ব্যক্তিদের মধ্যে নিউ থিয়েটার্স-এর পাহাড়ি, দুর্গাদাস, সাইগল, পঙ্কজ, অমর, মল্লিক, দেবকীকুমার এর পরে মুক্তপ্রাপ্ত সাহেব অশোককুমার এসেছেন, এসেছে 'অনাথ চিত্রিকা' গ্রন্থও। তখনকার দিনে ছবির মুক্তির আগে যে 'প্রেস শো' হতো তাকেই 'ট্রেড শো' বলা হয়। নজরুলের চলচ্চিত্রগুলি ছবিটি কলকাতাতে মুক্তি পেয়েছিল। উনি এই ধরনের কোন ছবির 'ট্রেড-শো' দেখে এই কবিতা লিখে থাকবেন। ছবি দেখার উপলক্ষে কবি আবার জনতার চেষ্টা করেছেন, পাশাপাশি দেখিয়েছেন এই ধরনের ছবিগুলিতে চরিত্রগুলি কখনই বাস্তবিক নয়, স্বাভাবিক নয় তাদের কথা-আচরণ-ভাবগুলি।

১৯৩৯ সালে দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায় মুক্তি পায় 'সাপুড়ে' ছবি। এই ছবির কাহিনীকার ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই ছবিতে সাতটি গান রচনা ও সুরারোপ করেন তিনি। তিনি নিজে গানগুলি রেকর্ড করিয়েছিলেন। এই সময়ে কাননবালা তাঁর স্মৃতিকথা 'সবারে আমি নমি' গ্রন্থে বিস্তারে বলেছেন। ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে মুক্তিপায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নন্দিনী ছবিটি'। এই ছবিতে নজরুল একটিমাত্র গান রচনা করেন ও সুরারোপ করেন। গানটি হলো 'চোখ গেল চোখ গেল'—গেয়েছিলেন শচীন দেব বর্মন। পরে এই গানটির সঙ্গে আরো একটি গান 'শাওন রাতে' নিয়ে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী একটি রেকর্ড বার করে।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে মুক্তি ছবি 'চৌরঙ্গী' তে নজরুল সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর নিজের রচিত ৮টি গান এই ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন। 'চৌরঙ্গী' বাংলা ভাষাতেও তৈরী হয়েছিল। বাংলায় নজরুল নিজের ৯টি গান ব্যবহার করেছিলেন তার মধ্যে বিখ্যাত গান—'কথা কুহু-কুহু কুহু কুহু-কুহু' এ কালো। নতুন নতুন সুরের বৈচিত্র্য নজরুলের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় 'দিকশূল' ছবিতে নজরুলের লেখা দুটি গানে সুরারোপ করেন সংগীত পরিচালক পংকজকুমার মল্লিক। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত 'অভিনয় নয়' ছবিতে নজরুলের লেখা একটি গানে সুরারোপ করেন গিরীন চক্রবর্তী। পরিচালক ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪২ সালে নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়ার পর অনেক পরিচালক বিভিন্ন নজরুলের গান ছবিতে ব্যবহার করেছেন। আবার অনেকে নতুনভাবে সুরারোপ করে নিজেদের ইচ্ছামত প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে বাংলা ছবিতে নজরুলের গান ব্যবহারের সংখ্যা [illegible] শুধু উচ্চমান বাণিজ্যিক হিসেবে অনেকেই বিভিন্ন পরিচালক নজরুল সংগীত ব্যবহার করেছেন। ১৯৬১ সালে ঋত্বিককুমার তিনটি প্রতিভার অবদানে সমৃদ্ধ তার '[illegible]' ছবি [illegible] এই ছবিতে শেষ দৃশ্য 'সমাপ্তি'-তে। কে আমাকে পাওয়া [illegible] দিয়ে গেল একা মনে/যামিনী তখন [illegible] গৌরী, গানটি [illegible] হয়েছে। গানটি সমবেত এবং [illegible] মানসিক অবস্থাকে [illegible] করেছে। এখানে গানটির ব্যবহারে অন্য কোনো অর্থ নেই। পরিচালক [illegible] 'ইন্দ্রাণী' [illegible] উপকথা' ছবিতে '[illegible]' [illegible] গানটি ব্যবহার করেছেন। গানটি সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় [illegible] গেয়েছেন। পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রীর [illegible] ছবির সংগীত পরিচালক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি এই ছবিতে নজরুলের [illegible] গান [illegible] হিসেবে ব্যবহার করেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী

শক্তির বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিকদের লড়াইয়ে—'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে'......। পরিচালক [illegible] তাঁর '[illegible]' ছবিতে নজরুলের বিখ্যাত গজল 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে'...ব্যবহার করেছেন। পরিচালক দিলীপ রায় পরিচালিত [illegible] '[illegible]' ছবিতে নজরুলের তিনটি বিখ্যাত গান ব্যবহার হয়েছে। তিনটি গানই গেয়েছেন মান্না দে। গানগুলি হলো (১) শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে (২) যেদিন লব বিদায় (৩) তুমি [illegible] যে মনে। সেলুলয়েডের পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে নজরুলগীতি বেশ কার্যকরী। ১৯৪৮ সালে নির্মল চৌধুরী পরিচালিত 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' ছবিতে নজরুলের দুটি গান—'চল্ চল্ চল্' এবং 'কারার ঐ লৌহ কপাট' ব্যবহার হয়েছে। সংগীত পরিচালক ছিলেন নজরুলের সহকারী কালীপদ সেন। '[illegible]' ছবিতে নজরুলের একটি গান বা গজলিকা ছবিতে [illegible] দেখেছিলেন একাকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ব্যবহার হয়েছে। গানটি হলো—'চোখ গেল চোখ গেল'। পরিচালক নির্মল রায় তাঁর '[illegible]' ছবিতে দুটি নজরুলগীতি ব্যবহার করেছেন। সংগীত পরিচালক ছিলেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। গান দুটি হলো (১) তোমার মহাবিশ্বে প্রভু ও (২) [illegible]। 'আপনজন' ছবিতে সংগীত পরিচালক ব্যবহার করেছেন হৈমন্তী শুক্লার কণ্ঠে। গানটি হলো শূন্য এ বুকে পাখি মোর......'

অর্থাৎ একাধিক পর্যায় বাংলা ছবিতে যে পরিমাণ নজরুলগীতি ব্যবহার হয়েছে তার পরিমাণ অতি সামান্য। নজরুল তাঁর সুস্থ অবস্থায় ১৫টি ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে প্রায় ৫০টিরও বেশি গান রচনা করেন এবং ৭০টিরও বেশি গানে সুরারোপ করেছিলেন। বাংলা ছায়াছবির জগতে গানে ব্যবহারে নজরুল বর্তমানের বন্ধ্যাদশা থেকে মুক্তি আনতে পারেন যদি অসংখ্য গানের ভিতর থেকে বাছাই করে নি প্রয়োজনীয় অপরিচিত গানগুলিকে। দরকার উপযুক্ত সংগীত পরিচালকের।

গান
[বেহাগ মিশ্র - দাদরা]

প্রিয়া পাশে শুনিছিনু গান এলায়ে আঁখি ঘুম ঘোর।
সাথে [illegible] সোনার পালঙ্কে আকাশে উঠিত চাঁদ-চকোর॥
ফিরে বিহগীরা বন-পথ দিয়া
[illegible] চাঁদ আসিবে কোন প্রিয়,
[illegible] বন-কিশোর
[illegible] শ্যাম কিশোর॥

নজরুল-স্মৃতি বিজড়িত কলকাতার বাড়িগুলি

[নজরুল ১৯১৭ সালে প্রথম কলকাতায় আসেন। এরপর ১৯২০ সাল থেকে কলকাতায় নিয়মিত থাকতেন। কর্মসূত্রে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন সময়ে তিনি বাস করেছেন। কলকাতার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, সভায়, আকাশবাণীতে তাঁর অসংখ্য গান গীত হয়েছে। চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য বিভিন্ন স্টুডিও-তে তিনি দিনের পর দিন উপস্থিত থেকেছেন। গান রেকর্ড করতেও তিনি গেছেন বহু কোম্পানীর অফিসে। কলকাতাময় ছড়িয়ে আছে তাঁর স্মৃতি। আমাদের এই প্রতিবেদন আমরা শুধুমাত্র যেসব বাড়িতে তিনি বাস করেছেন এবং সম্পাদিত পত্রিকা প্রকাশ করেছেন সেই বাড়িগুলির একটি তালিকা দেবার চেষ্টা করেছি। সবগুলি বাড়ির অস্তিত্বও বর্তমানে পাওয়া যায় না। সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণীর মাধ্যমে আমরা সেই বাড়িগুলির পরিচয় জানাচ্ছি।

সম্পাদক]

সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে যাবার সময়ে নজরুলের সঙ্গী হয়েছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। আসানসোলে এস. ডি. ও'র কাছ থেকে চিঠি নিয়ে দুজনে কলকাতায় এসে ওঠেন শৈলজানন্দের মামারবাড়ি ৭১ [illegible] স্ট্রিট। সেটা ১৯১৭ সাল।

নজরুলের প্রথম ছাপা লেখা 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী' প্রকাশিত হয় সওগাত পত্রিকার প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যায়। নজরুল তখন থাকতেন করাচিতে। ১৯১৯ সালের মে-জুন মাসে। সওগাত পত্রিকার অফিস তখন ছিল কলকাতার ৮, [illegible] স্ট্রিট।

২, কলেজ স্কোয়ারে 'মোসলেম পাবলিশিং হাউস'। এটাই ছিল 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার প্রকাশক। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথম সংখ্যা থেকেই নজরুলের 'বাঁধনহারা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

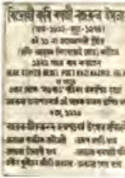

১১, ওয়েলেসলি লেন

৩২, কলেজ স্ট্রিট

নজরুল ইসলামের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর প্রথম যোগাযোগ হয়ে যোগাযোগ হয়েছিল ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে। ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিট তখন ছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'-র অফিস। পরে এখানেই তিনি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর সঙ্গে এক ঘরে বাস করতেন। ১৯২২ সালে এই ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিট থেকেই নজরুল সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে অবশ্য অষ্টম সংখ্যা থেকে পত্রিকার দপ্তর উঠে যায় ৭, প্রতাপ চাটার্জি লেনের ঠিকানায়। এই বাড়িটি ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটের পাশেই। ৭ প্রতাপ চাটার্জি লেনের দোতলার ঘরে ছিল 'ধূমকেতু'-র দপ্তর। সাংবাদিকতায় নজরুলের হাতে খড়ি সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ-এ। ১৯২০ সালের ১২ জুলাই ৬ নম্বর, টার্নার স্ট্রিট (এখন নাম আব্দুর রহমান স্ট্রিট) থেকে এ. কে. ফজলুল হকের মালিকানায় প্রকাশিত হয় নবযুগ পত্রিকা। পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। এই সময়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও নজরুল থাকতেন ৮/৩ টার্নার স্ট্রিটের একটি ঘরে। বর্তমানে বাড়িটির অস্তিত্ব নেই। যেখানে একটি বহুতল বাড়ি হয়েছে।

'বল বীর বল উন্নত মম শির.........' যে কবিতা লিখে নজরুল বিদ্রোহী আখ্যা পেলেন, সেটি লেখা হয়েছিল ৩/৪ সি, তালতলা লেনের একটি বাড়িতে। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে এই তালতলা লেনের বাড়িতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর সঙ্গে একসাথে থাকতেন নজরুল।

৩৭, হ্যারিসন রোডের বাড়িতে ছিল লেবার স্বরাজ পার্টি এবং নজরুল সম্পাদিত লাঙল পত্রিকার দপ্তর। ঐতিহাসিক বাড়িটি 'পূরবী' সিনেমার উল্টোদিকে। লাঙল পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে।

১৯২৭ সালে নজরুল সক্রিয়ভাবে 'গণবাণী' পত্রিকায় যোগ দেন। ২/১, ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন (এখন নাম আবদুল হালিম লেন) ছিল গণবাণী পত্রিকার দপ্তর। নজরুল এখানে নিয়মিত আসতেন। ১১, ওয়েলেসলী রোড-এ (এখন নাম রফি আহ্‌মদ কিদোয়াই রোড) ছিল 'সাপ্তাহিক' সওগাত পত্রিকার দপ্তর। নজরুল ১৯২৯ সালে এখানে কিছুদিন বাস করেছিলেন।

নজরুল অনেকগুলি বাড়িতে বেশ কিছুদিন করে বাস করেছিলেন। ১৯২৮ সালে শিল্পী নলিনীকান্ত সরকারের বাড়িতে ছিলেন। আবার ঐ বছরের শেষদিকে বেশ কিছুদিন ছিলেন এন্টালির ৮/১, পানবাগান লেনের বাড়িতে। ১৯৩৩-৩৪ সালে থাকতেন ৩৯ সীতানাথ রোডের বাড়িতে। ৫এ-বি, হরি ঘোষ স্ট্রিট-এ থাকতেন ১৯৩৮ সাল নাগাদ। ১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রিট-এ থাকতেন ১৯৪৬ সালে। নজরুল দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন ক্রিস্টোফার রোডের বাসভবনে।

৩/৪ সি, তালতলা লেন

"ভায়োলেন্সের ভায়োলিন নাকি আমি......"

[illegible]

[illegible]

দেশাত্মা শক্তি হয়েছেন বিষ্ণু, চিত্তরঞ্জন হয়েছেন এবং অরবিন্দ হয়েছেন। সারা সুরেন্দ্রনাথ হয়েছেন ইন্দ্র, রবি ও কবি লিখতে অসুর অত্যাচারী যে, তিনি "অমৃত দেন মানব-বাঙালির অন্তরাত্মাতে।" এসব উক্তি থেকে, কাজেই, বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উক্তি 'আনন্দময়ীর' কে। বিশেষ এই কবিতার দুটি পংক্তির অন্তরালের কবির কিছু দুঃখ:" আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল/স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাড়াল।/দেবশিশুদের মারছে চাবুক বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি,/ভূ-ভারত আজ কসাই খানা—আসবি কবে সর্বনাশী?/দেব-সেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে,/রণাঙ্গনে নামবে কে আর, তুই না এলে কৃপাণ ধরে।...

নজরুল বিনা যে নিষ্ঠুর সুযোগ—কাজী নীতির বিপরীত এই মতে লিখতে লেগেছেন বলেই নজরুল অভিযুক্তের বিদ্রোহী মানসিকতার পরিচয়। 'যা শত্রু পরে পরে' কবিতায় তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বলছেন: "বাংলা যাদের সূর্য অস্ত যায় না কখনো, অসিম হয়ে/ মেয়ে দেখে যায় [illegible], মনে, মরিবে না কভু মৃত্যু যায়,/তাদের সন্ধ্যা ঐ জনায়!" বুঝবা কবির আহ্বান: "ফাঁস বাঁধ তার গোপনে আগুন,/আগামীর তাপস শত্রুর শকুন,/ যে রাজদ্রোহী, সে যে দস্যু!/ এই জেলা মধ্যে ঘর ছেড়ে দেও,/হোথাই কেন কি ছবি দেখলে?..." অত্যাচারী শাসক সম্প্রদায়কে উৎখাতের এই সব আহ্বান থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কবি হাতিয়ে শান্তির পথিক নন: "বল রে বন্য হিংস্র বীর,/দুঃশাসনের চাই রুধির।

ওরে এনে সেই দুঃশাসন/বিশ্ব শত্রু বীরের নির্যাতন/.....হিন্দোলী দেখে ত্রাসে ১৩টি চারণযুবালি। শত্রু যে পেয়ে দিয়েছি তাই/ বাঁচা পাঁজরাটা ছিঁড়িয়ে যাই। ..." ['দুঃশাসনের রক্ত পান']

নজরুল প্রেমের প্রকার বীর গাছে ভগমি, অভিশাপকারীদের 'সাম্যবাদ' ও 'নারী' বড়ো অন্যায়কে বাস করছে তিনিই লড়েছেন:" কালিদাসের প্রতি দেখ এই অহিংস যোগ কবি নারী/ বাঁচার ক্ষেত্রে মধু আর কিনারা বন্ধুদেরও প্রেমের বীরকে:..." বর্বরতা ও প্রেমের বাণী যে নিষ্ঠুর নজরুল মোক্তারিয়ার কার্যকর নয়, সেখানেও নজরুলই আবার শক্তিশালী ঘোষণা করছেন:" বর্বরতা প্রেমের যদি কলি মরণ উঠে দুখ/নিত্য সাগর তীরে না তোরা মধু কাড়ে, যে ফেনুক/ আজ সাগরে দিলো হাত, শক্তে এসো রেখেই! যদ দিলি হাত, মার দিয়ে যাও অমনি হয়ে কৃপাণ।..." ['বিদ্রোহীর বাণী']. 'সব্যসাচী' কবিতায়ও তাঁর বক্তব্য "হাতে যে কোন, পুরাতন যুগে শান্তির বাণী শনি।" নজরুল প্রতি প্রেমের কথা বলে গেছেন, তাঁদের প্রতি কবির বক্তব্য: "প্রেম আশীষের অন্তরের সব আশায় অমূল্য নহী।" ['প্রেম ও প্রচার']

বাঙালি যে জাতীয়তাবাদীর জন্য একথা নিষ্ঠুর বলতে অত্যন্ত প্রাচীন সেকালের বিবাদ আর ছিল না। ১৯২৮ সালেও কংগ্রেসে গান্ধীর 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' প্রস্তাবের আপোষনী এনে সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তুললে তা ভোটে পরাজয় ঘটেছিল। অথচ এরও ছয় বছর আগে, ১৯২২ সালেই দেখা যায় নজরুল 'ধূমকেতু' পত্রিকায় সারা ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানাচ্ছেন অকুতোভয়ে। কোথা সবাই স্বাধীন, কোথা সবাই রাজা' শিরোনামে এক সম্পাদকীয়তে তিনি লেখেন: "স্বরাজ মানে নিজেই রাজা বা সবাই রাজা, আমি কারুর অধীন নই, অন্যরা কারুর নিয়োগে বা শাসনাধানে অধীন নই।... এর কারণ স্বাধীনতা মানিনা, স্বদেশীয়ও না, বিদেশীয়ও না।..." ['ধূমকেতু পত্রিকা' প্রবন্ধ সংকলিত] তাঁর 'বিদ্রোহীর বাণী' কবিতাটির একটি অংশ দেখা যাক: "আমরা জানি সোজা কথা পূর্ণ স্বাধীন করবো দেশ।/এই দুলালুম বিজয় নিশান মরতে আছি—মরবো শেষ।/নরম গরম পচে গেছে, আমরা নবীন চরম দল/ডুববো না হয় ভাসবো আজি স্বর্গ কিংবা পাতাল তল।" এই কবিতারই আর একটি অংশে "তরুণ চাহে যুগধর্ম/যুক্তিহোম চাই অসুর/তাই না দেখা, তাই কেনা হোক, প্রাণ মাতানো মুক্তি-যুগ/আনন্দমোহের নবযুগ।"

এই স্বদেশ ও আপোষহীন জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা নজরুল তাই স্বাধীনতা লাভের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, গান্ধীর অহিংসনীতিকেও স্বীকার করতে পারেন না: "উহাদের জেল-জোসাগির পথে [illegible] পরিহাস আর হাসি,/ পেলবর বু'দ চরকা-বুদ্ধি পেঁচ, চরকারে ফল জোলা ঘটি।/বাধা ছেঁটে আর ময় নাঘৰ হয় না স্বাধীন আর সকল/বুদ্ধ ছেঁটে আর বল বুদ্ধির জেরা কখনো ওরা নয়।" ['পূজা-অভিনয়'] তাই গান্ধীজীর ইংরেজের বৈপ্লবিক-দৈবিক সংগ্রামের প্রস্তাব গ্রহণ করতে চাইলে নজরুলই নজরুল স্বীয় বাসে দেখেছেন" নিজের প্রাণ জীয়াই মোক্ষ-বান/বাঁধারা তাই জেনেছে কর।/ এই ভিক্ষিয়ে কল পেতে যায়। যেমন শান্তি অহংশর।..." ['ডোমিনিয়ন স্টেটাস']

নিরস্ত্রজাতি অহিংস পন্থায় যে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে না এটা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বলেই বিপ্লবপন্থীদের প্রতি নজরুলের কণ্ঠে ভরসা পাওয়া যায়। বিপ্লবীদের মধ্যেই তিনি বাঙলার যৌবনের শক্তি সম্পর্কে উপলব্ধি দেন অত্যাচারী শাসকদের: "কে রে কে রে বেকসুরীর বৈঠী এ বাঙলায়?/ যেন দেখে কৃপেয়, দেশমিত্র' প্রকাশের আর?/ দেখে বাঙালি মান, দেশনিত্য' বাঙলার যৌবন,/অভিভাবিত্তির বাহ্ন যৌবনে দুখ ভবন?/....তাহারই অন্তর-পাষাণ টুটিয়া শক্তিতে অগ্নিশিখা,/ যে জাগে তাহার অক্ষুণ্ণিত তাই কি শক্তি অমর শিখা।..." ['আত্মনির্ভর বাঙলার যৌবন']

এই জাতারই অত্যাচারী শাসকদের যারা ফাঁসিতে দিয়েছিলেন, বৃটিশ শাসনের জেলখানায় ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে যারা তরুণদের আত্মবলি দিয়েও বিপ্লববাদী দলে দেশমাতৃকার একান্তের গহনা সাজিয়েছেন, সেই বিপ্লবীদের জীবনাদর্শ চমৎকার ফুটিয়ে নজরুলের কবিতায়: "নহি মোরা ভীরু সংসারী/বাঁধিনা আমরা ঘর বাড়ি।/ দিয়াছি জোয়ার ঘরের সুখ,/ আমাদের তরে খোলা বুক,/ আমার তরে খোলা ডিঙ্গা/ অমরাই অন্তর পথিকের পথ।/ আমাদের তরে সন্ধ্যানীল/ আমাদের অন্তরে দীন/ আমাদের জলোচ্ছ্বাসপানি,/ আমাদের তরে বীর বাণী।..." ['দুঃশাসনের রক্ত পান'] এদের উদ্দেশে নজরুল-কণ্ঠে শুর দিয়েছি এসেছে: "বাঁশির মতো শব্দতে থেকে ইশারা যে ডিকানো/তরিয়াছে তেরা চলিবে না এই উৎপীড়নের মেলা?" ['অত্যাচারী']

ভারতের বুক থেকে বৃটিশ শাসন উৎখাত করতে যারা অস্ত্র ধরেছিলেন, [illegible] নজরুলের জুড়ি নেই। 'আত্মশক্তি' [illegible] পত্রিকায় "নিয়ম [illegible]-বিধি-নিষেধের প্রাচীরে" [illegible] "বিদ্রোহিনী কবিতা বাণী"র কথা। বাঙলার ঋষিযুগের কিছু নায়ক ও কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে 'সাবধানী ঘণ্টা' কবিতায়, যেমন গোপীনাথ সাহার ফাঁসি, [illegible] [illegible] এখানে [illegible] তিনি [illegible] "বাঙলার [illegible]" [illegible] ও এই সব বিপ্লবপ্রচেষ্টা [illegible] প্রকাশ করেছেন। কবি তাঁর [illegible] [illegible] বাঙলার প্রথম বিপ্লবী [illegible] 'বাঙলার [illegible]' [illegible]" [illegible]। বিপ্লবী [illegible] [illegible] উল্লেখ আছে [illegible] [illegible] 'ইন্দ্রপতন' কবিতায় :" [illegible] [illegible] [illegible]। 'নজরুলের দু'টি কবিতার কথা এখানে স্মরণ করা যায়, যা [illegible] বাঙলার দুই বিপ্লবী [illegible] নিয়ে রচিত। [illegible] [illegible] বিরুদ্ধে যারা [illegible] [illegible] তিনি লেখেন :" [illegible] [illegible] [illegible]—/ [illegible] [illegible] প্রাণ দিয়ে [illegible]" ('[illegible]')। [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible]। সেই বিপ্লবী [illegible] নজরুল শ্রদ্ধা জানান "[illegible] বিপ্লবী [illegible]" বলে। কবি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন কি :" "[illegible] [illegible] প্রাণ দিয়ে গেলে তুমি [illegible]/ [illegible] [illegible] প্রাণ [illegible]— [illegible], [illegible] [illegible]/ — [illegible] [illegible]/ [illegible] [illegible] [illegible] ..." ('[illegible]')

বিপ্লবীদের প্রতি [illegible] সহানুভূতির কথা নজরুল [illegible] করেছেন। তাঁর [illegible], সেই যুগে বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর [illegible] [illegible] :- "[illegible] [illegible] [illegible]/তুমি ছিলে এই [illegible] [illegible] [illegible] ...তোমার [illegible] [illegible] এল হৃদ।/ [illegible] [illegible] [illegible]/ [illegible] [illegible] [illegible]/ [illegible] [illegible] [illegible] সূত্রে।" ('[illegible]') গোপীনাথ সাহা [illegible] এক বিপ্লবীযুবক এক [illegible] খুন করে ফাঁসির মঞ্চে আত্মবলি দেন ও [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] চিত্তরঞ্জন দাশ [illegible] করেছিলেন ও গোপীনাথের [illegible] কথা আরও স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জনের [illegible] ঐ কবিতায় কবি এ [illegible] ও উল্লেখ করেছেন :-" তুমি [illegible] [illegible] গোপীদের [illegible] [illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।" ('ঐ')

নজরুল-রচিত এই 'জাগনিক'র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁদের [illegible] আত্মবলি দিয়েছিলেন, সে কথা আমরা জানি। নজরুল এই বিপ্লবীদের [illegible] ছবি এঁকেছিলেন [illegible] এক [illegible]। '[illegible]' পত্রিকায় প্রকাশিত এই লেখায় তিনি দেখিয়েছেন এই সব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ..."

"আজো দেখলুম, কলকাতার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কলকাতায় [illegible] [illegible]। [illegible]।" ('[illegible]' / [illegible] [illegible])

বাঙলার [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] নজরুলের কবিতায়। নজরুল যে [illegible] [illegible]-[illegible], তাতে সন্দেহ নেই, [illegible] [illegible] মুক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] প্রতি তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভিব্যক্তি পেয়েছে।

নজরুল জীবনপঞ্জী

জন্ম : জ্যৈষ্ঠ ১১, ১৩০৬, (মে ২৪, ১৮৯৯ খ্রী।) মঙ্গলবার। বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম : দুখু মিয়া। পিতা : কাজী ফকির আহমদ, পিতামহ : কাজী আমিনুল্লাহ, মাতা : জাহেদা খাতুন, [illegible] কাজী।

* গ্রামের মক্তবে লেখাপড়ার প্রথম হাতে খড়ি। এখান থেকে ১৩১৬ সালে (খ্রী: ১৯০৯) নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করে এক বছর শিক্ষকতা করে মক্তব চালিয়েছেন। [illegible] ও [illegible] সঙ্গে পরিচয় এ সময়েই।

* কবির [illegible] বয়সে চৈত্র ৭, ১৩১৪ সালে পিতার মৃত্যু। পরিবারের লোক দারিদ্র্য হেতু ১১/১২ বছর বয়সে লেটোর দলে ভিড়ে পরে এখানে প্রধান [illegible] হয়ে উঠেছেন। নজরুলের রচনাবলীর [illegible] শকুনিবধ, চাষার সং, রাজপুত্র [illegible] ইত্যাদি পালাগান। ১৩১৭ সালে আসানসোলের [illegible] কাছে একটি রুটির দোকানে কাজ করেন।

* প্রথম স্কুল— বর্ধমান জেলার [illegible] হাইস্কুলে। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তখন ঐ স্কুলের হেডমাস্টার। ১৯১১ তে নজরুল এখানে ষষ্ঠশ্রেণিতে পড়তেন। দ্বিতীয় স্কুল— ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর হাইস্কুল। তৃতীয় স্কুল— বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুল। ১৯১৫ জানুয়ারিতে এই স্কুলে ৮ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। [illegible] খাঁ, রাজবাড়ী থেকে মাসিক সাত টাকা বৃত্তি। কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

* কর্মক্ষেত্র : ১৩২৪ সালে (১৯১৭ খ্রী:) নজরুল যখন প্রিটেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছেন তখন ৪৯নং বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়ে সৈনিকরূপে করাচী চলে গেলেন। ১৯১৭-১৯১৯—নজরুলের সৈনিক জীবন কেটেছে করাচী সেনানিবাসে। সৈনিক বিভাগে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সাধারণ সৈনিক থেকে 'হাবিলদার' পদে উন্নীত হন ও কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার রূপে সৈন্যদলের রসদ ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধানের ভার পেয়েছিলেন। সেনানিবাসেও নজরুল কাব্য চর্চা ও [illegible] অব্যাহত রেখেছিলেন। 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' [illegible] পেয়েছিলেন। পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের কাছে ফারসী কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্য পড়ে ফেলেন।

* প্রথম প্রকাশিত রচনা : বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আত্মপ্রকাশ গদ্যের মাধ্যমে। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' তাঁর প্রথম রচনা সওগাত পত্রিকায়, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ (১৯১৯) সালে প্রকাশিত।

* প্রথম প্রকাশিত কবিতা : 'মুক্তি' ১৩২৬ এর শ্রাবণ সংখ্যায় (১৯১৯) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত।

* প্রথম প্রকাশিত গল্প : 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' ১৩২৬-এর কার্তিক সংখ্যায় 'সওগাত'-এ প্রকাশিত।

* ১৩২৫ সালেই কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে চিঠিপত্রের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১৩২৬ সালের শ্রাবণ থেকে ১৩২৮ সালের মাঘ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে—মুক্তি, হেনা, ব্যথার দান, [illegible] ইত্যাদি, [illegible] বিজয় গান, [illegible] প্রভৃতি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়।

* ১৩২৬ মাঘ সংখ্যা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা [illegible] নজরুল ইসলাম পল্টন হতে [illegible] কলকাতা ও [illegible] জানেন। এ সময়েই মুজফ্‌ফর আহমেদের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

* ১৩২৬ ফাল্গুন চৈত্র (১৯২০ মার্চ-এপ্রিল) নজরুল যে বাহিনীতে ছিলেন সেটি যুদ্ধের পর ভেঙে দেওয়া হ'ল। নজরুল ফিরে এলেন কলকাতার ৩২নং কলেজ স্ট্রিট সাহিত্য সমিতির বাড়িতে। [illegible] ইন্টারভিউর জন্য গেলেন বর্ধমানে। মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁকে সরকারী চাকরী করতে নিষেধ করলেন।

* ১৩২৭ সালের বৈশাখ থেকে কাজী নজরুল ইসলাম 'মোসলেম ভারতে' লিখতে আরম্ভ করেন। প্রথম সংখ্যায় তাঁর পত্র উপন্যাস 'বাঁধন হারা' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়—[illegible], খেয়াপারের তরণী, [illegible], কোরবানী, মোহররম, ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম, [illegible]-ই-হাফিজ, [illegible] ও বিদ্রোহী।

* ১৯২০ সালের মে মাসে মি: এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের অর্থানুকূল্যে মুজফ্‌ফর আহমদ ও নজরুল ইসলামের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নবযুগ'। ব্রিটিশ সরকার 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করে।

* ১৯২০ আগস্ট-সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪১ ডিসেম্বর নজরুল ও মোহিতলালের বন্ধুত্ব।

* ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে নজরুল ইসলাম আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা চলে যান।

* ১৯২২ মে, নজরুল কুমিল্লা থেকে কলকাতায় ফিরে 'সেবক' দৈনিক পত্রিকায় যোগদান করেন।

* ১৯২২, ১২ই আগস্ট, নজরুল ইসলাম "ধূমকেতু" পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'ধূমকেতু'র জন্য রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী দেন। "ধূমকেতু" [illegible] সচিত্র, চার পৃষ্ঠা কাগজ, দাম এক আনা। ১৯২২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নজরুলের আনন্দময়ীর আগমনে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হবার পরে তিনি রাজদ্রোহে [illegible]

ড়া এবং তাঁর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন।

* ১৯২২ অক্টোবর, 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত।

* ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর নজরুল বহরমপুর জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। (হুগলী জেলে বন্দী অবস্থায় রাজবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে নজরুল তাঁর রাজনৈতিক সহ বন্দীদের সাথে নিয়ে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ শিলং হতে টেলিগ্রাম করলেন। অনশন ত্যাগ কর, আমাদের সাহিত্য তোমার দাবী করে। প্রেসিডেন্সী জেলের ঠিকানা থেকে টেলিগ্রামটি ফেরত যায়। অনশনের ৩৯ দিন পরে কুমিল্লা থেকে শ্রীযুক্ত বিরজাসুন্দরী দেবী এসে নজরুলের অনশন ভাঙালেন। এরপর নজরুল বহরমপুর জেলে বন্দী হন।)

* ১৯২৪, ২৪শে এপ্রিল, কলকাতায় কুমিল্লার শ্রীমতী গিরিবালা সেনগুপ্তার কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তার সাথে নজরুলের বিবাহ।

* ১৯২৪ সালে হুগলীতে প্রথম গান্ধীজির সাথে নজরুলের মুখোমুখি পরিচয়, গান ও কবিতা রচনা এই উপলক্ষে।

* ১৯২৫, নভেম্বর, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত লেবার স্বরাজ পার্টি গঠিত হয়—চারজন উদ্যোক্তার মধ্যে নজরুল একজন। এই পার্টির মুখপত্র "লাঙল"।

* ১৯২৫, ২৫শে ডিসেম্বর, সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকার প্রকাশ—প্রধান পরিচালক নজরুল। প্রথম সংখ্যায় "সাম্যবাদী" কবিতা প্রকাশিত।

* ১৯২৬, ৩রা জানুয়ারি। নজরুল সপরিবারে কৃষ্ণনগরে যান।

১৯২৬, ৬ই-৭ই ফেব্রুয়ারি, কৃষ্ণনগরে নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধন সঙ্গীত নজরুল ইসলামের "কৃষাণের গান"।

১৯২৬ সালে সমগ্র বাংলাদেশে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চরম রূপ নেয়। বিচলিত নজরুল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের জনসভায় বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন—উদ্বোধন সংগীত "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার" রচনা করেন। ছাত্র সম্মেলনের উদ্বোধন সংগীত—"ছাত্রদলের গান"।

* ১৩৩৩, শ্রাবণ, 'লাঙল' পত্রিকার নাম বদলে রাখা হয় 'গণবাণী'। সম্পাদক মুজফ্ফর আহ্‌মদ।

১৩৩৪, বৈশাখ, নজরুল কর্তৃক অনূদিত "আন্তর্জাতিক সংগীত" 'গণবাণী' ২১শে এপ্রিল, ১৯২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত। ১৩৩৪, আষাঢ়, "সওগাত" পত্রিকা প্রকাশ। নজরুল সক্রিয়ভাবে এই পত্রিকায় যোগদান করেন।

* ১৯২৬, ৯ই অক্টোবর। পুত্র বুলবুলের জন্ম। এই বছরেই নজরুল ইসলাম কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ান ও হেরে যান।

* ১৩৩৫, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ। নজরুলের মা মারা যান।

* ১৩৩৫, অঘ্রাণ, রংপুরে বিপুলভাবে নজরুল সম্বর্ধনা।

১৩৩৫, পৌষ মাসের শেষে নজরুল সপরিবারে কলকাতায় চলে এলেন। কৃষ্ণনগরে নজরুল ইসলাম অত্যন্ত আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটান।

*১৩৩৪ সালের ৬ই এবং ৭ই পৌষ, কলকাতার এলবার্ট হলে "নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলে"র সম্মেলনে নজরুল। ১৩ই পৌষ কলকাতায় অনুষ্ঠিত "নিখিল ভারত সোশিয়ালিস্ট যুব কংগ্রেসের" অধিবেশনে নজরুলের যোগদান। তিনি এই সম্মেলনে উদ্বোধনী গান পরিবেশন করেন। এক সপ্তাহ পরে চট্টগ্রামে সম্বর্ধনা ও উৎসবে যোগদান করেন

১৩৩৪, ফাল্গুন, কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে নজরুলকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁর এসব সফরের বিবরণ সাপ্তাহিক সওগাতে নিয়মিত প্রকাশিত হতো "নজরুলিস্তান" নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে।

* ১৯২৯, ডিসেম্বর, ১৩৩৬ অঘ্রাণ, কলকাতার এলবার্ট হলে জাতির পক্ষ থেকে নজরুলকে সম্বর্ধনা।

* ১৯৩০, ৭ই মে (১৩৩৭, ২৪শে বৈশাখ) বসন্ত রোগে কবিপুত্র বুলবুল মারা যায়।

(১৯২৯ সালের কলকাতায় উস্তাদ জমীরুদ্দীন খানের কাছে গানের শিক্ষা নিয়েছিলেন নজরুল। ১৯৩২ সেপ্টেম্বর, উস্তাদ জমীরুদ্দীনকে "বনগীতি" উৎসর্গ করেন।

* ১৯৩১ সেপ্টেম্বর "অগ্নিবীণার" স্বত্ব বিক্রয় করে নজরুল চার সিলিন্ডার ক্রাইসলার গাড়ি কেনেন।

* ১৯৩২, ৫ই ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মিলনের অধিবেশনে নজরুল সভাপতি হিসাবে 'যৌবনের গান' অভিভাষণটি পাঠ করেন।

* ১৯৩৬–৩৭ নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীর গানের ট্রেনার ও হেড কম্পোজার। এই সময় কমরেড মুজফ্ফর আহ্‌মদকে তিনি জানান যে তাঁর গানের সংখ্যা তখনই "প্রায় তিন হাজার"।

(১৯৩৯ নজরুল তাঁর অন্যান্য পুস্তকের গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গাওয়া তাঁর সমস্ত গানের রয়ালটি কলকাতা হাইকোর্টের এটর্নি শ্রীমন্মথকুমার সেনের কাছে চার হাজার টাকার জন্য বন্ধক রেখেছিলেন। এই সময় কবিপত্নী প্রমীলা পক্ষাঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

* ১৯৪০, অক্টোবর, এ. কে. ফজলুল হক "দৈনিক নবযুগ" বের করেন—নজরুলকে প্রধান সম্পাদক করা হয়।

* ১৯৪২, ৯ই ফেব্রুয়ারি, চিত্রা কাহিনীচিত্রের আগমন উপলক্ষে নজরুল গান রচনা করেন। সুরশিল্পী চিত্তরঞ্জন মিত্র প্রমুখের কণ্ঠে সেগুলি গাওয়া হয়েছিল।

* ১৯৪২, ১০ই জুলাই, নজরুলের অসুখ সকলের নিকট ধরা পড়ে। অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা স্টেশনে বলতে গিয়ে নজরুল কিছুতেই বলতে পারছিলেন না। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কবি অসুস্থ। কবির মূল রোগ ছিল পিকস ডিজিজ (Picks Disease)। ইহা মস্তিষ্কের এক ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি। ডাক্তার ব্যাসেল ব্রেন, ডাক্তার উইলিয়াম স্যারগান্ট ও ডাক্তার ম্যাককিসক-এর মতো প্রসিদ্ধ ডাক্তাররা কবিকে নিয়ে চিন্তিত হয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রাথমিক চিকিৎসা যথাযথ অবহেলিত ও অসম্পূর্ণ হয়েছে।

* ১৯৪৫ খ্রীঃ (বাংলা ১৩৫২সালে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে "জগত্তারিণী স্বর্ণপদক" প্রদান করে।

* ১৯৪৭, অক্টোবর, গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ হন।

* ১৯৫২ খ্রীঃ (১৩৫৯ সাল) জুনে, "নজরুল সাহায্য কমিটি" গঠিত হয়।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্ট ও কোষাধ্যক্ষ, সজনীকান্ত দাস ও জুলফিকার হায়দার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর গঠিত হল "নজরুল এইড ফান্ড।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবিকে মাসিক দুশ টাকা হিসাবে সাহিত্যিক বৃত্তি মঞ্জুর করেন। অতুল গুপ্তের সভাপতিত্বে "নজরুল নিরাময় সমিতি" গঠিত হল।

১৯৫২ খ্রী, ২৫ জুলাই সস্ত্রীক কবিকে পাঠানো হয় রাঁচিতে। চার মাস পরে কলকাতা ফিরে আসেন।

* ১৯৫৩, মে, সস্ত্রীক কবিকে লন্ডনে পাঠানো হয়। ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনায় আনা হয়। সব চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়। ১৪ই ডিসেম্বর নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন। লন্ডনের ও ভিয়েনার ডাক্তারদের রিপোর্ট সোভিয়েত দেশের ডাক্তারদের পাঠানো হয়েছিল। তারা রিপোর্টগুলি অধ্যয়ন করে তাদের কমিউনিস্ট পার্টির সদর দফতরের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে কবি নজরুল ইসলামের জন্য সোভিয়েতের চিকিৎসকদের আর কিছুই করণীয় নেই।

১৯৬০ খ্রীঃ (১৩৬৭সাল) ভারত সরকার কবিকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন।

* ১৯৬২, ৩০শে জুন (১৩৬৯ সাল) কবি পত্নী প্রমীলা নজরুলের মৃত্যু হয়। নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়ায় প্রমীলা নজরুলের কবর দেওয়া হয়।

* ১৯৬৮ (১৩৭৫ সালের ১১ই চৈত্র) কলকাতায় পৌরসভার সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

* ১৯৬৯ (১৩৭৬ সালে) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি প্রদান করেন। এই বছরেই পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহী কবিকে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেখালেন। কবির বসবাসের জন্য জমি ও গৃহ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়। সরকারের তরফ থেকে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ।

* ১৯৭২, ২৪শে মে (১৩৭৯সালের ১০জ্যৈষ্ঠ) বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে কবি ঢাকায় যান। বাংলাদেশ সরকার কবির ভরণপোষণের যাবতীয় ব্যয় বহন করেন। ঢাকায় কবিকে অসংখ্য সম্বর্ধনা জানানো হয়। ১৯৭৪, ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমী আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে তিনি ছিলেন এক বিশেষ অতিথি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য "ডি.লিট" উপাধি দেন। ১৯৭৬, ২১শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে রাষ্ট্রীয়ভাবে "২১শে পদকে" সম্মানিত করা হয়। ১৯৭৬, ২০শে ফেব্রুয়ারি কবি নজরুলকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির স্বীকৃতিদান।

* ১৯৭৬, ২৯শে আগস্ট (১৩৮৩, ১২ই ভাদ্র) বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় কবির জীবনাবসান হয়। সেখানে কবিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

নজরুল-গ্রন্থপঞ্জী

কবিতা

অগ্নিবীণা ॥ প্রথম প্রকাশ—কার্তিক, ১৩২৯ সাল (১৯২২)। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৩৩ সাল (১৯২৬)।

দোলন-চাঁপা ॥ প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৩০ সাল (১৯২৩)

বিষের বাঁশী ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল (১৯২৪)। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫২ সাল (১৯৪৫)।

(৪) ভাঙার গান ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল (১৯২৪)। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।

(৫) ছায়ানট ॥ গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই সম্ভবত প্রথম প্রকাশ—১৩৩২ সাল (১৯২৫)।

পূবের হাওয়া ॥ প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৩২ সাল (১৯২৫)।

সাম্যবাদী ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩২ সাল (ডিসেম্বর, ১৯২৫)।

চিত্তনামা ॥ প্রথম প্রকাশ—সম্ভবত শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল (১৯২৫)।

(৯) সর্বহারা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৩ সাল (১৯২৬)।

(১০) ফণি-মনসা ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল (১৯২৭)।

(১১) সিন্ধু-হিন্দোল ॥ গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। সম্ভবত প্রথম প্রকাশ—১৩৩৪ সাল (১৯২৭)।

(১২) জিঞ্জীর ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৫ সাল (১৯২৮)।

(১৩) সঞ্চিতা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৫ সাল (১৯২৮)। 'অগ্নিবীণা', 'ঝিঙেফুল', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা', 'ছায়ানট', 'দোলনচাঁপা', 'সিন্ধু-হিন্দোল' ও 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে কবিতা বাছাই করে বর্মন পাবলিশিং হাউস প্রথমে 'সঞ্চিতা'র একটি সংস্করণ বের করেন (২রা অক্টোবর, ১৯২৮)। ঐ বৎসরেরই ১৩ই অক্টোবর তারিখে ডি এম লাইব্রেরী কর্তৃক 'সঞ্চিতা'র যে অপর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে উক্ত কাব্যগ্রন্থগুলি ছাড়াও 'জিঞ্জীর' ও 'বুলবুল' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা স্থান পায়। ঐ সংস্করণটিই এখন বাজারে চলছে এবং এতে অন্য কয়েকটি গ্রন্থের কবিতা সংযুক্ত হয়েছে।

(১৪) চক্রবাক ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৬ সাল (১৯২৯)।

(১৫) সন্ধ্যা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৬ সাল (১৯২৯)।

(১৬) প্রলয়-শিখা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৬ সাল (১৯৪৯)।

(১৭) নতুন চাঁদ ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।

(১৮) সঞ্চয়ন ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৬২ সাল (১৯৫৫)।

(১৯) মরু-ভাস্কর ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৬৪ সাল (১৯৫৭)।

শেষ সওগাত ॥ প্রথম প্রকাশ—২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৫ সাল (১৯৫৮)।

(২১) ঝড় ॥ প্রথম প্রকাশ—১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ সাল (১৯৬০)।

কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ

(১) রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ ॥ প্রথম প্রকাশ—১লা আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল (১৯৩০)।

(২) কাব্যে আমপারা ॥ প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ সাল (১৯৩৩)।

(৩) রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ছোটদের কবিতা

(১) ঝিঙেফুল ॥ গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। সম্ভবত প্রথম প্রকাশ—১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ।

(২) সাতভাই চম্পা ॥ প্রকাশকাল জানা যায় না।

উপন্যাস

(১) বাঁধনহারা ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল (১৯২৭)।

(২) মৃত্যু-ক্ষুধা ॥ প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৩৬ সাল (১৯৩০)।

(৩) কুহেলিকা ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩৮ সাল (জুলাই, ১৯৩১)।

গল্প

(১) ব্যথার দান ।। প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল (১৯২২)।
(২) রিক্তের বেদন ।। প্রথম প্রকাশ—১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ।
(৩) শিউলি-মালা ।। প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ।

নাটক

(১) ঝিলিমিলি ।। প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ।
(২) আলেয়া ।। গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। সম্ভবত প্রথম প্রকাশ—১৩৩৮ সাল (১৯৩১)।
(৩) মধুমালা ।। প্রথম প্রকাশ—১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ছোটদের নাটক

(১) পুতুলের বিয়ে ।। গ্রন্থে প্রকাশকাল লেখা নেই।

প্রবন্ধ

(১) যুগবাণী ।। প্রথম প্রকাশ—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সাল (১৯৪৯)।
রাজবন্দীর জবানবন্দী ।। প্রথম প্রকাশ—১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ।
রুদ্রমঙ্গল ।। গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই।
দুর্দিনের যাত্রী ।। গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। সম্ভবত প্রথম প্রকাশ—১৩৩৩ সাল (১৯২৬)।
(৫) ধূমকেতু ।। প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ (১৯৬০)।

সম্পাদিত পত্রিকা

(১) নবযুগ ।। প্রথম প্রকাশ—১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি।
(২) ধূমকেতু ।। প্রথম প্রকাশ—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট।

পরিচালিত পত্রিকা

(১) লাঙল ।। প্রথম প্রকাশ—২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ। সাপ্তাহিক 'লাঙল' এর কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর তার নাম পরিবর্তন করে 'গণবাণী' রাখা। 'গণবাণী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে।

সঙ্গীত-গ্রন্থাবলী

(১) বুলবুল (প্রথম খণ্ড) প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৩৫ সাল (১৯২৮)।
(২) চোখের চাতক ।। প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ সাল (১৯২৯)।

(৩) চন্দ্রবিন্দু ।। প্রথম সংস্করণ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৫২ সাল (১৯৪৬)।
(৪) নজরুল-গীতিকা ।। প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৩৭ সাল (১৯৩০)।
(৫) নজরুল-স্বরলিপি ।। প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩৮ সাল (১৯৩১)।
(৬) সুরসাকী ।। প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৩৮ সাল (১৯৩১)।
(৭) জুলফিকার ।। প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৩৯ সাল (১৯৩২)।
(৮) বন-গীতি ।। প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৩৯ সাল (১৯৩২)।
(৯) গুলবাগিচা ।। প্রথম প্রকাশ—১৩৪০ সাল (১৯৩৩)।
(১০) গীতি-শতদল ।। প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৪১ সাল (১৯৩৪)।
(১১) সুরলিপি ।। গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। সম্ভবত প্রথম প্রকাশ—১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।
(১২) সুর-মুকুর ।। প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৪১ সাল (১৯৩৪)।
(১৩) গানের মালা ।। প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।
(১৪) বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড) ।। প্রথম প্রকাশ—১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ সাল (১৯৫২)

রুচিশীল ও মনের মত বিভিন্ন স্বাদের বই পেতে হলে কলকাতা পৌরসংস্থার প্রকাশিত বই পড়ুন ও পড়ান

ছোটদের জন্য

আমাদের বিদ্যাসাগর

আমাদের সুভাষচন্দ্র

সাধারণের জন্য

মুক্তির সংগ্রাম ও কলকাতার পার্ক

C. V. Raman Birth Centenary Issue

Anthology Number 1924-1947

Netaji Birthday Com. Vol. Cent. eve-tribute

C. M. Gazette-Netaji Centenary Issue

Mayors of Calcutta

Calcutta-a Glimpse

Calcutta-a set of Pictures

Calcutta at a Glance

C. M. C. Year Book

Compendium on Assessment & Collection

Building Permit Manual

কলকাতা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে পুরতথ্যসমৃদ্ধ পুরশ্রী নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

উল্লিখিত বইগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং
রেকর্ড বিভাগের কাউন্টারে সারা বছর পাবেন।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
১, হগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০ ০৮৭

সামান্য কিছু সতর্কতা

ম্যালেরিয়া

তাড়াতে পারে

- জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করান ও পুরোমাত্রায় ওষুধ খান
- ম্যালেরিয়ার মশা কেবল পরিষ্কার জলে জন্মায়—খোলা চৌবাচ্চা, হাঁড়ি-কলসি বা ড্রামে ধরা জল সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন পরিষ্কার করুন
- বর্ষার জল বাড়ির ছাদে বা আনাচে-কানাচে জমতে দেবেন না
- জলের ট্যাঙ্ক ঢেকে রাখুন যাতে মশা ঢুকতে না পারে
- শোয়ার সময় অবশ্যই মশারি টাঙান

।। ম্যালেরিয়া জীবন নেয়   সাবধানের মার নেই ।।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসভা

কলকাতা

পুরশ্রী

বনফুল সংখ্যা

নাগরিক পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে বকেয়া কর অবিলম্বে মিটিয়ে দিন

জলই জীবন—এর অপচয় রোধে সক্রিয় সহযোগিতা করুন

আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক সময়ে ফেলুন

কলকাতা আমার—আপনার। এর ঐতিহ্য বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের সবারই

কলিকাতা পৌরসংস্থা

কলকাতা
পুরশ্রী

৬-৭ সংখ্যা ❑ ২২ বর্ষ ❑ ২৬ অক্টোবর, ১৯৯৯

বনফুল সংখ্যা

বনফুল শুধু সৌন্দর্য, প্রেম, কল্পনা এবং রোমান্সের জগতেই বিচরণ করেননি, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেও তিনি অনেক কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখেছেন।

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়
বনফুল প্রসঙ্গে ● অন্নদাশঙ্কর রায় ৪
শরৎচন্দ্রের আলোয় বনফুল ● ড. সত্যব্রতমোহন মিত্র
বনফুলের ছোটগল্প ● উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ১৭
'বনফুল' ও কলকাতা ● শান্তিশঙ্কর দাশগুপ্ত ১৯
বনফুলের নাটক : একটি রূপরেখা ● বিজয়কুমার দাস
অগ্নীশ্বর ● অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ৪১
পরলোকে বনফুল : বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের অবসান
বনফুল পরিচিতি ● তরুণকুমার দাস ৫৬
বনফুলের গ্রন্থপঞ্জী ও বিভিন্ন কাহিনীর চলচ্চিত্র
বৃন্দাবন পত্রী ● চিত্রা মুখোপাধ্যায় ৫৮

সহ-সম্পাদক প্রশান্ত সেনগুপ্ত
সহযোগী অরুণকুমার রায় ও
গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়
মূল্য ৮ টাকা

সম্পাদক : অমলেন্দু ভট্টাচার্য

কলিকাতা পৌরসংস্থার বাংলা মুখপত্র পুরশ্রী, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, ১ হগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিংস (৪র্থ তল), কলকাতা-৭০০ ০৮৭ হইতে প্রকাশিত এবং বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ হইতে মুদ্রিত।

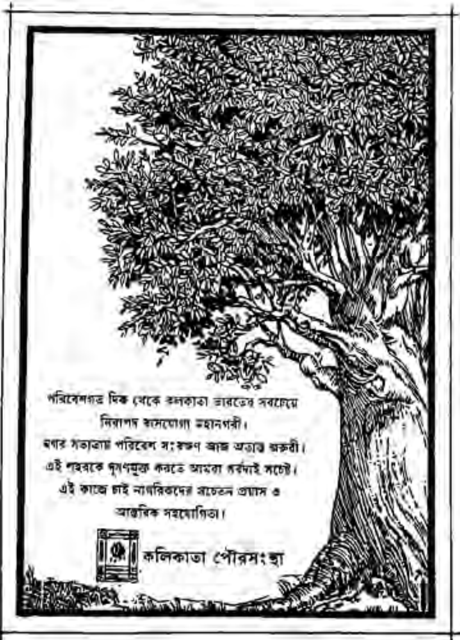
পরিবেশগত দিক থেকে কলকাতা ভারতের সবচেয়ে
নিরাপদ বাসযোগ্য মহানগরী।
নগর সভ্যতায় পরিবেশ সংরক্ষণ আজ অত্যন্ত জরুরী।
এই শহরকে দূষণমুক্ত করতে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট।
এই কাজে চাই নাগরিকদের সচেতন প্রয়াস ও
আন্তরিক সহযোগিতা।
কলিকাতা পৌরসংস্থা

সম্পাদকীয়

ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যিক 'বনফুল' হিসেবেই অধিক পরিচিত। বাহ্যিক দেহগত রোগের চিকিৎসার চেয়ে মানুষের মনোজগতের বিশ্লেষণে ব্যস্ত এই লেখক বাংলা সাহিত্যে নিজের অনন্য আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। ছোটগল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ—সাহিত্যের সমস্ত শাখায় তিনি অবাধ বিচরণ করেছেন। চিত্রশিল্পী হিসেবেও তিনি খ্যাতি পেয়েছেন।

কলকাতা শহর, সাহিত্যিক বনফুলের শুধুমাত্র প্রিয় শহরই নয়, তাঁর সাহিত্যেরও অন্যতম উপাদান হয়ে উঠেছে। একটি লেখায় সেই বিষয়কে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

শতবর্ষে উপনীত বৈচিত্র্যময় এই সাহিত্যিককে ঘিরে আমাদের এই বিশেষ সংখ্যা। লেখাপত্রের ব্যাপারে আমরা সাহিত্যিকের ভ্রাতুষ্পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা কৃতজ্ঞ 'কোরক' ও 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার কাছেও। অতীতের 'পুরশ্রী' থেকে দুটি প্রয়োজনীয় লেখা সংযোজিত করা হল।

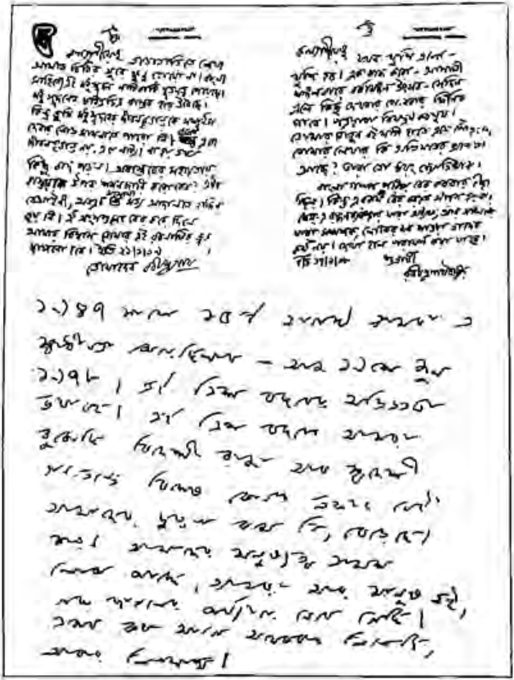

বনফুল প্রসঙ্গে

অন্নদাশঙ্কর রায়

তিনি ছিলেন এসেনশিয়ালি স্টোরি-টেলার। গল্পলেখক। ছোটগল্পেই তাঁর কৃতিত্ব বেশি। এ রকম ছোটগল্প আর কেউ লিখতে পারতেন না। যে কোন বিষয় নিয়ে যে কোন আকারে যে কোন ঢঙে গল্প লিখতে সিদ্ধহস্ত। তাঁর কয়েকটা গল্প আছে মাপে খুবই ক্ষুদ্র, ছোট পরিসরের, সামান্য আঁচড় টানা, অত ছোটগল্প বাংলায় আর কেউ লেখেন নি। ছোট কিন্তু তার সবগুলোই রসোত্তীর্ণ। আমি তাঁর ছোটগল্পের খুব গুণগ্রাহী পাঠক ছিলুম। কিন্তু ঠিক ওরকম গল্প আমার হত না। গল্পে আমি স্টোরি-টেলিং নয়, আর কিছু চাই। তা হচ্ছে আমার ইনার ভিশন, পার্সোনাল ফিলিং। বনফুলকে বলা যায় অবজেকটিভ লেখক, অর্থাৎ সাবজেকটিভ নয়। আমার নিজের অসাধারণের উপরেই ঝোঁক। আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি তথ্য হচ্ছে কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর। গল্পমাত্রেরই একটা না একটা পয়েন্ট থাকে। সেটা খুবই সূক্ষ্ম। সমস্ত গল্পটাই সেই পয়েন্টটুকুর জন্যেই তাৎপর্যবান। সেটুকু বাদ গেলে গল্প ঠিক দাঁড়ায় না। বনফুলের বহু গল্প এই পয়েন্টেড গল্পের রসোত্তীর্ণ উদাহরণ। তাঁর ভাষা এ কাজে সাহায্য করেছে। বাংলা

ছোটগল্পে তিনি যা দিয়েছেন—অনন্য ও অতি মূল্যবান।

তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে এ কথা এখনি বলা যাবে না। তা কালজয়ী হবে কিনা আমাদের পক্ষে বলা শক্ত। কিন্তু খুব চেষ্টা করেছিলেন বৃহদায়তন উপন্যাস, বড় বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখতে। নভেল কথাটির অর্থ নবীন বা অভিনব। নভেলের কাছে লোকের প্রত্যাশা অভিনবত্ব। লোকে চায় কিংবা নতুন আখ্যান। আখ্যান যদি কিংবা নতুন না হয় তবে আখ্যান হবে কিংবা নতুন। নতুনই হোক আর পুরাতনই হোক উপন্যাসকে গোড়াতেই হতে হবে আখ্যান বা কাহিনী বা গল্প। তাতে কল্পনার স্থান নেই তা নয়। অথচ শ্রোতা বা পাঠকের কাছে তা কল্পনার মতো মনে হবে না। মনে হবে সেইটেই প্রকৃত। উদ্ভট আর উদ্দাম কল্পনার কথা হচ্ছে না। লোকে সেটাকে অপ্রকৃত বলেই জানে আর জেনেও ভালবাসে। একপ্রকার উপন্যাস আছে এইটেই তার বিশেষত্ব। এতে বনফুলের কিছু উপন্যাসের নাম করা যায়। কিন্তু সাধারণ উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি তাতে কল্পনায় পক্ষ বিস্তারও বাস্তবিকতার নিয়ম মেনে চলে। উপন্যাস শুধু স্টোরি-টেলিং নয়, তার আর্ট গল্পের আর্ট থেকে আলাদা। তাতে বনফুলের কৃতিত্ব গল্পের মতো অত বেশি নয়। বৃহৎ আয়তনে, বড় ক্যানভাসে অনেক উপন্যাস লিখেছেন তিনি, অনেক ঘটনা, অনেক চরিত্র। উপন্যাস শুধু অজস্র এপিসোডের সংকলন নয়, তার একটা কাঠামো থাকে। কাঠামোর চেয়ে আরও বড় জিনিস জীবনদৃষ্টি।

তবে যাই তিনি লিখুন না কেন তার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ, স্বচ্ছ দৃষ্টি ছিল। যা বলতেন

রূপে তাঁর বয়সে তার একাত্তর নেই। আমরা দুজন ছিলুম দু'প্রান্তের পথিক। বছরে আমি দুটোর বেশি গল্প লিখি নে। দু বছরে একটা উপন্যাস। কিন্তু তিনি বহুপ্রসূ। সেবার কলকাতায় বিভূতিভূষণ আমার বাসায় এসেছিলেন। কথায় কথায় বললেন তিনি বছরে একখানা উপন্যাস ও দুখানা ছোটগল্পের বই লিখে সংসার চালাবেন ভেবেছেন। আমি তাঁকে তার বেশি লিখতে মানা করি। বিভূতি আর বনফুল দুজনেই প্রতিভাবান। বনফুল তার সহযাত্রীদের থেকে ভিন্ন আছে। প্রকৃতি, অরণ্য, নদী, নৈসর্গিকের লেখনী দুর্লভ। সহযাত্রীদের ক্ষেত্রে যা প্রকৃতির ও। বিভূতিভূষণ, যতীন্দ্রনাথ বা আমার মতো বনফুল রোমান্টিক নন। একটা বড় গুণ। মানুষ মানুষ; অনেক দোষ, অনেক বিকৃতি, অনেক পাপ দেখেছেন। তার জন্য একটু সিনিক্যাল। কিন্তু সিনিক্যাল হয়েও আশাবাদী।

নাটক, কবিতাও লিখেছেন তিনি। ছবিও এঁকেছেন। নাটকে তাঁর সাফল্য লোকে মনে রাখবে। তাঁর শ্রীমধুসূদন অসাধারণ হয়েছিল। বিদ্যাসাগর নাটক হিসেবে তেমন জমে নি। লেখকদের সংকুচিত পরিবেশে একজন প্রকৃত বিজ্ঞানের ছাত্রের সঙ্গে ছিলেন না, ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিতদের সঙ্গে, নব্য-শিক্ষিতদের পুরোভাগে। বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনিও ছিলেন সমাজের বিবেক। তাঁর আত্মনিহিত কল্পনাই কি তাঁকে সমাজসংস্কারে ব্রতী হতে প্রেরণা জোগায়, তাঁর সময়ে প্রবেশিল পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক মনোবিজ্ঞান বা চিকিৎসাবিজ্ঞান। নাটকে বনফুলের সংলাপ অনবদ্য। লিখতে লিখতে একটা অভ্যাস জন্মেছে, সেটি বড় কথা নয়। কথা হল কবিত্ব আছে কিনা। কবিত্ব অনেকটা আছে। কবিমনও ছিল তাঁর, বহু পদ্য লিখেছেন, কিন্তু তিনি কবি নন। একজন লেখকের কাছ থেকে সব্যসাচীর প্রত্যাশা করা উচিত না। উচিত নয়। তবু তিনি নানা বিভাগে যত মনোত্তীর্ণ লেখা লিখেছেন আমাদের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা সেই বাল্যকাল থেকে লেখা শুরু

প্রাণ খুলে করতেন। রসনাটাও ছিল রসিক জনের। তবে আলাপচারীদের কাছেই নিয়ন্ত্রণ। যে ডাক্তারি প্রফেশনের মধ্য দিয়ে তিনি গেছেন তাতে মানুষ মরেই একটু আলাদা হয়, অসাধারণ। আমার মতো আমলাদের মধ্য থেকে বঙ্কিম, সাহিত্যিক বেরিয়ে এসেছেন খুব কম নয়। এক বলা যায় আগুন খেয়ে, সমদর্শী মন, জাগ্রত বুদ্ধি, আর্তের সেবায় ব্যস্ত। লেখকের পক্ষে কেউ সাক্ষ্য দিতে পারে না। সেই অভ্যাস হাত মিলিয়ে লেখা। সেই অর্থবহন, বিবেচন। বাংলাদেশের কয়েকজন ডাক্তার-সাহিত্যিকের কথা মনে পড়ে, তবে নিঃসন্দেহে বনফুলই সর্বশ্রেষ্ঠ। অনেক সময়ে মানুষের বৃত্তি তাকে অলক্ষ্যে প্রভাবিত করে। এ কথা বনফুলের বেলাতেও খাটে। প্রত্যক্ষ ডাক্তার হলে তাঁর লেখা কোনরূপ অন্যরকম হত। কিন্তু বনফুল কবিতার-সন্ধান হলে তাঁর লেখা অন্য দিকে মোড় নিত। কিন্তু তিনি যে কতখানি সাধনা চালিয়ে গেছেন সারা জীবন তাঁর ডাক্তারি বৃত্তি সত্ত্বেও তা এক আশ্চর্য ঘটনা। আমাদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে নিষ্ঠাবান লেখক। প্রতিদিন নিয়ম করে লেখা, নিয়ম করে পড়া, নানান বিভাগে লেখা, নানান বিষয় নিয়ে লেখা। তাঁকে কখনো বিশ্রাম নিতে দেখা যায় নি, অবিশ্রাম লিখে গেছেন, লেখার সাথে ছিল তাঁর রাত্রিকাল। তা শেষ পর্যন্ত তিনি কর্মরত ছিলেন, যি অবশেষ হন রাজনৈতিক। শেষ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে রসের জোগান ছিল। যা কিছু লিখেছেন সরস করে লিখেছেন। গদ্য-রচনার মধ্যে একটা একটানা তাল ছিল। তা আমরা দুজন দূরে দূরে থাকতুম, দেখাসাক্ষাৎ হত নি। পরে দুজনেই কলকাতায় চলে এলে মাঝেমধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হত। আরও হতে পারত। একই রেকর্ডে তাঁর আর আমার কবিতা আবৃত্তি পাশাপাশি আছে। সেই রেকর্ড যখন বাজে তখন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, সে এক রহস্যময় অনুভব।

আর তাঁর যে আলাপন, অনাড়ম্বর, তা অনন্য। আমার আলাপন মোলায়েম, কখনো কখনো তা পেশিবিহীনের মতো হয়ে যায়। মোটের ওপর আমি আলাপচারী-ই, কারণ রসিক উনার বয়স পর্যন্ত তিনি তাঁর কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কোন নতুন লেখক এসে তাঁকে অনুসরণ করতে পারে নি।

উনিশ বলেছিলেন, সাহিত্যে ত্রিবিধের পরিবার করতে হবে। সবকাল এক তুঙ্গ আর বিস্তৃতি। এর চেয়ে সত্য কথা আর হয় না। তিনি তার সঙ্গে আরও জুড়ে দিয়েছিলেন—একাকেল, এটা আমি আমটি মানি না। আমি চাই শিল্পী উদ্দীপককে, সৈরিয়াসী উদ্দীপককে নয়। বনফুলের লেখায় সমসাময়িক 'তুঙ্গ' না হলেও 'বিস্তৃতি' গভীর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন বহুপ্রসবী লেখক। তাঁর সবটি রচনায় পুষ্পিত হয়। এ জন বহির্বাংলাদের সাহিত্য। আত্মবিশ্বাসও ছিল তাঁর মধ্যে। এ তো গেল বিস্তৃতি। কিন্তু বিস্তৃতি? খুব সরল, খুব উচ্চট, খুব এক্সেন্ট্রিক, 'ক' আলাদা লেখা তাঁর। তা কি বিস্তৃতি? বিভূতির মতো চিরকালীন কিছু কি রয়েছে তিনি? আমাদের কারো আছে? বিভূতির সেই অপূর্ব উপলব্ধি, প্রকৃতিকে ও সাধনাকে ভালোবেসে তার গভীরে অবগাহন—সে অন্য জিনিস। বহু সাধনার ফলে বিভূতি সাধারণ্যের রচনা করেছেন, তা আমরা কেউ পারিনি। প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে বনফুলের আলাপনের কথাই বলতে হয়, তাঁর মনস্বিতার কথা। তিনি মুসলমান মেয়ের জন্মদাসে পুষ্ট। তাঁর অনুরাগ হবার কথা নয়। তাঁর পক্ষে উপন্যাসে মুসলমান চরিত্র আছে বিস্তর। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত লেখনীতে, তবু অকপটভাবে সমাজ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস মনোভাব দেখে আমি সন্তুষ্ট হই। তাঁর তৎকালীন বাম কবিতা আমাকে আকর্ষণ করে। চীন ভারত যুদ্ধের সময়েও তাঁর এই বিশ্বাসের অনোভাব দেখেছি। তবে এগুলো সাময়িক। তিনি আমাকে তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। এর পেছনেও তাঁর সেই গুরুদেব—আলাপন ও মনস্বিতা। নিষ্ঠাবান, অনলস সাহিত্যসাধক—বাঙালী পাঠক তাঁকে মনে রাখবে। সাহিত্য-সাধনার শেষ তীর্থে তিনি পৌঁছেছিলেন কি? এর উত্তর আমি নিজে দিতে পারছিনে। ভাবীকাল দেবে।

শতবর্ষের আলোয় বনফুল

ডঃ সরোজমোহন মিত্র

উনিশ শতকের অন্তিম পর্বে এবং বিংশ শতাব্দীর অরুণোদয়ের সময় বাংলা সাহিত্যের যে বহু খ্যাতিমান লেখকের জন্ম হয়েছিল বনফুলও (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় জন্ম: ১৯ জুলাই ১৮৯৯, মৃত্যু: ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯) ছিলেন তাঁদের একজন। গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল একটু বিলম্বে ১৯৩০ সালে। তার আগেই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে। বিখ্যাত সব লেখকদের সাড়া জাগানো সৃষ্টিতে প্রবল উত্তেজনা।

এ সবই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর শূন্যতাবোধের এবং খোলা যৌনাচারের প্রতিক্রিয়া। অন্যদিকে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। তখন তরুণ সমাজের প্রধান আলোচ্য হামসুন, যোহান বোয়ার, স্ট্রিণ্ডবার্গ টমাস মান, আনাতোল ফ্রাঁ, মোঁপাসা, বালজাক, জোলা, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি, বার্নার্ডশ, গলসওয়ার্দি, হাক্সলি, হার্ডি, গোর্কী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ লেখকেরা। তাঁদের কাছে বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি হামসুন গোর্কী আমাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষার আধুনিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে ইওরোপেরই মনের প্রাণের বিপর্যয়ের ফলে। সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে অস্থিরতা, অসুস্থতা, নগ্নতা সবই যেন এক হাসপাতালের ছবি। সর্বত্র একটা অসহায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা। সর্বত্র একটা শূন্যতা, বিষাদ, অসহায় আর্তনাদ।

কথাসাহিত্যিক বনফুল অঙ্কনে নিরত

ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বনফুল ছদ্মনামে তাঁর ডাক্তারি জীবনের অভিজ্ঞতা

নিয়েই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন। তৃণখণ্ড, বৈতরণী তীরে, হাটে-বাজারে উপন্যাসে তাঁর চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতা। অতি ক্ষুদ্র পরিসরে এই জীবনে ডাক্তারের দৃষ্টিতে বর্ণাঢ্য মানুষের ভারসাম্যহীন চরিত্রের বিশৃঙ্খলা এবং অসহায় বিভ্রান্তির কথা আছে। 'বৈতরণী তীরে' উপন্যাসের শেষে তিনি যথার্থ লেখেন 'ভগবানের অবিবেচনার সমাধি দুই।' পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ নিকট আত্মীয় দুই জমিদারের পরস্পর রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন 'দ্বৈরথ' উপন্যাস। একটি স্টেশনে ট্রেন পড়া রেলগাড়ি যে যাত্রী জনতাকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে তাকে কেন্দ্র করেই বনফুল বহু সরস ঘটনা সৃষ্টি করে লিখেছেন 'কিছুক্ষণ' উপন্যাসে।

তারপর বনফুল একের পর এক দীর্ঘ জীবনব্যাপী বহু উপন্যাস রচনা করেছেন। স্থাবর, জঙ্গম, অগ্নি, মানদণ্ড, পঞ্চপর্ব, পিতামহ, মহারাণী, হাটেবাজারে, ভুবন সোম প্রভৃতি উপন্যাসের জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। বিষয়-বৈচিত্র্য এবং চরিত্রসৃষ্টিতে বনফুল বাংলা কথাসাহিত্যে অদ্বিতীয়। বাস্তব, অবাস্তব, কাল্পনিক, অসম্ভব রূপক প্রতীকধর্ম সবরকম রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু কোথাও পুনরাবৃত্তি নেই। ক্ষিপ্রগতি এই সংসারে তিনি এক বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহ অথচ জিজ্ঞাসু মন নিয়ে প্রকৃত আবিষ্কারকের মত বসে আছেন। সেই মনঃপ্রাণ থেকেই যেন বিচিত্র অথচ অদ্ভুত সব ঘটনা একের পর এক রূপায়িত হয়েছে।

প্রায় ষাট বছরের কলমের জীবন। প্রায় সত্তরখানা উপন্যাস তিনি লিখেছেন। এছাড়াও লিখেছেন প্রায় হাজার গল্প, আটখানা পূর্ণাঙ্গ নাটক, খান কুড়ি একাঙ্ক নাটক এবং শতাধিক কবিতা। শেষজীবনে ছবি আঁকাতেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। লিখেছেন বহু প্রবন্ধ আলোচনা এবং আত্মজীবনী। সংখ্যা বা পরিমাণের দিক থেকে একজন ব্যক্তিজীবনে এগুলো যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি বিষয় বৈচিত্র্যেও তা

অতুলনীয়। পেশায় তিনি ছিলেন ডাক্তার আর নেশায় সাহিত্যিক। যৌবন বয়সে তিনি ডাক্তারি করতেন আর প্রকাশকদের চাপে লিখতেন। পারিবারিক নানা প্রয়োজনে তিনি প্রকাশকদের কাছ থেকে অনেক অগ্রিম টাকা নিয়ে রাখতেন। পরে বই লিখে তাদের সেই দেনা শোধ করতেন। কিন্তু যেমন তেমন করে বই লিখে তিনি সংখ্যা বৃদ্ধি করেন নি। বনফুল চেষ্টা করেছেন প্রতিটি বইয়ে নতুন স্বাদ পরিবেশন করে তাঁর বই রচনা করতে। এই তাঁর বই রচনা করতে গিয়ে তিনি নতুন নতুন পথ উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছেন; অত্যাধুনিক সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তীক্ষ্ণ মননশীলতা এবং নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নানাভাবে মানব চরিত্রকে যাচাই করেছেন।

এই কাজে তিনি বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে বিষয় ও আঙ্গিককে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

বৈজ্ঞানিকের অদম্য কৌতূহল নিয়ে তিনি বিচিত্র মানবজীবন, পাখী, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করেছেন আর সাহিত্যিকের সরস দৃষ্টি দিয়ে তাকে রচনা করে তুলেছেন। এ ছাড়া বিদেশী অনেক বইয়ের অনুসরণে উপন্যাস লিখেছেন। তলস্তয়ের উপন্যাস অবলম্বনে লিখেছেন 'নঞ তৎপুরুষ', রেনে ম্যারানের উপন্যাস অবলম্বনে 'জীবনসন্ধ্যা', আনাতোল ফ্রাঁস উপন্যাস অবলম্বনে 'নিরঞ্জনা', কোনান্ডের উপন্যাস অবলম্বনে 'পীতাম্বরা', সিঙ্কলেয়ারের উপন্যাস অবলম্বনে লিখেছেন 'লক্ষ্যভেদ'।

বনফুলের জীবিতকালে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে বিরাট বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। তার বিরাট উৎক্ষেপে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত উৎপাটিত হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে বনফুল এইসব আন্দোলনের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন নি। কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে সমকালীন যুগজীবনকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। তিনি রাজনৈতিক পটভূমি নিয়ে লিখেছেন সপ্তর্ষি অগ্নি, মানদণ্ড, স্বয়ংসিদ্ধ প্রভৃতি উপন্যাস। এদের মধ্যে কোন কোন উপন্যাস নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এবং তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ কোন মতবাদকেই যথার্থভাবে যাচাই করে দেখবার মত মানসিক প্রবণতা তাঁর ছিল না। সাহিত্যিক বনফুলের কাছে এসব ছিল বাহ্য। তিনি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে তাঁর সাহিত্যসম্ভার সৃষ্টি করেন না। জীবনের নানা ঘটনার ঘাত-সংঘাতে সংক্ষুব্ধ কলকাতা মহানগর থেকে দূরে ভাগলপুরে তাঁর নির্জন গোলকুটিরে বসে তিনি নানা রসের সাহিত্য সৃজনে নিরত। জীবনের ঘটনা বৈচিত্র্য তাঁর সাহিত্যের উপাদান নয়। তাঁর যা কিছু বৈচিত্র্য কেবল সপ্তর্ষি। নানা দেশ-বিদেশের সাহিত্য সম্ভারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। প্রচুর তাঁর পড়াশুনা। সেখানে কোন বাদ-বিচার নেই। সাক্ষিগত তাঁর জ্ঞানার্জনের মানদণ্ড। দেশ-বিদেশের নানা সাহিত্য কর্ম জ্ঞান-বিজ্ঞান বনফুলের কল্পনার পরিসীমাকে দিগন্তপ্রসারী করে অতিক্রমী করে তাঁর চিন্তনে এক প্রচণ্ড গতিময়তা সৃষ্টি করে।

কবিকল্পনার একটি সীমা আছে। সীমা আছে মানুষের কর্মক্ষমতার। কিন্তু জানবার ইচ্ছা কিংবা চিন্তার তো কোন সীমা পরিসীমা নেই। কবি তাঁর কল্পনার ত্রিভুবনবিহারী নিয়ত পরিবর্তনশীল নিসর্গ সৌন্দর্যকে বন্দিত করতে যান, বিজ্ঞানী নানা বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত। এঁদের কৌতূহলের কোন সীমা নেই। বনফুল একাধারে বিজ্ঞানী এবং কবি। তাঁর তো বিষয়বস্তুর কোন অভাব নেই। তিনি চিকিৎসক ছিলেন। নিত্য নতুনের পথে তাঁর অভিসার। অন্য অনেক সাহিত্যিক যখন জীবনের নানা যন্ত্রণার ক্ষোভে বিক্ষোভে জীবন বিড়ম্বিত তখন একা বনফুল একান্তে বসে নিরত পর্যবেক্ষণ এবং কল্পনা বৈচিত্র্যের ছবি রঙে রসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিষয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে সমভাবে উল্লেখযোগ্য বনফুলের রচনারীতি। প্রথম থেকেই উপন্যাস রচনার নির্দিষ্ট রীতিনীতি তিনি অবলম্বন করেন নি। বনফুল তাঁর প্রথম উপন্যাসেই লিখেছেন, আমি ডাক্তার—আমি কবি। অতএব কবিতা বাদ দিয়ে তাঁর ডাক্তারি পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। 'তৃণখণ্ড' গদ্যে এবং পদ্যে রচিত উপন্যাস। আসলে 'তৃণখণ্ড' ডাক্তারেরই কবিতা। দ্বৈরথ উপন্যাসে আছে আরও চমক। এই উপন্যাসের তিনটি অংশ—গদ্যে, পদ্যে এবং নাটকে। প্রথম অংশ লেখা গদ্যে। দ্বিতীয় অংশ পদ্যে এবং তৃতীয় অংশে নাটকে। 'অগ্নি' উপন্যাসের রীতি প্রধানত episodic. নানা খণ্ড উপাখ্যানের সমন্বয়ে গড়া এবং নানা বিভিন্ন কাহিনীগুলোর একমুখীনতায় কেন্দ্র সংবদ্ধ। 'সে ও আমি' বনফুলের আঙ্গিক বা রূপরীতির অভিনবত্বের আরেকটি নিদর্শন। চৌম্বিক গল্পের মত এই উপন্যাসের আকার। অদ্ভুত suspense জাগিয়ে রেখে লেখক তাঁর গল্পের এক অদ্ভুত রূপকে নাটকীয়ভাবে কল্পনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বনফুলের সবচেয়ে বেশি খ্যাতি তাঁর 'জঙ্গম' উপন্যাসের জন্য। পাঁচটি অধ্যায়ে এবং

... শিল্পী যেমন করে দু-একটি রেখার টানে একটি বৃত্তের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলেন, বনফুলও তেমনই তাঁর ছোটগল্পের অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটা বড় গল্পের আভাস দিয়ে পাঠককে চমকিত করে দেন। ...

তিনটি খণ্ডে বিভক্ত এত বড় উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত, এখনও অদ্বিতীয়। জঙ্গমের সঙ্গে একই সুরে উচ্চারিত হয় আর একটি উপন্যাস 'স্থাবর'। যা ছিল যুগের নৃতত্ত্ববিদদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আলোচনার বস্তু, বনফুল তাকেই উপন্যাসে রূপায়ণ দেবার চেষ্টা করেছেন।

আঙ্গিক চেতনায় রূপায়ণ কলায় বনফুলের কৃতিত্ব বিস্ময়কর। বাংলা সাহিত্যে বনফুলের সবচেয়ে বেশি খ্যাতি তাঁর ছোটগল্পের জন্য। সেখানে বনফুলের এই কৃতিত্ব আরও চমৎকারী। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কিন্তু বনফুলের ছোটগল্প এই ধারায় এক ব্যতিক্রম। তাঁর গল্পের স্বাদ একেবারে নতুন। তিনি অতি সংক্ষেপে গল্পের ভূমিকা ও সমাপ্তায়নের কাজ সেরে একেবারে ক্লাইমেক্সে চলে আসেন। সেজন্য তাঁর গল্পের পরিধি অতি সংক্ষিপ্ত। বনফুলের গল্প বলতে সাধারণত ছোট গল্প, একপাতা বা আরও কম পরিসরে সমাপ্ত হয়ে যায়।

শিল্পী যেমন করে দু একটি রেখার টানে একটি বৃত্তের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলেন বনফুলও তেমনই তাঁর ছোটগল্পের অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটা বড় গল্পের আভাস দিয়ে পাঠককে চমকিত করে দেন। এখানে গল্পের বিস্তারিত চরিত্রায়ণ নেই, ঘটনার সংঘাত নেই, পাতার পর পাতার বর্ণনা নেই। আছে কেবল কয়েকটি আভাস এবং ইঙ্গিত, মনন ও কল্পনার সমাহার। বনফুলের গল্পের এই নতুন ধর্ম তাঁর একটি নতুন রীতি।

বনফুলের কবিতার মধ্যেও আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা। অথচ তার সঙ্গে পাশাপাশি বিরাজমান তাঁর প্রকৃতি মুগ্ধতা এবং সৌন্দর্য পিপাসু এক রোমান্টিক মন। তাই এই কবিমনকে বাদ দিয়ে তাঁর উপন্যাস পাঠ বা বিচারও সম্ভব নয়।

অথচ বনফুল শুধু সৌন্দর্য, প্রেম, কল্পনা এবং রোমান্সের জগতেই বিচরণ করেন নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি অনেক কবিতা গল্প উপন্যাস লিখেছেন। সরাসরি তাঁর কোন রাজনৈতিক মতামত না থাকলেও তাঁর স্বজাতি-প্রীতি ছিল অসাধারণ। বাঙালী জাতির প্রতি তাঁর টান ছিল গভীর ও আন্তরিক। বাঙালী জাতির অতীত গৌরবে তিনি যেমন গর্ববোধ করতেন তেমনই তার অধঃপতনেও মর্মপীড়া অনুভব করতেন। তা বলে তিনি কখনও উগ্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন না। অখণ্ড ভারতবর্ষ নির্মাণ ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাঁর 'স্বপ্ন সম্ভব' উপন্যাসে আছে এক স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন—"যে ভারতে দরিদ্রতা নাই, দীনতা নাই, হিংসা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, বহু শতাব্দীর স্বপ্নকে অতিক্রম করিয়া রূপ রস গন্ধে সমৃদ্ধ পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে.....যে ভারতে মানুষ কামনা করে—ধন নহে, মান নহে, আনন্দ, আনন্দ আর শান্তি।" বনফুলের স্বপ্ন কবে সফল হবে তা জানি না। তবু শতবর্ষের আলোকে বনফুলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরা যেন তাঁর এই কাঙ্খিত স্বপ্নের কথা না ভুলে যাই।

বনফুলের ছোটগল্প

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

বনফুল এবং তাঁর কন্যা, দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনি

বনফুল প্রথম জীবনে কবিতাই লিখতেন। স্কুল থেকেই কবিতা রচনার সূত্রপাত। কলেজ জীবনে হাজারিবাগের সেন্ট কলাম্বাসের ছাত্র থাকার সময়েও সহপাঠীদের কাছে তিনি কবি হিসেবেই খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন। কবিতার ভাব- বিন্যাসের মধ্যে বলার ভঙ্গিতে নতুনত্ব থাকত। প্যারডির মাধ্যমে বক্তব্য ও মিলে আকস্মিকতা সঞ্চার করতে পারতেন তিনি। বাবা ডাক্তার ছিলেন, কিন্তু গান বাজনা সাহিত্য-চর্চার রীতিমতো আকর্ষণ ছিল তাঁর। এই পরিবেশে অল্প বয়স থেকেই বনফুলের পক্ষে আত্মীয়-স্বজন ও পত্র- পত্রিকার মাধ্যমে সমকালীন সাহিত্য-চর্চার গতিবিধি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

সাহিত্য-চর্চার পরিবেশ ছাড়াও সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতার বহু উপকরণ ছড়ানো ছিল বনফুলের জন্মস্থান পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে। গ্রামের একটু বাইরে ফাঁকা জায়গায় ছিল তাঁদের বাড়ি।

সেই সূত্রেই বাড়ির আশেপাশের বনজঙ্গল আর যত পশু-পাখির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আত্মস্মৃতিচারণে ('আমার চোখে আমি') দেখি, বন-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে 'ভংশীবাবু'র সাথে ফিরে বনফুল ছোটবেলায় বাড়ি থেকে একটু দূরে শীতকালের পাহাড়ের জঙ্গলে ঝাঁটিতে হাঁটিয়ে চলে যেতেন। 'ভংশীবাবু'র এই অভিযানের সঙ্গে জল চলে যায়, পাখি আর খরগোশ কুকুরের সঙ্গে আত্মীয়তা। শীতবস্ত্র পোষার নেশাও সেই থেকে। খরগোশ, কুকুর, শালিক, ময়না, টিয়া এমনকি টিকটিকি ইঁদুর কিছুই বাদ যায়নি। উত্তরকালের উপন্যাস-গল্প-লেখক বনফুলের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারের এসব উপকরণ তখনই জমা হচ্ছে।

ছোটবেলায় প্রকৃতি ও পশুপাখি যেমন তাঁর আত্মীয় হয়ে উঠেছিল তেমনি দিনে দিনে তাঁর গল্প-উপন্যাসের বহু বিচিত্র মানুষের দেখাও এই সময় থেকেই মিলতে থাকে। আত্মস্মৃতিচারণে লিখেছেন যে, তাঁদের বাড়িটি ছিল অতিথিশালা বিশেষ। বাড়ির কাছাকাছি ছিল সরকারি হাট এবং রেল স্টেশন। বহু লোক তাই বাড়িতে এসে একবেলা দুমুঠো খেয়ে ট্রেন ধরতেন বা সকালের উপলক্ষে দু-একদিন থাকতেন। পাশিপিকারী আসতেন, আসতেন সম্প্রদায়ের লোক অভাবে সরকারি কর্মচারীও। স্থায়ী অতিথিও কেউ কেউ হয়ে যেতেন—

চাকুরী প্রার্থী, ছাত্র, শিক্ষক বা ভবঘুরে মানুষ। এই রকম ভবঘুরে এক মানুষ মুড়কে বলাই—হঠাৎ উদয় হতেন, আবার হঠাৎ হারিয়েও যেতেন। এঁর কাছেই বনফুল শুনেছিলেন ইতিহাস-পুরাণের নানা গল্প। আর এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন 'কেষ্ট দাদা'। কবিতে বাজাতে এবং নাচতেও পারতেন তিনি। এইরকম বিচিত্র সব মানুষের স্বাদ পেতে পেতে তিনি কবিতার পাশাপাশি গল্প লিখতে শুরু করেন। প্রথমে হাতে লেখা পত্রিকা, পরে কলকাতায় এসে 'প্রবাসী' পত্রিকায়। কিন্তু বনফুল নিজেই বলেছেন, মণিহারীতে তাঁর বহু অভিজ্ঞতাই হোক মেডিকেল কলেজে পড়তে এসে কলকাতা ও পাশাপাশি অঞ্চলের বিচিত্র মানুষ তাঁর চেতনায় বিভিন্ন দরজাগুলি খুলে দেয়। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বনফুল লিখেছেন, কলকাতার প্রবল জীবন, নানা মানুষের ভিড়, প্রথমঃ আমাকে অন্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়। মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়, অতি কিছুকাল পেওয়ানুলি থেকে বেশি আলাপকারি করেছিলুম। তখন বহু লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। রাস্তায় থেকে ঘরে ঘরে

নানা বনিতার সম্মুখীন হয়ে লাগলুম। চারদিকে কত বিচিত্র চরিত্র। আমার 'জঙ্গম' উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র এই সময়ের মানুষ। কিন্তু উপন্যাস লেখার সাহস তখনও আমার হয়নি।" মেডিকেল কলেজের পাশে হাসপাতালে একা ঘরে বসে, কিংবা প্রকাণ্ড মুলসবের নির্জন পরিবেশে তাঁর হাত-পাটি গল্প লেখা হয়ে গেল। এই স্মৃতিচারণেরই আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "মানুষই আমার লেখার বিষয় এবং প্রেরণা। তবুও মানুষকে নিয়ে আমি কোনো থিয়োরি বা কর্মূলা খাড়া করতে দি। আমার বিশ্বাস সেরকম কিছু করাও যায় না। তবুও লেখায় একটি যেসেল বা জানবার কথা আছে। সেটা হল, মানুষ বহু বিচিত্র। ...মানুষকে অনুসরণ করে আমি আমার লেখায় নিত্য নতুন বিষয় ও রূপ আবিষ্কার করেছি।" এই unpredictable মানুষকে দেখে যে শিল্পী তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন সে শিল্পী নিজেও কম বিচিত্র নয়। বিশেষ করে পরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতিচিত্রণে' বনফুলের ছবিটিকে যেভাবে হাসির কাহিনী পরিচয় পাওয়া যায়। যে-সব ব্যাপারে সাধারণতঃ আমরা সাবধান হতে না, ভুলিয়ে হতে পারি, সে-সব ব্যাপারে বনফুল ছিলেন একেবারেই অসচেতন। কিন্তু 'সচেতনতা' ছিল তাঁর দৃষ্টিতে। দেখার চোখে কোনো

কিছুই এড়াতো না এটিই ছিল তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। লেখার শিল্পীর এতো অসংখ্য চোখ দুটি তাঁকে ব্যক্তিজীবনে অনেক সময়েই আত্মসচেতন থাকতে দেয়নি। চরিত্রকে 'দেখতে' পেলে যে চরিত্র 'হতে' হয় (অবশ্য শিল্পীর নিরাসক্তি বজায় রেখেই।) এ কথা কেউই বনফুল অক্ষরশঃই পালন করেছিলেন। এই অর্থে সব শিল্পীই বিভূতি 'চণ্ডীচরণ'—যাঁকে বনফুলের সমালোচকরা একটু দিক থেকে মহাশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল।

মানুষের বিচিত্র স্বভাবের গভীরে এই খুঁটিনাটি দৃষ্টি চালনার ক্ষমতাই তাঁকে কবিতার জগৎ থেকে ক্রমেই টেনে নিয়ে গেছে ছোটগল্পের দিকে। যে বয়সে মানুষ কল্পনার জগতে রোমান্টিকতা নিয়ে থেকে যেতে পারে সে বয়সে বনফুলের ব্যক্তিগত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে মানুষেরই মোহ কাটাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই উত্তরণের পেছনে একটি প্রবল জীবনীশক্তি যে সক্রিয় ছিল তা তাঁর বিচিত্র বাস্তব পরিক্রমাতেই প্রমাণ হয়। সেই জীবনীশক্তি প্রবল অনুসন্ধানের প্রেরণা-কাতর-জনগোষ্ঠীর-পূর্ণ মানুষকে দেখতে শুরু করেছে। বিচিত্র রাগ-অভিমানে ভরা মানুষের হৃদির প্রকৃতির তাঁর লেখায়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, নয়তো তীব্র দুঃখবোধে শিল্পী চরিত্র হয়েছেন, কোনো সময়ে দেখাটাই যেন রুক্ষ বাস্তবতা অথবা মানুষকে উজ্জ্বল কৌতুকে মুড়ে দিয়ে তাঁর অবলম্বন-বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষের প্রতি গভীর ও ব্যাপক সহানুভূতি যেমন তাঁর ছিল, তেমনি ছিল নিরাসক্তির গভীর গোপনে উদ্বেগ। তাই মানুষের প্রবৃত্তি নিয়ে তিনি যেমন তীক্ষ্ণ রসিকতা করেন, তেমনি তীক্ষ্ণ খোঁচাও দেন। বৈজ্ঞানিক দেখাক যেমন তাঁকে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি ধর্ম-আধ্যাত্মিকতার সহজ সংস্কারকেও তিনি অবলীলায় টেনে আনেন। তবে স্বভাবের গভীরে বনফুলের দৃষ্টি কতখানি সত্য ভুল দেয়, দেশ-কালের ব্যাপক প্রেক্ষাপট জ্ঞান ততখানি প্রখরভাবে তাঁকে সচেতন করে না।

[২]

কিন্তু এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বনফুলের গল্প রচনায় আরেকটি বিশিষ্টতা মিশে আছে। সেই বিশিষ্টতাই তাঁকে অনন্য ছোটগল্পলেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা

নিয়েছে চিকিৎসা-জগতের প্রায় যাবতীয় প্রেক্ষাপট। সেই বৈশিষ্ট্যটি হল তাঁর নব্য পরিকল্পনার ভঙ্গিমা এবং বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি। শরৎচন্দ্রের মতো নিবিড় বেদনা এবং প্রভাতকুমারের মতো ভাবনা এমন-কৌতুক ও পরিস্থিতি-সৃষ্টির ক্ষমতা বনফুলের সুস্পষ্টভাবে ছিল। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও আধুনিক তাৎপর্যের উদ্ভবও তাঁর কোনো কোনো গল্পের মৌলিকত্ব। আবার অন্যত্র সংযম এবং চিকিৎসকের তাঁর গল্পে চিকিৎসার দিক থেকে একটি নবীন সংযত বৈশিষ্ট্য এনেছে। সাহিত্য জগৎ চিকিৎসাশাস্ত্র তাঁর লেখায় বিষয় হলে হয়তো চিকিৎসাবিজ্ঞানীর নিরাসক্ত দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁর সহায়ক ছিল। জীবাণু নিয়ে অনুবীক্ষণ পরীক্ষার কাজই হয়তো তাঁর গল্পে তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতা এনেছে। কিংবা, তাঁর স্বভাবগত তীক্ষ্ণ, নিরাসক্ত দৃষ্টিই একাধারে তাঁকে চিকিৎসক ও সাহিত্যিক করেছিল। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র কেউই জীবাণু পরীক্ষা করেননি। তাঁদের উপন্যাস-গল্পে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও স্পষ্টতার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। অন্যদিকে 'ভূতের প্রেম', 'দৌড়' বা 'ভূতের গল্প' (বনফুলের ভূতের গল্প) ইত্যাদির মতো গল্পে বনফুল দেখিয়েছেন যাতে মানুষের অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কারকে তিনি সযত্নভাবেই নিয়েছেন। আবার 'ভূত' গল্পে প্রেমিকের হৃদয়ের নিগূঢ় ভূত-দৃষ্টিতে প্রেমিকাকে জলের কলটি দিয়ে জল ফিরিয়েছে, অত্যাশ্চর্যভাবে হবে প্রেমিকার আকর্ষণের স্থায়িত্ব-পরীক্ষাও করেছে। সেখানে ভূতের আড়ালে বৈজ্ঞানিক একটু যুক্তি রেখেছেন। হয়তো চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র হওয়াতে তাঁর লেখায় নতুন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র কিছু খুলেছে, বিজ্ঞান প্রকল্পাদি এসেছে, অনেক অবাস্তব ঘটনার নিরাসক্ত উদ্ঘাটনও ঘটেছে—যেমন ঘটেছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরূপের পথে। কিংবা প্রাণিবিদ্যার তথ্যভেদে ভিত্তিক প্রতিপত্তির সূত্র ধরেও এসেছে অনেক লেখা। 'অগ্নিশ্বর' গল্পে যেমন প্রথমে তাঁর কিশোর বয়সে ছড়ায় পায় দ্বিতীয়বার চিত্তের আগে আলোকে মনে রয় ঢুকেছে —কী জানি, এ মেয়ের কিসমতটা আমার কেমন হবে।'

[৩]

ফোটোগ্রাফের তাৎপর্য যাই হোক, তার সংক্রান্ত স্ন্যাপ-শটের সহজ স্মৃতিটুকু বনফুলের জানা ছিল। জীবনের প্রতি মুহূর্তের শত রকমের মধ্যে ফোটোগ্রাফ যে লুকিয়ে থাকে এ কথা তাঁরই ফোটোগ্রাফবিষয়ক একটি কবিতার বক্তব্য। 'ফোটোগ্রাফের গল্প' নামে তাঁর একটি গল্পও আছে। সে গল্পের মধ্যে কাগজের আকারে সাহিত্যের ব্যবসায়িক বাজারে ফোটোগ্রাফের মুহূর্তাংশটুকুর সহজ স্মৃতির জন্যে যে কত ব্যাকুল তা বোঝানো হয়েছে। ফোটোগ্রাফের বাজারের চলে গেছে, কোনো দিন উপন্যাসের স্ন্যাপ-শট ছাড়া তাকে আর কেউ চায় না। তাই লেখকের কাছে সে ফটো এসে হাজির হয়। লেখক দেখেন, 'ফোটোগ্রাফ আর সেই তন্বী কিশোরী নেই, তীক্ষ্ণদৃষ্টি এক সংসারী মহিলা।—তিন থাক চিবুকের খাঁজে খাঁজে পাউডার, মুখময় সন্দেশের ছাপ, দুটি আঙুলে দুটি আংটি, বিরাট খোঁপায় ঝকমকানো একটি বেনারসী শাড়ি, ব্লাউজের হাতায় সোনার কাজ, দুপাশে অলংকারের অঙ্গিতে অঙ্গিতে অলংকারের বাহুল্য, প্রায় সেটা তিনেক।' লেখক এই মহিলার কাছে পুরোনো দিনের গল্প প্রায়ই শুনেছেন—মহিলাটি বললেন, 'ও তো বুঝলাম। কিন্তু কি 'স্ন্যাপ-শট' চান। সামাজিক, রাজনৈতিক, অনুমূলক, তত্ত্বমূলক দার্শনিক না ঐতিহাসিক... ?' লেখক স্ন্যাপ-শটের মানে বুঝতে না পারায় মহিলা তাঁকে বিশ্লেষণ করে দেখালেন, টেবিলের ওপরে চটি, লজেন্স, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি অসংখ্য খাবার (যার এখানে সাহিত্যের রূপক—সাহিত্যের বিভিন্ন genre বা শ্রেণির পরিচায়ক) ছড়াছড়ি। আর তাদের পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞাপনের তীব্র প্রতিযোগিতা। অন্যদিকে বড়ো কাঁচের আলমারি সেই ফুলশিশী মহিলাটি বৈজ্ঞানিক ফটো অ্যালবামটুকু দেখা যায়। আবার অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে দেখা যায়, জানালার বাইরে একটি সবুজ গাছের শীষ বাতাসে দুলছে। সেই সবুজ শীষ লোকেদের প্রার্থনায় যে স্ন্যাপ-শট তিনি পাঠালেন বললে, সেটি হল তার পূর্বযৌবনের একটি মুহূর্তের স্মৃতি—প্রথম যৌবনে লাজুক মুখে সলজ্জ মুখ, আর তার সঙ্গে বাতাসে এলোমেলো খোঁপা। সেই কোলেঅব মুখে মুখ হয়ে একটি ফড়িং লাফিয়ে এসে বসেছিল তার খোঁপায়। আমাকে দিয়ে দিয়েছি সে উড়ে গেল। সেই মুহূর্তটুকুর জন্যেই, এই স্ন্যাপ-শট-নেওয়া ফুলদানি এখনো অন্ধকারে আছে।

এই গল্পটি থেকেই বুঝতে পারা যায়, বনফুল ফোটোগ্রাফের প্রয়োগে আবশ্যিক ও পরিমিতিবোধে বিশ্বাস করতেন। তত্ত্ব, তথ্য, ইতিহাস, অলৌকিকতা, সামাজিক পর্যবেক্ষণ বা ব্যক্তির প্রকাশ—গল্পে যাই থাক না কেন, বাস্তব পরিবেশ তার থাকা চাই। অর্থাৎ, উপকরণ বা তাৎপর্য যেমনই থাক, গল্পের শরীরকেই তিনি অগ্রাধিকার দিতেন; গল্পবলাই তাঁর কাজ ছিল। কিন্তু বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁর বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। সব উদ্ভাবনই তাঁর মৌলিক নয়। ত্রৈলোক্যনাথের মতো মজলিশী বা বৈঠকী ভঙ্গি যেমন চোখে পড়ে, তেমনি পারিবারিক বা দাম্পত্য জীবনের গল্পে (যেমন 'অদ্বিতীয়া') কিংবা জীবিকা ভিত্তিক গল্পে অপূর্ব পরিস্থিতি বা বিস্ময়কর চরিত্র রচনার মধ্যে প্রভাতকুমারের ছাপও পাওয়া যায়। আবার শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো গল্পের মতো বৈঠকী মেজাজ, সংযমী বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা ও বিস্ময়কর চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা বনফুল দেখিয়েছেন। তাছাড়া তিনি উদ্দেশ্যহীন পূর্বসূরির বনফুলের প্রতিভার বহুমুখী প্রকাশের ছাপ আছেন। আবার এই সব গল্পও বনফুলের অতিরিক্ত আত্মপ্রকাশ নতুন 'অণুকবিতা' বা 'গল্প'র জন্ম দিয়েছে—যেখানে সংযমের কঠিন আবরণের মধ্যেও গভীর সমানুভূতি, গোপন কোনো কামনার (যেমন

'অন্তর্দাহ' গল্প) বা তাঁর কোনো কোনো কাহিনি ('তোষ বেল') বা নিয়তি কিংবা, জগদীশ গুপ্ত কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কিছু বিদ্রূপ আছে ('বিড়ম্বনা' কিংবা 'কৌন')। আবার এখন বাড়াও তত্ত্বপ্রাণিত চমক কিংবা টিপিক্যাল বাঙলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ছোটো ছোটো আখ্যিক গল্পের লেখক ইংরেজি (এই শব্দ কবিতার নাম দিয়েছিলেন তিনি Sencla), চমক বা চেকভের বাঙলা কোপানী, ও হেনরি এবং সমারসেট মম যেন বনফুলের হাত তৈরি করেছে—হয়তো 'বিদ্রুপ' আরশাবেই তিনি এদের ঐতিহাসিকদিকে দাঁড় করাতে দিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। 'আরশারে'—কেননা এই তিনজনের গল্পবৈশিষ্ট্যের কথাই 'ছোটগল্প' নামক একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধে ('ভাষণ' বইটির অন্তর্ভুক্ত) তিনি উল্লেখ করেছেন।

[৪]

এতো বিভিন্ন ধরনের গল্প বনফুল লিখেছেন যে বিশেষ একটি কি দুটি সূত্রে তাঁকে বুঝতে গেলে তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। মোটামুটি বলা যায়, তাঁর কিছু গল্প আছে যা একান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা চরিত্রকেন্দ্রিক বা ব্যক্তি সম্পর্কের গল্প তার মধ্যে প্রেম অবশ্যই অন্যতম বিষয়, কিছু গল্প পারিবারিক সম্পর্কের গল্প আর কিছু আছে সামাজিক সমস্যার গল্প। যদিও ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই পারস্পরিকভাবে বিজড়িত হয়ে আছে। প্রথমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রসঙ্গেই আসা যাক।

খুব ছোট ছোট গল্পগুলির মধ্যে (যাকে 'গল্পকণিকা' বলেছি) এমন কিছু গল্প আছে যা পাঠককে মানবিক বৈচিত্র্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন 'অমলের' গল্পটি। তুচ্ছ-পতিত কাহিনির এই কয়টির দেখি, সমস্ত তাঁর জন্যে জামা কিনে লোকে তাঁর খুশি দুর্গতি কল্পনা করতে করতে যাচ্ছেন এমন সময় একটি লোকের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে নতুন কেনা জামাটা নষ্ট হল। রেগে গিয়ে ভদ্রলোক লোকটিকে, ভুলের জন্য গালাগালিও করলেন। লোকটি নীরব। এক ভদ্রলোক পাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, ওকে মাপ করুন, ও অন্ধ বোবা ভিখিরি। মানুষের একটু মহিমার মর্মস্পর্শী অভিপ্রকাশেই ভিখিরি এখানে নায়ক হয়েছে। এখানে ব্যক্তি প্রায় টাইপ চরিত্র। এমন অসাধুক আরও অনেকেই। কিন্তু 'শ্রীপতি সামন্ত', 'শ্রীমতী ইয়াবতিবিয়ারী' 'অর্জুন মণ্ডল', 'কপাট' 'ঠাকুরদা', 'তাজমহল' বা 'সেকালের মানমনস্তু' প্রভৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা চরিত্রকেন্দ্রিক গল্প। যদিও এগুলির কোনো কোনোটি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সীমা ছাড়িয়েছে অনেক সময়। 'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পের শ্রীপতি ব্যবসায়ী। বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে সে ফিরবে ট্রেনে। ফিরবে বলে সে বাধ্য হয়ে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ওঠে। সেখানে একজন সাহেবের এক বাঙালি সাহেব আপত্তি করেন। বিনয় ও সৌজন্য দেখিয়ে কাজ হয় না। এদিকে বিয়ে বাড়ির পরিশ্রমে ক্লান্ত শ্রীপতির ঘুম দেওয়াটা খুবই দরকার। বসবারমতো কোথাও উঠলে শ্রীপতি প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দেবেন। কিন্তু দেখা যায়, বাঙালি সাহেবের টিকিট নেই। টিকিটের চেকারবাবুর পক্ষ শ্রীপতি চেকার চেকার বাঙালির কান ধরে গালাগালি দেয়। তখন শ্রীপতির বাঙালি-প্রেম জেগে ওঠে। সে সাহেবের ভাড়া মিটিয়ে দেয়। গল্পের মধ্যে একদিকে বাঙালি সাহেবের অন্তঃসারহীন চরিত্রটি অন্যদিকে শ্রীপতির বাঙালি-সুলভ সৌজন্য ও অভিমান—দুয়েরই চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে। তেমনি ঘটেছে 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পের অর্জুন চরিত্রে। সাত বেলোয় তথা অনাহার-না-খাওয়া অর্জুন কাকা মায়ের ধমকা থেকে দূরত্ব অবসরে পড়াশোনা শুরু করে। চা খেয়ে, চোখে তেল দিয়ে, নিজের বাড়ে চান করে চড় খেয়ে সে নিখুঁত পড়াশোনা চলায়। তার অধ্যবসায় প্রশংসিত হলেও তেমনভাবে পরীক্ষার পরীক্ষক অন্যেরও বিরক্ত হয়ে থাকে কেন করিয়ে দেয়। ব্যর্থ অর্জুন কাকা আমাদের সামনে দুঃখপ্রাণতঃ কিন্তু হিরো, খুব ভাবায়। শেষ পর্যন্ত অশান্তিচর্চা পাঠ করে মামলাতলেও চাকরি করতে থাকে। বাঙালি বিশ্বাস তার পক্ষতা প্রমাণ করে দেখায় যতোই। গল্পের বক্তাকে বিদ্রূপ আমার জন্য অর্জুন কাকা ৪ হাজার টাকা দিয়ে যায় শুধু এই যুক্তিতে যে, তার ভাইপো এ দারিদ্র্য কোনো মানুষ হয়নি। বহুদিন পরে গল্পের বক্তার কাছে মৃত্যুসংবাদের পরিচয়ে অর্জুন কাকা আসেন। আগেকার মতোই অসহনীয় এবং খেয়ালী। এখন প্রত্যেকেরই অভিভূত। নিজেই সব কিছু করে। গোলাপীর পাড়ের বদলে উদ্ভিদটিকে দুপায়ের ফাঁকে রেখে নিজেকে শক্ত করে। এতেন প্রতিকূলতার অর্জুন কাকা এমন এক মজবুত নিখুঁত তৈরি করে যাতে তার সর্বস্ব হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত টিকে আছে যাবার সময় নিতুক থেকে না ট্রেনে। ট্রেন ছেড়ে দেয়। অর্জুন কাকা দরজাটিতে কিন্তু ঝিমিয়ে থাকে। চরিত্রকেন্দ্রিক এই গল্পে খেয়ালী জেদী ও অধ্যবসায়ী অর্জুনকাকার চরিত্র নিপুণ শিল্পদক্ষতায় আঁকা হয়েছে। অন্যদিকে 'কপাট' গল্পে দেখি, বাঙালি গৃহিণীকে কমিউনিস্ট লেখকেরা চতুর্থ পক্ষের বিয়ে এবং যুবকের বাপকে কেনা শেষে অবশ্য অন্যো তেল কড়ি পাঁঠার মাংস সরবরাহ করতে হয়। সরকারি সাবলীল পর্যন্ত সেই যুবকের লোভটির হাতে। একদিন কচি পাঁঠা না পেয়ে চতুর্থপক্ষের বোনটিকেই শিকার হিসেবে ধরতে হয়। পাশের ঘির বাড়ির কাছে কপাট 'কালিক্ষেত্র' মাংসের প্রাধিক পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এও পেলেন বাবুর ছেলেটা নিখোঁজ হয়েছে, খুঁজে দিলে বকশিশ পাবে। পরান মাইতির সম্ভাবনা বেশি এই মাংস কিন্তু পাঁঠার শেষ পর্যন্ত বাবুর ছেলে নিখোঁজ হয়েছে শুনে কিছুক্ষণ ব্যতিক্রম এই ছবি: 'হঠাৎ পাড় করে এক্ষণে খুড় খেলে নীচের মাংস ঝুলোতে লাগল। তার চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরোচ্ছিল।' গুনবোর অকুণ্ঠ অন্তরালের মানিক যেভাবে তার শোধ নিয়েছে তা নাটকীয়। তবু বোধহয় অসম্ভব নয়। সোভিয়েত বিনিময় শেষ উদ্ভাবক বাবুদের (সোভিয়েত কমিউনিস্ট লেখকরা সব অন্তর্ভুক্ত) প্রতি নানা অভিযোগেই যে তারা ব্যবহার করে এবং উচিত

অনেক বড় বয়সীর সহানুভূতি প্রকাশে বাধা হয় দাঁড়ায়নি। অথবা 'মুহূর্তের প্রতিমা' কিংবা 'টেকির নিয়তে'র মতো বেশির ভাগ গল্পেই অনুভব ব্যক্তির অনুভূতি এ প্রেক্ষিতে অনুভবের সামাজিক গতি থেকে পৌঁছে দিতে পারেননি, কিন্তু 'কলকাতার' গল্পে দেখি, অচিন্ত্য অন্যতম দুটি সামাজিক দুশ্চিন্তা থেকে বাবাকে বেরোতে দিয়েছে মাথা দিয়ে। অন্য দিক থেকে মেয়েরা অচিন্ত্য জীবনের কথা বলা হলেও গল্পটি গাম্ভীর্যে সমস্যা বাড়িয়ে সামাজিক সমস্যাকে স্পর্শ করে। যেমনি তীব্র রেখে যায় 'অদ্বিতীয়া' গল্পে। সমরেশ বসু হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় পুরুষের বৈদিক আচরণের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন এই গল্পে। গল্পের বক্তা বসু প্রশান্তির স্ত্রীর মৃত্যুর খবর পেয়ে মর্মাহত। পরে শালীর আগ্রহে তার কাছে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে এসে দেখতে পেলেন সামনে সন্তানের সঙ্গে স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে শাশুড়ি মেয়েকে বউ সাজিয়ে বক্তার দ্বিতীয় বিয়েটি নিশ্চিত হয়ে গেছে। বাসর ঘরে এসে দ্বিতীয়ার মধ্যে সেই অদ্বিতীয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ। স্ত্রী তার দিদিকে বলেছিলেন সন্তুষ্টমাত্র সন্তান প্রসবের সময় যদি মারা যান তবে তার স্বামীর স্ত্রী হবে। স্ত্রী হবে কিনা সহজ কথাতেই বাকি রাখা। তাতেই শালীর এই কৌশল। বাকির কাজে টিকল সেল। তার ওপর দ্বিতীয়বার বিয়ের আয়োজন দেখে কথায়োর কালো ছাঁদ কাছে মর্মান্তিক কলমে কুটল। 'কুড়ানো মেয়ে', 'চন্দনীর রসিকতা' ইত্যাদি গল্পের লেখক প্রভাতকুমার অনেকটা এইরকম তীক্ষ্ণ বাক্য কৌতুকরসিক কটাক্ষ করেছেন। সামাজিক কলঙ্কেই মেয়াদে তার পুর ক্ষেপে বাড় তাতে গল্পটি শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা চরিত্রকেন্দ্রিক হয়নি, লেখকের তীব্র সামাজিক তাৎপর্যে পৌঁছেছে। বিভূতিভূষণ এবং সমরেশ মিত্র জানিয়ে গেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুখোমুখি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' কিংবা 'টোপ' ইত্যাদি বাংলা ছোটগল্পের এমন অধিক অনেকটি বিষয় শোষণভিত্তিক সংহত গল্পের পাশে এই কথাই বহুদিকে বসানো যায়। এই গল্পের নিষ্ঠ নিরাসক্তি কিন্তু সন্তুষ্টোর অনা

সুবিধাপ্রাপ্ত পুরুষ চরিত্রের প্রতি অবজ্ঞা যুক্তিহীন অবৈজ্ঞানিক সংস্কারের প্রতি। এসব গল্পে সামাজিক শর্ত কখনও কখনও পটভূমিকায় দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক শ্রেণিগত পার্থক্য যে অনেক সময়েই মানবিক অনুভূতিগুলো বিকৃত রূপ পায় না যেমন ইঙ্গিত কি 'ডাক্তার' গল্পে নেই। আগের ডাক্তারদের কাছেই এক ডাক্তার চিকিৎসালয়ে এক বৃদ্ধ মুসলমান দুহিতা কবে ছেলেকে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। ডাক্তার যেমন বলে 'ক্যাংক্রাম অরিস' হয়ে মুখের আধখানা পচে গেছে। বাঁচার আশা নেই। এই নীচতলে কণ্টক সকালের ডাক্তারিতে বাঙাপাড়াদের বাইরে দাওয়ায় থাকতে হয়। মুসলমানে বৃষ্টিতে গাছের খুঁটিতে দেহ বেঁধে মুসলমান ফকির তার ছেলের মাথাটি আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। একদিন ফকিরের প্রতি ডাক্তারকেই বলতে হয়— ছেলে বাঁচবে না। তারপর ডাক্তারের আর তাকে দেখা যায় না। একদিন হাটের মধ্যে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে দেখা যায়, তাকে ইট আর কাদা নিয়ে ফকির কী একটা করছে। ডাক্তার প্রশ্ন করলে বলে, ছেলের কবর তৈরি করছে। নাম ধাম জিজ্ঞেস করলে বলে, আল্লার আদেশমতো সে ভিক্ষে করে বেড়ায়। নাম ফকির-শাহজাহান। ডাক্তারদের বৈশরীয়ো ফকির শাহজাহানের কাদা ইটের তাজমহল গড়ার এই অপূর্ব ছবিতে মধুর হিসেবেই সমাজ ও ফকিরের প্রেমের শ্রদ্ধাশুভ্রতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এবং কোনো সন্দেহ নেই, ফকির চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই ইঙ্গিত সামাজিক বৈষম্যের প্রতি লেখকের তীক্ষ্ণ অঙ্গুলি নির্দেশ। কাজেই অনেক গল্পেই ব্যক্তি চরিত্র আপাতদৃষ্টিতে প্রাধান্য পেলেও ব্যাপক সামাজিক তাৎপর্যও যে একটু-আধটু উঁকি দেবে না তা নয়।

[৫]

বনফুলের লেখা বহু পারিবারিক গল্পের কোনোকোনোটিতে পরিস্থিতির দ্ব্যর্থতা বিশ্বাস প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'সন্ধ্যা' এমনই একটি গল্প। দুটি বন্ধুরকিশোরের স্বামী আর এক এক সচিব যোগাতে টেনে আরধার বলে টিকিট খুলে খুলে পড়ে দুর্গা আবার পড়। এই উদ্দেশ্যে পাঁচটি চিঠি খুলে চতুর্থটির মধ্যে ধুয়ো পেয়ে বন্ধ সে দশপ্রাণ তখন পঞ্চম চিঠিটি খুলে দেখে নিজেরই স্ত্রী অন্য এক প্রেমিকের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার ব্যাকুল অপেক্ষায় রয়েছে। সাংসারিক বিপর্যয়ের এই আকস্মিক মাধ্যমেই গল্পটির সমাপ্তি। এই গল্পের সঙ্গে অনেকটা মিল পাই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের। সেখানে অন্য লোকের সঙ্গে চিঠি-পড়ার বিকৃত ইচ্ছা গল্পটিকে ট্র্যাজিক পরিণতি দিয়েছে। তবে সেখানে অবিবাহিত পোস্টমাস্টারের ব্যক্তি-চরিত্রটি গল্পের ট্র্যাজিক পরিণতি এনেছে। আর এখানে সচিব তার নিজের অজান্তেই যে সাংসারিক বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলেছে তার প্রমাণ হাতে পেয়ে যায়। 'অদ্বিতীয়া' গল্পটিকেও শুধু ব্যক্তি চরিত্রকেন্দ্রিক নয়, পারিবারিক গল্প হিসেবেও ধরা যায়। এই ধরনের কথা আগেও বলেছি। এর সমতুল্য বর্ণনা-চাতুর্য 'হাত' গল্পেও আছে। কিন্তু সব পারিবারিক গল্পেই এই রকম আকস্মিকতার ফেরাফের নেই। আবার, পারিবারিক তাৎপর্যময়তায় যা স্বাভাবিক অনুভূত হয়ে আছে অনেক গল্পে। এবং পারিবারিক জীবন ছাড়িয়ে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকে গেছে কোনো কোনোটিতে— যেমন, 'বৌদি' গল্পে দেখা যায়, বৌদির বাবার কলেরায় মৃত্যু এবং তার অসামাজিক মৃত্যুর ফলে সুন্দর একটি নাম রাখার তার বৌদির মুখে যায়। মামারবাড়িতে বৌদি নাম নিয়েই আছে মানুষ হতে হয়। যেমনি আমার 'বোকারাম বাবু' গল্পে দেখি, দুখির দোকানের পাওনা, আরও টাকা রেখে প্রমাণ থেকে বোকার আবেদন, বিবাহিত মেয়ের তত্ত্ব পাঠানোর অনুরোধ, প্রভুর পদের বিনিময়ে জনাদের সম্ভব করার উদ্দেশ্যে বোকারাম বাবুর অফিস-ফেরত গল্প করার নিশ্চিন্ত অবসরকে নষ্ট করে। 'বিন্দু দি গ্রেট' গল্পটিতেও দুটি পারিবারিক জীবনের অর্থনীতিক পরিণতিকে সমান্তরালভাবে গেঁথে তোলা হয়েছে। একটি শিক্ষিত পরিবারের

স্বামী স্ত্রী, ঠাকুর ভিখু এবং তার সুন্দরী স্ত্রী সিলিয়াকে নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে। বয়স্ক দম্পতির জীবনের সঙ্গে এখানে কি চাকরের দাম্পত্য-জীবনকে বৈপরীত্যে আনা হয়েছে। পরে দেখা যায়, বাড়ির কর্তাকে ছেড়ে চলে গেছে যেমন গিন্নি দিদি, তেমনি ভিখুকে ছেড়ে চলে গেছে তার স্ত্রী সিলিয়া। পরে দুটি পরিবারেই স্ত্রীর প্রত্যাবর্তন। দিদি ফিরেছে অনুতপ্ত হয়ে, দাগীক হয়ে; কিন্তু সিলিয়া ফিরেছে [illegible] বীভৎস ব্যাধি নিয়ে, পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে। কিন্তু বাড়ির কর্তা স্ত্রীর প্রতিষ্ঠিত আসনে স্থির স্থির অভিমানী। ওদিকে চাকর ভিখু সুন্দরী স্ত্রীর চরিত্রস্খলনে উদ্বিগ্ন এবং উদ্বিগ্ন বলেই উদার। সুন্দরী স্ত্রীর চরিত্রস্খলনে নিজেকে সে দায়ী করেছে, বারবার এবং অত্যন্ত যত্নে পতিপ্রাণ মানুষের মতো স্ত্রীকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে ডাক্তারের আশ্রয় নিয়েছে বাড়ির কর্তার মাধ্যমে। স্ত্রীর অধঃপতনের সমস্ত দায়ির যেন তারই। এখানেই তাঁর জেতিলেন। এই পারিবারিক গল্পের বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত ও অশিক্ষিত বাটীক হয় নিচু নিম্নশ্রেণীর মানুষের সামনে একজাতীয় সমস্যা এনে দুটি শ্রেণী অন্তর্গত সার্থকভাবে চমৎকারভাবে ধরা হয়েছে। 'ঢুঁড়িটি' নামে একটি গল্প ('বনফুলের নূতন গল্প') লক্ষ করি, ছাতকা স্টেশনে রোজ এক বৌদ্ধ ভুলুয়া নিয়ে যে বোবা মেয়েটি ভিক্ষে করে, তার মা-কে বাবা ছেড়ে চলে গেছে। মা ঝি-গিরি করে, বেশ্যাবৃত্তি করে রোজগার করে। তারপর একদিন সেই রাক্ষসে কেউ খুন করে ফেলে যায়। তারপর থেকে স্টেশনে ট্রেন এলেই মেয়েটি আসে বাবা আসছে। একদিন একটি হ্যাটকোট পরা দেখে, মতামতি পলতে তার বাবার বক্তব্য। অথচ না জেনে তার বাবার ভিড়ে সে বাবাকে দেখেও অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ 'বাবা' বলে চিৎকার করতেই পুলিশের ধাক্কায় সে জ্ঞান হারায়। এদিকে কাগজে বাবার বক্তৃতার সারাংশ বেরোয়— 'ভিক্ষুকই আমাদের দুশমন'। একটি ছোট থেকে সামাজিক অবস্থানের শিকার একটি মূক মেয়ের জীবনকে নির্ভর করে সমাজকর্মী মুখোশ মুখোশ ছেঁটা ছাড়া এ গল্পে আর কী আছে! 'ঐরাবত' গল্পে বর্ণিত হিন্দুস্থানের যৌন বিকারের আরো আত্মসমর্পণ সামাজিক এক বিশেষ প্রবণতার প্রতিটি বনফুলের পরিহাস প্রকাশ পেয়েছে।

[৬]

বনফুলের বেশ কিছু গল্পে প্রত্যক্ষভাবেই সামাজিক নানা সমস্যার ছবি ফুটেছে। সমস্যার পরিবেশনে কোথাও ক্ষোভ, কোথাও কৌতুক, কোথাও বা নিছক নিষ্ঠুরতা। উদাহরণ হিসেবে 'জাগ্রত দেবতা' গল্পটির কথাই ধরা যাক। সনাতনপুর গ্রামে মহাদেবের উৎসবে দুটি পাঁঠা বলে পুজো হয়। অবশ্যই বৈজ্ঞানিক উন্নতির কারণে এই উৎসবের এতো ঘটা-বটা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রতি বছরই এই দিন একজন করে পাগল হয়। এবার উৎসব হল, কিন্তু পাগল কেউ হল না। সকলেরই দুর্ভাবনা নিশ্চয় কোথাও গোলমাল হয়েছে। অনেক খুঁজেও পাগল হবার প্রমাণ পাওয়া গেল না। অনেকেই অনেক খবর খাওয়া দিলেন। কিন্তু প্রবীণ নীলমণি কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না। তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন 'শীতলকণ্ঠ হরহরশম্ভু' হয়ে। সনাতনপুরের গ্রামবাসীরা তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন জাগ্রত দেবতার জাগরণ জেনে। উৎসবের সঙ্গে পাগল হবার বহুপ্রাচীন সংস্কার থাকায় যে সংস্কার বহুদিন ধরে চলে আসছে সেই সংস্কারই মানুষের মনে অস্বাভাবিক আবেগ সৃষ্টি করে—তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। মনের ওপর সংস্কারের এই নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়াকেই বনফুল ঠাট্টা কৌতুক সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। 'উৎসবের ইতিহাস' গল্পে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কলের তারায় তার ভাইপোর চাকরির জন্যে কীভাবে একাধিক লোককে উৎকোচ দিয়ে শেষে কলমের খোঁচায় চাকরি জুটিয়ে তারই কাহিনী বলা হয়েছে। তেমনি 'আত্মা উৎস' গল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন কিছু শৌখিন তরুণ স্বদেশপ্রেমিকের আত্মিক চরিত্রের ছবি। শৌখিন স্বদেশপ্রেমিকদের দিকে সেপাইদের হয় না—এ জ্ঞান তখন তাদের থাকেই কোথায়, খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক হবার জন্যে কালিদাসীর বিধবা স্ত্রী [illegible] নিয়ে সেই দলের দল [illegible] দুটি [illegible] শিং [illegible]। কিন্তু তাদের একজন পুলিশের হাতে অনশনের কারণে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখে সে তখন খেয়ে অন্য বন্ধুর নাম বলে দিয়েছে। স্বদেশপ্রেমিকের আত্মিক চরিত্রের প্রতি ধারাই এ গল্পের প্রকল্প। হয়তো এই গল্পে স্বদেশী চরিত্রের কোনো সাহসী ছবি নেই, কিন্তু 'লেখকের রায়বাহাদুর' গল্পে দেখি একবারের তৃপ্তী হয় ও ব্রিটিশ শাসন বিজ্ঞানের কথা খেয়াল পাওয়ার পথে এই রায়বাহাদুর, ব্রিটিশ শাসনের আনুগত্য করলে তাঁরই স্বাচ্ছন্দ্য হাতে এসে যাবে, অন্যথা করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা 'শিক্ষিত ভদ্রলোকে'র কাজ নয়। এই মনোভাব নিয়ে তিনি যখন ব্রিটিশ এজেন্ট হিসেবে সেখানেদের ও বিদ্রোহ ধরতে যান তখন একদিন [illegible] বন্দুকের গুলি ও গুলির আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসে দেখেন [illegible] সংবাদ। কেবল একটি দুঃখের গল্প আছে—[illegible]। আশ্চর্য হয়ে রায়বাহাদুর দেখেন তাঁরই [illegible] পুত্র। কনিষ্ঠের জন্যে কিছু রায়বাহাদুর [illegible] নিতে অনিচ্ছুক তুলে [illegible] কথা প্রত্যর্পণের জন্যে। এ গল্পে বনফুলের অনেক গল্পের মতোই 'চমক' আছে ঠিকই কিন্তু রায়বাহাদুরের প্রতিরূপ অনুশোচনার পাশাপাশি আত্মিক স্বদেশপ্রেমের বিদ্রোহী প্রতিনিধির অন্তরে আত্মবলিদানের ছবিটি মুহূর্তে উদ্ভাসিত। রায় বাহাদুরের আকস্মিকই যে দুঃখের বৈপ্লবিক স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে এটা ধরে নিতে হয় কিন্তু রায়বাহাদুরের জীবনে এই আকস্মিক ঘটনার পেছনে সাহসী তরুণের আত্মোৎসর্গ ঘটনাটিকে নিছক চৌম্বকী ঘটনার হাত থেকে কিছুটা বাঁচিয়েছে।

কিন্তু 'কলাই' গল্পে যেমন বনফুল দুর্নাম ছড়ানো সুদখোর বাবার লোককাহিনি উদ্ঘাটন করেছেন, তেমনি আবার দুর্নাম ভরা কমুনিস্ট লেখক হিসেবে তার সমবায়ের

কাছে সাহিত্যের উপকরণ কোনোভাবে অবহেলিত এসেছে বলে অন্তরাগে তার প্রতি বিরক্তি দেখিয়েছেন। সমাজের মানুষের সমস্যার এগালেই প্রাণ দেখিয়ে কলাইকে ইতোমধ্যে হতে দেখি, কম্যুনিস্ট লেখকের বাবার গল্প সবচে কাছেও বাণ আছে বলে তার লেখক পুত্রের একটা কেমন বাধ হচ্ছে তা বোঝা যায় না। এই রকম অবস্থা সামাজিক বিদ্রূপ আছে 'বেটী লোক' গল্পেও। এই গল্পে রবিবারের বিকেলে এক ভর্গশাখী নায়ক বিক্ষোভে না যেতে বিক্ষোভের আগে আগে হাঁটে। বনফুল বুঝে যান, সমাধান সবাইকে গাড়ি-ঘোড়া ছেড়ে হাঁটতে শেখায় না, বিক্ষোভকারীদের মধ্যবিত্তীয় বিক্ষোভ মিছিল দিয়ে দুনিয়া বদলে না। অর্থাৎ লেখক হিসেবে রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে বনফুলের বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা যে ছিল না তা বোঝাই যায়। এবং বিশুদ্ধ মানবতাবাদী হিসেবেই হৃদয়হীন যন্ত্র-প্রেমিক দিকে তাক করেছেন, আবার 'সেকালের রাজবাহাদুর'-এর মতো গল্পে রাজবাহাদুরের যন্ত্র-প্রেমি গল্পের আত্ম-নিবেদন ব্যাপারটিকে নির্ভর করে রাজবাহাদুরের হিটলার-বিরোধিতার প্রমাণ দেখিয়েছেন, 'নন্দর ও রোজারা' এবং 'দুই ভিখারি' গল্পে কিছু রূপকার্থে সাবলীলতায় প্রকৃতপক্ষে ও সম্প্রদায়ের আত্ম-পরিচয়ের প্রতি তাকেই দেখিয়েছেন তিনি। মানুষের বিচিত্র ব্যবহারেই কৌতূহলের বশে তিনি গল্প টেনে এনেছেন। শিল্পীর নিরাসক্তি কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হলেও মোটামুটি অনুযোগবিহীনভাবেই তিনি গল্পের গল্প টেনে এনেছেন।

আসলে আধুনিক সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বনফুলের অনীহার কারণ আমাদেরই অনতিক্রম্য রাজনৈতিক আত্ম-কলহ ও হানাহানি এবং কিছু সাময়িকীর কণ্ঠ চরিত্র। কিন্তু মোটামুটি একটা মানবিক আদর্শবাদিতা ও চারিত্রিক শুদ্ধি দিয়ে বনফুলের কামনাই যে নজর ছিল তার প্রমাণ 'তিলোত্তমা'-র মতো বড় গল্পেই তিনি রেখে গেছেন। স্বাধীনতার পর যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় আমাদের চরিত্রমূল্য নষ্ট করেছে তার প্রতিনিধি 'আটকে গেল' গল্পের অতুল—যে বাড়ীর আবদারে নষ্ট হতে গিয়ে মাস্টারকে মাতলামি করে 'শালা' বলে তাড়ায়—আর অন্য মাস্টারদের সাহায্যে পরীক্ষায় হলে বাইরে থেকে খাতা লিখিয়ে জমা দিয়ে বি এ পাশ করে। পরে মোটা কারবারীদের সঙ্গে মিশে আরামে-বিলাসে তার বিলাসিতাও বেড়েই যাচ্ছে। হঠাৎ তাদের ক্লাসের একটি ভাল ছেলের সঙ্গে তার দেখা হয় ও তাদের বাড়ি যায়। বাড়ির অতি সাধারণ পরিবেশ, পরিচ্ছন্ন মা-র মুখে হাসি ও বইপত্রের বিন্যাস দেখে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এই সহপাঠীর সঙ্গে নিজের দুর্দশা বারবার সে অনুভব করে। এই অনুভবের উত্তাপ কোনো বাইরের চাপ থেকে আসেনি, নিজেরই গভীর বিবেক থেকে এসেছে। এই রকম চারিত্রিক শুদ্ধতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট হয়েছে 'আমি কি পারব' গল্পে। গল্পের নায়ক রাজনৈতিক হানাহানিতে বাবাকে হারিয়েছে। যে বাবাকে মেরেছে তার বাড়িতেই আগুন লাগিয়ে সে পালিয়েছে। তারপর থেকে নারকীয় জীবনের ভেতর দিয়ে গেছে সে। এক ভয়ংকর শহরের মোড়ে বোমা ফেলে পালাতে গিয়ে তার পা কাটে। তারপর কোনো এক বাড়িতে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে অজ্ঞান। সেখানে সেবা-শুশ্রূষার পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে দেখে, যে বাড়িতে সে আগুন লাগিয়েছিল সেই বাড়িতেই এসে উঠেছে। এই বাড়িটি যেহেতু সেখানে তার মনে হয়, নারকীয় জীবনে যে অন্তর্জালা লাগিয়েছিল বলে তার ধারণা, তা ভুল। অবক্ষয়মাত্র কোথাও যায়নি—এখানেই আছে। একই বাড়িতে ফিরে আসায় ব্যাপারটা একটু বেশি নাটকীয় মনে হলেও সম্প্রদায়ের সীমা হারায়নি এবং শুদ্ধতার বোধটি তাঁর আবেগের পদ্ধতির মধ্যেই বিশ্বস্ততায়।

বনফুলের অসংখ্য গল্পের মধ্যে প্রথাবহির্ভূত নানা নাটকীয় কৌশল ও তৃতীয় 'sting in the tail' জাতীয় আকস্মিকতা থাকলেও কিংবা অনেক বড় গল্পবস্তুর মধ্যে সাধারণ event বা ঘটনার পরিণতি পেলেও যে-সমস্ত গল্পগুলিকে বেছে নিয়ে ব্যক্তি বা চরিত্র নির্ভর, পারিবারিক ও সামাজিক—এই তিনভাগে ভাগ করে নিয়ে (যদিও সুবিধের জন্যে বলা। অনেক সময় তিন শ্রেণী পরস্পর মিশে যায়) আলোচনা করেছি তাতে এইটেই প্রমাণিত হয়, যে শ্রেণীর গল্পই তিনি লিখুন, মানুষের অন্তহীন বৈচিত্র্য যেমন তাঁকে টেনেছে, তেমনি মানুষের অন্তর্নিহিত শুদ্ধতার বোধটিকে তিনি কাউকে বাদতে ভোলেননি, ছোটগল্পের উজ্জ্বলিত মুহূর্তে সেই বোধটিকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

[৭]

এবার শুধু ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজ নয়, সামগ্রিকভাবে শুদ্ধ মানবিক চৈতন্যের জাগরণের প্রতি ইঙ্গিত দেবার সূত্রে বনফুলের গদ্য-কবিতা বা শ্লোক-শেষের জাতীয় রচনায় কিছু পরিচয় নেওয়া যাক। কখনো পৌরাণিক গল্পের ধাঁচে, কখনো রূপকথা-উপকথার ধাঁচে, বনফুলের বেশ কিছু গদ্য রস ছেড়ে দেয়। ভারতীয় সাহিত্যের নীতিকথা উপকথার ঐতিহ্য, বিদেশি কিছু রূপকথা-উপকথা, রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র কিছু অনুবাদ, টুর্গেনিভের 'সেনিলিয়া'র মতো গদ্য-কবিতা, পরে কাফকা-জিব্রানের গল্প কিংবা খলিল জিব্রানের গদ্য-কবিতা এই ধারাই বহন করে এনেছে।

বনফুলের এই জাতীয় রূপক গল্পের প্রচ্ছন্ন তাৎপর্যের কথা ভেবে দেখা যাক। যেমন 'বিধাতা' গল্পটি। বিধাতার কাছে একে একে অভিযোগ আসে। প্রথম উপস্থিত হাতি। মানুষ অপমানকে বলছে, বাঁচাও। বিধাতা বললেন, আচ্ছা। তারপর বাঘেদের পালটা অভিযোগ: শিকারীর উপদ্রব, বাঁচাও। বিধাতা বললেন, আচ্ছা। শহরের বাড়ির ক্ষেতি লিলি তাঁর শহরের বাড়ির কোনো মহিলার সম্পর্কে বললেন, নারীর বড় বেয়াক্কা। নিচু নতুন গয়না পরে থাকতে সদা ব্যস্ত থাকছিল। মেয়েরা তুমি চিৎ হয়ে যেন বলো পরাবার। মাদিকে যেন একটু শিক্ষা দিয়ে যাও তো। বিধাতা

বললেন, আচ্ছা। বার্নিক বললে, তোমাকে বুঝতে চাই। বিধাতার একটি উত্তর। চিনেয় চেঁচিয়ে বললে, কালনিদ্রার হাত থেকে বাঁচাও। একই উত্তর, আচ্ছা। বাংলাদেশ থেকে এক তরুণ কেউ লেখা ছাপাচ্ছে না বলে প্রবাসীতে লেখা ছাপাতে চায়। তাই রামানন্দবাবুকে সদয় হবার অনুরোধ করতে বললে বিধাতাকে। বিধাতা বললেন, আচ্ছা। নিবিষ্ট একগুলি আজ্ঞা দিয়ে বিধাতা ব্রহ্মাণ্ড-বাড়ি থেকে সবাকের তেজ আনিয়ে নাকে দিয়ে শুয়ে নিদ্রায় মগ্ন হলেন। আর ঘুম ভাঙেনি তাঁর। লেখাপোকের কাছে এই অবিরল প্রার্থনায় মানুষের আত্মবিশ্বাস ও আত্মচেতনার অভাবকে প্রতিটি লেখকের কৌতুকবিদ্ধ করল।

কিন্তু 'চৈতালী ও পূরবী' কবিতাটিতে এমন কৌতুক নেই, আছে ভালোবাসার অনিক বৈপরীত্য পেয়ে আর কারো প্রতীক্ষা। সৃষ্টির আবেগকে শিল্পী যেমন একবার পেয়ে পুরোপুরি তাকে ধরে রাখতে পারে না অথচ তাকে ধরে রাখার জন্যে আজীবন আপ্রাণ চেষ্টা করে, সেই পূর্ণতার অনুভূতি তার মন-প্রাণকে ভরিয়ে তোলে, কিন্তু অপূর্ণতার দৈব অসন্তোষ নিয়েই আজীবন কাটিয়ে দেয়, মানুষের বৈপরীত্যবোধ যেমন তাকে ভালোবাসায় কাতর করে চিরকাল, পারিপার্শ্বিক জীবনের গ্লানি যেমন তাকে বিচলিত করেও তার সেই বোধকে একেবারে নষ্ট হতে দেয় না তেমনি এখানে বনের একটি ফুল ভ্রমরের কাছে বিকাশের প্রশস্তি শুনে যৌবনলগ্নে হাসলে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে পারেনি। ভ্রমর চলে গেলে তার সন্ধ্যা যৌবনের ঘুম ভেঙেছে। সন্ধ্যায় আবার আঁধারে জোনাকির কাছে তার প্রতীক্ষার বেদনা জানিয়েছে।—জোনাকিকে বলেছে, ভ্রমরের প্রতীক্ষায় সে রইল। ভ্রমরের কাছে খবর দিতে বলেছে। জোনাকি উড়ে গেছে। অন্ধকার নিবিড় হয়ে এসেছে। পরের দিন সন্ধ্যায় জোনাকি এসে বলেছে, তাকে সে খুঁজে পায়নি। ফুল বললে, 'কাকে?' 'তুমি কাল যার কথা বলেছিলে।' 'আমি তো কাল ছিলাম না—আজ ফুটেছি।' 'কালকের ফুল কোথায়?' 'সে ঝরে গেছে। তারই পাশের বোঁটায় আমি ফুটেছি আজ।' জোনাকি চুপ করে থাকে। তখন নতুন ফুলটি বলে, 'আচ্ছা, তুমি একজনকে চেন কি?' 'কাকে?' 'যে আজ সকালে কেমন গুঞ্জন গানে আমাকে বলে গেল, দুটি কোনো একটা কানমিতা/মর্ম জোগাড় না এমন কারণে। তার জন্যে সারাদিন বসে আছি আমি। যদি তার দেখা পাও জানিয়ে দেবো তাকে একবার।' বলবে? 'দেখা পাই তো বলব' বলে জোনাকি মেলে উড়ে গেল। লেখক বলছেন, 'আঁধারের বুকে কোটি একটি জোনাকি।' এমনি করেই একটি একটি ফুলের মতো একটি একটি প্রেমিক মানুষ ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে—'সে কোথায়? সে কোথায়?' এই ব্যাকুলতা কীসের? সেই শুভ চৈতন্যেরই টানে একের পর এক মানুষ বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে রেখে চিরদিন অপেক্ষা করছে। পূরবীর সুরে সেই চৈতালীরই প্রতীক্ষা।

আরেকটি গল্পের উদাহরণ দিই। পশু-পাখির মুখে বলা fable জাতীয় গল্পের কাঠামোতে তৈরি এমন একটি 'পাখি'। একদিন এক ময়ূরীর সামনে ময়ূর নাচছিল। হঠাৎ সিংহ এসে ময়ূরকে বললে, 'নাচ বন্ধ কর।' ময়ূরী রয়েছে কাছে, কাজেই ময়ূর নাচ থামায় না। সিংহ চিৎকার করলে—বন্ধ করো, বন্ধ করো। ময়ূরের ভ্রূক্ষেপ নেই। সিংহ তেড়ে গেল ময়ূরটাকে। ময়ূর-ময়ূরী উড়ে গিয়ে গাছে বসল। সিংহের আস্ফালনে লাভ হল না। বাঘকে ডেকে বললে, ভয়ানক অপমানিত হয়েছি আমি। ওকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করো। বাঘ ব্যবস্থা করবে বলে বাড়ি গেল। কারণ, বাঘের শিকার করবে বলে বেরোলে ময়ূর চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দেয়। এক দিন হঠাৎ এক শৃগাল এসে ময়ূরকে সমাচার জানাল। তখন ময়ূর বাড়ি ছেড়ে ডালে গিয়ে বসল। শৃগাল বললে, আমার স্ত্রীর সন্তান হবার পর কেমন যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বাঘ আমাদের চিকিৎসক। সে বললে, ওকে যদি ময়ূরের নাচ দেখানো যায় তো উনি সেরে উঠবেন।

ময়ূর কেকারবে হেসে বললে, আপনার স্ত্রী অসুস্থ। এ জন্যে দুঃখিত। কিন্তু আমার নাচ শুধু আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে। তোমার কেন প্রাণ। আর সিংহ দেখেছিল, সেখানেই নাচের সময় ময়ূর যখন নাচ দেখাবে তখন লাফিয়ে পড়বে বাঘ। পরের দিন এল একটা লাশ। লাশ তো ময়ূরের বাপা। তাকে দেখেই ময়ূর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আর্তনাদ করলে। শিকারের দিকে একাগ্র হয়ে বাঘের ঘাড়ে সিংহ লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু ধরতে পারল না। ময়ূর উড়ে গেল গাছের ডালে। তাকে ডেকে বললে, এ দুর্ব্যবহারের কারণ কী? সিংহ বললে, তুমি আমাকে অপমান করেছ—। ময়ূর বললে, আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে নেচে থাকি। এতে আপনি অপমানিত হলে আমি নাচার। সিংহীকে দেখে আপনি যখন কেশর দুলিয়ে লাফ মেরে গর্জন করেন তখন তো আমি অপমানিত বোধ করিনি। ময়ূর তখন একটা আনন্দের নৃত্য করি না। সিংহ বললে, তুমি রাজার ক্রোধ অবজ্ঞা করেছ, আমি অপমানিত বোধ করছি, আপনি তো পশুদের রাজা, আমরা পাখি। সিংহ বললে, পাসপোর্ট ভিসা কী? ময়ূর তার পাখা দুটি মেলে দেখালে তার পাসপোর্ট-ভিসা! তারপর বললে, আমাদের আপনি আক্রমণ করতে পারবেন না। জলে স্থলে আকাশে আমাদের বিচরণ। এ আমাদের বিধিদত্ত অধিকার। আমার দুঃখের প্রাণ কেড়ে নিয়েছেন। আমি এর প্রতিশোধ নেব। সামান্য একটা পাখি তুমি প্রতিশোধ কী নেবে—সিংহ হা হা করে হাসলে। কয়েক দিন পরে একটা মেষশাবককে মেরে সিংহ যখন খাবার জোগাড় করছে তখন একটি ঈগল বজ্রের মতো আকাশ থেকে নেমে এসে তুলে নিয়ে গেল মেষশাবককে। বললে, তোমরা দুর্বল জীব। আমরা আকাশচারী, আমরা শিল্পী, আমরা কবি, আমরা যোদ্ধা। আমাদের এক প্রজাকে অপমান করে তুমি সমস্ত পাখী জাতিকে অপমানিত করেছ। তাই এই শিক্ষা দিলাম। আমরা নীচ নই। পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খাই না। শূন্য থেকে মেষ শাবকটা ধপাস করে পড়ল। সিংহ নির্বাক।

অনেক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন বয়ঃক্রমের মানুষের যে জটিলতার প্রয়োজন এই প্রবণতা তো মানুষিক মেধারূপ অর্থহীন। গল্পের অবয়ব ছড় হয়ে আবার সেন্টিমেন্টালিজম চেষ্টা করেছি, বিভিন্ন চরিত্রে ও প্রতিবেশ জাতীয় বিকাশকে তৈরি করে বহু মানুষকে এবং সেন্টিমেন্টালিজম, বা ইমোশনাল যুক্তিতে কেমন চেষ্টা করেছি, নতুন সৃষ্টি করেছি, বিজ্ঞানে নতুন করেছি। কিন্তু এরই মধ্যে দু একটি বিচিত্র নতুন প্রমাণ করে দিয়েছে, মানুষের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে 'ম্যানিফেস্ট ভাব' তৈরি হয়, পরে সত্য বড় রেখেছে ভুল হয়নি না। আধুনিক বিশ্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে বিপ্লবী বিজ্ঞান হয়েছে তার পেছনেও এক সংকীর্ণ স্বার্থ অপব্যয়কারী মনোভাব কাজ করছে। এশিয়া-ইউরোপের, শাদা কালোর দ্বন্দ্ব কমন ষাঁড় হয়ে উঠেছে। আবার মানবজাতির সার্বিক উন্নতিতে যেন বা কারো কোনো হুঁশ নেই, দেশ বিদেশে ধর্মান্ধ, শ্রেণিগত কিছু সন্ত্রাসেও মাততে হয়। সহযোগিতা ও ঋজুতা, ভালোবাসা ও আত্মত্যাগে মানুষের অগ্রগতি—শুধু স্বার্থে পরিচয়ে, অবশ্য সেতো আমরা এই সত্য সত্যকে ভুলে যাই। 'পরিচয়' ছবিটিতে মায়ের বাবটি কুমোর সাথে কুমোরের কথাবার্তায় আমরা শুনেছিলাম: 'আমি আকাশের আর তুমি মাটির। আমি আকাশ থেকে নেমে এসেছি মাটিতে তোমাকে দেখাতে হবে। এই পরিচয়ের বাঁধনেই আমরা চিরকাল বাঁধা। আমাদের জন্য পরিচয় নেই।' মানুষের সহমর্মিতা রাজনীতির এই ব্যাপক প্রয়োগে মানুষের প্রতি বনফুলের অন্তহীন ভালোবাসাই তাঁকে বড় শিল্পী করে তুলেছে। এই মুহূর্তে আর এক শিল্পী শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ে যায়। সংসারের বিচিত্র মানুষ 'স্বকালের ব্যাপার' অন্তত নাটক কল্পনা সংসার ত্যাগ করে ব্রহ্মার কাছে মানুষ সাত্ত্বিক বৃদ্ধি চেয়ে এক তোরণ ইচ্ছা করলেন। কিন্তু মন একটিই রইল। সংসারের সব রকম মানুষের বিরূপ একটি উৎকট উপলব্ধি হতে লাগল। তখন ব্রহ্মার কাছে সম্পূর্ণ মন চাইলেন। তাতেও বিপদ। সম্পূর্ণ মনই বলে, আমি বলব। কথা বলার আবার একটি মনকেই দৃশ্যতঃ করতে হয়েছে। একবার ব্রহ্মার কাছে আর না গিয়ে সনকাদি তাপস মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। সনকাদি তখন জ্যোতিষ্কণ হয়ে আকাশে একটি স্তরে একীকরণ হয়েছেন। সকলের সুখদুঃখ পৃথক করে বুঝতেন, আবার একত্রিত বুঝতেন। ব্রহ্মা সনকাদের খবর না পেয়ে একদিন দেখা করতে এলেন। সনকাদি বললেন, 'সুখের থেকেও একত্র বেশি হয়। একবার জ্যোতিষ্কণ হয়েছি, বিকল ইন্দ্রিয়, বিকল দেহমন। তাই মহার শক্তি আরও বেশি শিখেছি। সর্ব অবয়বের দায়ভার মুক্ত হলেও হয় প্রভু, আপনার মায়া নির্মম সাক্ষী হয়ে থাকতে পারি না।' নানা কর্মের ব্যাপ্তিতে সনকাদি ব্রহ্মাকে বলে ফেললেন, এইবার মুক্তি দিন। ব্রহ্মা মনে করিয়ে দিলেন, একসময় সবাকে মুক্তি দিতে তুমি একাই মুক্তি চাও? সনকাদি যেমন একটু লজ্জিত হয়েই বললেন, থাকবে। মুক্তির দরকার নেই। ব্রহ্মা বললেন, দরকার না থাকলেও তুমি পেয়ে গেছ। সনকাদি জানতে চাইলেন, এ কি রকম মুক্তি, লোকে আসক্তি চায় না, নাটির আবার আবরণ নেই।

বনফুল যেমন শরৎচন্দ্রের কথাশিল্পের মধ্যেই সহযোগিতা, ভালোবাসা, আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ সেবাতেই মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। তবু শরৎচন্দ্র ছিলেন রোমান্টিক, বনফুল বিজ্ঞাননিষ্ঠ। কিন্তু রোমান্টিক শরৎচন্দ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংকটকালে মুমূর্ষুর জন্য চিন্তিত হয়েছিলেন। 'মানুষ জাতির কথা' কিংবা 'ত্রিনিবাসের'র মতো রচনা নৈরাশ্যের গল্প লিখেছিলেন। কিন্তু বনফুল সমাজের অবক্ষয়ে বিষণ্ণ হয়েছেন, বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু মানুষকে ছেড়ে যেন বিজ্ঞানীর নতুন মানুষ জাতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে—এমন চিন্তা গ্রাস করেনি তিনি বলেননি। তাঁর বিচিত্র সন্ধানী মনই তাঁকে নৈরাশ্যের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। বিষয় হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি জগৎ দেখেছেন। তাঁর শেষদিকের লেখা 'ত্রস' আর 'সত্যে'র ছোট নাটিকাটি পড়লেই এই প্রসন্নতার মাত্রা বোঝা যাবে। গল্পের শৌখিন কথাকার 'ত্রস' নাট্যরূপদা সাক্ষাৎকারী 'ত্রসবাসী' হয়ে উঠেছে।

[৮]

বনফুলের গল্প বলার কৌশল বড় বিচিত্র। কখনো দশ-পনেরো লাইনের মধ্যে স্কেচ এঁকে, কখনো বা তার চেয়ে একটু বড় আকারের মধ্যে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও রূপকথার ভঙ্গিতে, কখনো রূপকের আধারে, কখনো বা সংক্ষিপ্ত পরিসরে বৈপরীত্য ফুটিয়ে বা আকস্মিক চমক দিয়ে, কখনো বা রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' জাতীয় গদ্যকাব্যের ভঙ্গিতে, কখনো বা অসাধারণ চৌকশী ভঙ্গিতে (নবমঞ্জরী সংকলনের 'চৌন' গোলায় এই ভঙ্গির অনাহুত শ্রেষ্ঠ গল্প। পৌরাণিক পুকুরে মাছের চার ফেলে কৈবর্ত স্ত্রী-কন্যা ধরা এবং পরক্ষণে বাইশটি হাতা ফেলে কেউ আর ধরার পর কেউ তুলতে পারে?) কখনো বা আত্মবিক রোটিশয়ের পরিসরে জীবনের নানা সমস্যা, দুর্নীতি বা আত্মজিজ্ঞাসাকে তুলে ধরে। সব সময়েই যে এই ভঙ্গি-বৈচিত্র্য সার্থক তা নয়। গল্প বা রূপক অনেক সময়েই জমা বাঁধেনি, বৈপরীত্য অনেক সময়েই স্বতঃস্ফূর্তি হারিয়েছে, আকস্মিকতা কৃত্রিম লাগে। তবু বনফুলের পরীক্ষাপ্রবণ মন জীবনের নানা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সজাগ—কখনো ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ, কখনো মমতার মেদুর। সমসাময়িক প্রকাশে অনেক সময় তিনি যথার্থ সমালোচক নন, রাজনৈতিক মতবিশেষের প্রতি তার বিদ্বেষ ভিত্তিহীন, তবু আদর্শবাদী, মানবতার সত্যানুসন্ধান তাঁর এই বিচিত্র পরীক্ষাপ্রবণ গল্পসাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। নানান রূপে তাঁর গল্পে সেই রোটিশয়ের কিরণ প্রকৃতির চরিত্র 'ডানী' কিশোরীর কলকণ্ঠের মতোই সপ্রাণ ও উজ্জ্বল—সেই নীল আকাশের গায়ে উড়ন্ত বকের পাঁতির মতো—আর মুগ্ধ ভোরের প্রথম আলো, যার পরীতে খোলা জানলায় একটু রোদ লেগেই থাকে।

'বনফুল' ও কলকাতা

শান্তিদাশঙ্কর দাশগুপ্ত

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)-এর জন্ম ৪ শ্রাবণ, ১৩০৬ সনে, ইং ১৮৯৯, ১৯ জুলাই পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে। বাবা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় সেখানে সর্বজনপ্রিয় ডাক্তার ছিলেন। কয়েক বছর মণিহারীর মাইনর স্কুলে পড়ে ১৯১৪ সনে ভর্তি হন সাহেবগঞ্জের রেলওয়ে স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে। থাকতেন স্কুল বোর্ডিং-এ। ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিলেন। যখন থার্ড ক্লাসে তখন মনে সাহিত্য-প্রেরণা জেগে ওঠে। একটি-দুটি কবিতা লেখা শুরু হয়েছে তখন। একটি হাতে-লেখা কাগজ বের করলেন, নাম দিলেন 'বিকাশ'। সকাল-সন্ধ্যা পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। 'বিকাশ'-এর জন্য কাজ করতেন একটু বেশি রাতে। শিক্ষক শুভানুধ্যায়ী, 'বড়ো' বলাইচাঁদের কবিতা পড়ে খুব খুশি। কয়েকটি কলকাতার বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন। প্রথম কবিতা ছাপা হল কাশীপ্রসাদ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায়।

সকলেই খুশি। খুশি হলেন না কেবল হেড-পণ্ডিত রামতনু ঝা। বলাইচাঁদকে ডেকে গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোমার বাবা যে পয়সা খরচ করে তোমাকে বোর্ডিং-এ রেখেছেন তা কি কবিতা লেখার জন্য? সংস্কৃতে তোমার ৮০/৮৫-র বেশি নম্বর ওঠে না। কবিতা লেখা বন্ধ করলে তুমি সংস্কৃতে ১০০-র ভিতর ১০০ পাবে। আর কখনও কবিতা লিখবে না।' এখন উপায়? উপায় বাতলালেন বন্ধুরা। তিনি ছদ্মনাম গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। বলাইচাঁদ ছেলেবেলা থেকে বনজঙ্গল ভালোবাসতেন। তাই ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন বনফুল। বয়স তখন ১৫। সেই থেকে 'বনফুল' বলাইচাঁদকে প্রায় লুপ্ত করে দিল।

বনফুল একটু বেশি বয়সে লেখাপড়া শুরু করেন। সাহেবগঞ্জ থেকে ১০ টাকা বৃত্তি নিয়ে ১৯১৮ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেন। তখন তাঁর বয়স আঠারো ছাড়িয়েছে। তাই এস-সি পড়তে ভর্তি হলেন হাজারিবাগের বিখ্যাত কলেজ সেন্ট কলম্বাসে। বিষয় নিলেন রসায়ন, গণিত ও বোটানি।

বনফুল ইতিমধ্যে কবিতা লেখায় যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। নাটকেও হাত পাকিয়েছেন। ইতিহাস তাঁর কলেজের বিষয় না হলেও ইতিহাস পরীক্ষার সময় ছাত্রদের আনন্দ দিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকের একটি গানের অপূর্ব প্যারডি রচনা করেছিলেন—

"আমি এসেছি এসেছি বঁধু হে
টেস্টটি পাশ করে ইতিহাস,
আমার যেটুকু আছে, এনেছি তোমার কাছে
খাতা ভরে দেবো ফিরে পাস।
ঐ জেগে আসে উজ্জ্বল ইতিহাস গৌরব,
জেগে আসে আকবর বাদশার নাম।
জেগে আসে অশোকের "ধৌলি" লিপি পর পর
জেগে আসে পাল, সেন, শাহ।
ওগো অনেক লিখেছি আমি
কত দাও তাও জানি,
একেবারে ক'রো না ফুটান।"

যাই হোক, আই-এস-সি পাশ করার পর বনফুল বিহার সরকার কর্তৃক বাঙালিদের একজন মনোনীত হলেন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ার জন্য। পাটনায় তখন মেডিক্যাল কলেজ ছিল না। এই জন্য বিহার সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ দিতেন বাংলা সরকারকে।

মনোনীত হবার জন্য নিয়মানুযায়ী বনফুল দরখাস্ত করে ছিলেন বিহারের Inspector General Of Civil Hospitals-এর কাছে। তাই কি চিন্তা নিয়ে দেরি করছিলেন। শেষ পর্যন্ত একেবারে শেষ সময়ে আই জি-র টেলিগ্রাম এল যে বনফুল মনোনীত হয়েছেন। সেই টেলিগ্রাম নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে এলেন

১৯২০ সালের জুন মাসে। সেদিন ছিল ভর্তি হবার শেষ তারিখ। কলেজের অফিসের হেড ক্লার্ক ট্রেইনার সাহেব তাঁকে বললেন—'ট্রেইনারে ভর্তি হবে না, তাই কী-ও দিতে হবে।' বনফুল তো মহা মুশকিলে পড়লেন। কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। তখন পড়ে গিয়েছিলেন একটি বুদ্ধি—পরদিনই তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক উইলসন সেন। তিনি সরকারি সিভিল এবং ক্রিমিনালের কর্তা হন। প্রিন্সিপাল ছিলেন সুদূর সংস্পর্শে ট্রেইনার হতে বনফুলকে নিয়ে দৌড়ে করে অফিসে ঢুকে নিজেই লিখলেন—'Admit him'। সেই ঘটনার জন্য ছিল কিছু উষ্মা প্রকাশ করে। তখন না পারলেও প্রায় দু'বছর পরে এই সেই ট্রেইনার বনফুলের কাছ থেকে ৫০ টাকা ঘুষ আদায় করতে চেয়েছিলেন।

সেই সময় মেডিক্যাল কলেজের হস্টেল ছিল না। বহু এবং মির্জাপুর স্ট্রিটে শুধু মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি মেস ছিল। সব সিট ভর্তি হয়ে বনফুল সেখানে জায়গা পেলেন না। দেওঘর থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতেন। সেই ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের জীবন আজ ৯০ বছর পরেও অপরিবর্তিত। তখন স্টেশনে কিছু একটা বাঁশেই আজকের মতো ভাঙচুর হত না। এই নিত্য যাতায়াতকারীদের বিষয়ে বনফুল তাঁর আত্মজীবনী, 'পশ্চাৎপট' লিখেছেন:— "আমি জানতাম বাঙালি বেশিরভাগ এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্রের আভাস পাইলাম। বাঙালির প্রচুর বৈশিষ্ট্য তাহাদের অধিকাংশই অকিঞ্চিৎকর কেরানি। হয়তো কিছু কিছু থাকিত। কিছু ব্যবসায়ী, কিছু ভিক্ষুক প্রভৃতি আমার সঙ্গী হইত। আমরা বিশেষ করে সেদিন যে ছবি আঁকা হইয়াছিল তাহাতে নানা রং। ব্যানার্জি রং, মুখার্জি রং, বন্দ্যোপাধ্যায় রং, চট্টোপাধ্যায় রং, ভট্টাচার্য রং, অমুক রং-এর মিশ্রিত ছবি সেটি। এই ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের একটি সংঘ গড়ে উঠেছিল ট্রেনের মধ্যে। মুড়ো, ঝাল, কানা, খাঁদা প্রভৃতি সম্বোধনে অনেকে অনেককে ডাকিতেন। অনেকে অনেকের জন্য বেঞ্চের সিটটি রিজার্ভ করিয়া রাখিতেন। বেঞ্চির শেষ প্রান্তে ও বেঞ্চিতে দুইজন মাঝখানে বেঞ্চিতে দুইজন বসিয়া হাঁটুর উপরে চাদর বা খবরের কাগজ বিছাইয়া তাস খেলিতেন। পরনিন্দা ও পরচর্চার আসরকে জমজমাট আরও করে তুলত হাসি ঠাট্টা। অনেক ডেইলি প্যাসেঞ্জার ছোট ছোট বোতলে শিশিতে তেল টিফিন লইয়া যাইতেন। একজন ডেইলি প্যাসেঞ্জার একদিন বসবার জায়গা একটি টিনের বাক্সে করিয়া আনিয়াছিলেন। ট্রেনে বসিবার জায়গা এমন বিচিত্র ভঙ্গিতে বসিয়াছিলেন যে উপর আর কেহ তাঁহার উপর দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। ডেইলিওয়ালাদের অনেক হয়তো আজ শুনিলে দুঃখ।"

সে যুগেও মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র-শিক্ষক মিলে নাট্যোৎসব করতেন। পুরুষরাই মেয়েদের পার্ট নিতেন। তখনও মেয়েরা মেডিক্যাল শিক্ষা নিতে এগিয়ে আসেননি। একবার অ্যানাটমির সহকারী অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বললেন, "বনফুল, আমাদের থিয়েটারের জন্য গান একেবারে না লিখে দিতে হবে তোমাকে।" বনফুল তিন ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ গান লিখলেন। তার প্রথম স্তবকটি এই:—

"মরণ লইয়া খেলা যার খাটে,
যেথা ঘোরে সাথী
আর্ত আতুর আতুর লইয়া
কাটাই দিন রাতি,
তারি মাঝখানে আমরা
হেথা আজিকার মিলিয়ে
ফুলপুষ্প আনন্দ গান
হাসিতে খেলেছি হিয়ে
এস গো তোমরা সবে
দুখীর মত খেলা খেলিবারে
আনন্দ উৎসবে।"

মেডিক্যাল কলেজে থাকতেই বনফুল তাঁর প্রথম নাটক লিখলেন "রূপকথা"। এক বন্ধু নাটক শুনে মুগ্ধ। তাঁর প্রস্তাব ও উৎসাহে দুই বন্ধু নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাজির হলেন শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায়। বেলা ১০টা তখন। নাটকটি শোনাতে চাইলে শিশিরবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—"নিশ্চয় শুনব। একটু বসুন, খেয়ে নি।" খুব জম জমাট খেয়ে তারপর দুই বন্ধুকে তাঁর গাড়িতে তুলে গেলেন তাঁর থিয়েটারের নিজস্ব কামরায়। নাট্যকার ও তাঁর বন্ধুকে দুই চেয়ারে বসিয়ে নিজে তাঁর বিছানায় শুয়ে চুরুট ধরিয়ে বললেন, "এবার পড়তে শুরু করুন।" পড়া শেষ হবার পরে শয্যায় উঠে বসে বললেন—"খুব ভাল নাটক। আমার পয়সা থাকলে মঞ্চস্থ করতাম। কিন্তু এখন আমার দুর্দিন চলছে। তবে আপনার নাটক লেখার হাত আছে। আবার লিখে যান।" বহু বছর পরে শিশিরবাবু হঠাৎ একদিন ভাগলপুরে বনফুলের কাছে এসে হাজির। দেখা হতেই বললেন—"মনে আছে বহুকাল আগে বলেছিলাম, নাটক লেখার হাত আছে আপনার, এবার আপনার নাটক অভিনয় করার অনুমতি চাই।" বনফুল স-স্মিতে জানালেন—"অভিনয়ের অনুমতি ইতিমধ্যে শম্ভু মিত্র এসে নিয়ে গেছেন।" শিশিরবাবু নিরাশ হয়ে সেই দিনই কলকাতা ফিরলেন। পরে অন্য নাট্যকার দিয়ে মাইকেলকে কেন্দ্র করে নাটক লিখিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন।

পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার আন্দোলন ছাত্ররা হামেশা করেছে। তবে আজকের মতো আন্দোলন অবাধে নয়। তখন কলকাতায় বাস চলা শুরু হয়নি। সেদিন tram strike ছিল। একদল তৃতীয় বার্ষিক মেডিক্যাল ছাত্র গেটে মোটর অধ্যক্ষের বাড়ি উপস্থিত। দাবি থার্ড এম বি পরীক্ষার দিন পিছিয়ে দেওয়া হোক। অধ্যক্ষ বাইরে এসে অত ছাত্র দেখে জিজ্ঞাসা করে বললেন—"এ কি! আমার বাড়িতে এত ডাক্তার কেন। বাড়িতে কারো তো অসুখ নেই।" বনফুল এগিয়ে এসে নম্রভাবে বললেন—"স্যার আমাদের থার্ড এম বি পরীক্ষার দিন পিছিয়ে দিন। কোর্স শেষ হয়নি, পরীক্ষা দেব কি করে?" অধ্যক্ষ বললেন—"বেশ, কোর্স শেষ না হয়ে থাকলে পরীক্ষা পিছিয়ে দেব। তুমি পরে ইউনিভার্সিটিতে দেখা করো।" পরের দিন অধ্যক্ষের নির্দেশে কলেজের প্রিন্সিপাল খোঁজ করে জানতে পারলেন "কাটি" পাওয়া যাচ্ছে না হলে অ্যানাটমির (anatomy)

কথাসাহিত্যিক বনফুল, অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল, কবি দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার

কোর্স শেষ হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বেসর্বা কর্তা আশুতোষ পরীক্ষা তিন মাস পিছিয়ে দিলেন। এই সময় বনফুল এক অপূর্ব শোভাযাত্রা দেখেছিলেন। হাওড়া স্টেশন থেকে শুরু আর কলেজ স্কোয়ারে শেষ। শোভাযাত্রীদের বেশির ভাগ ছাত্র ও অধ্যাপক। পুরোভাগে নগ্ন পদ নগ্ন শিরে আশুতোষ। মস্তকে একটি পাত্র। তার ভিতর ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষের স্মারক। সেই পবিত্র বস্তুকে তিনি কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত মহাবোধি সোসাইটিতে স্থাপন করেন। আজকাল অনেক ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যায় যে ওঁরা প্রাইভেট প্র্যাকটিসের খাতিরে হাসপাতালে ঠিক সময়ে আসেন না। এ রকম অভিযোগ উঠেছিল সেকালের নামী চিকিৎসক বার্নার্ডো সাহেবের নামে। একদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় খবর ছাপা হল যে বার্নার্ডো সাহেব ওয়ার্ডের কাজে ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেট রোগী দেখছেন। ক্লিনিক্স (clinics) ঠিকমত হচ্ছে না।

বার্নার্ডো সাহেব পরের দিন এই অমৃতবাজারের এক কপি হাতে করে ঠিক সকাল ৮টায় ওয়ার্ডে এসে তাঁর নিন্দুকদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন এখন থেকে রোজ তিনি সকাল আটটায় ওয়ার্ডে আসবেন। ছাত্রদের বললেন তোমাদেরও ঠিক আটটায় ওয়ার্ডে আসতে হবে। এই যে ত্রুটি স্বীকার করলেন বার্নার্ডো সাহেব তা বিশেষভাবে তাঁর চরিত্রের গুণ-নির্দেশক। ছাত্ররা কিন্তু প্রথম মতো ঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পারছিল না। একদিন ওয়ার্ডে এসেই বার্নার্ডো সাহেব বললেন— Joges, (পরবর্তীকালের বিখ্যাত চিকিৎসক যোগেশ ব্যানার্জি), Call the rolls", কিন্তু roll call-এর খাতা কই? কোথাও পাওয়া গেল না। বার্নার্ডো সাহেব রেগে গেলেন। তিনি [illegible] কামান দেগে বললেন। পুলিশ কমিশনার নানা কারণে বিখ্যাত টেগার্ট সাহেবকে ফোন করলেন তখনই চলে আসতে। টেগার্ট হন্তদন্ত হয়ে হাজির। কি ব্যাপার? বার্নার্ডোর অভিযোগ—Roll call-এর খাতা চুরি গেছে। টেগার্ট ছিলেন নাম করা চতুর। তিনি ওয়ার্ডের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন হলের শেষ প্রান্তে একটি রোগীহীন শয্যা। সেখানে গিয়ে শয্যার গদিটা তুলতেই খাতা পাওয়া গেল টেগার্ট সাহেব গুড-বাই বলে গটগট করে লালবাজার ফিরে গেলেন। ছাত্ররা রেগে গেল। এই সামান্য কারণে কলেজে পুলিশের বড় কর্তা কেন? তারা বার্নার্ডো সাহেবের ক্লিনিকই বয়কট করল। সাতদিন পরে বার্নার্ডোর এক দূত, জনৈক অধ্যাপক, এলেন ছাত্রদের কাছে। দূত বললেন—"দোষ তো তোমাদেরই। তোমরাই কেউ খাতাটা লুকিয়ে রাখবে। টেগার্টকে ডেকে বার্নার্ডো ভাল করেননি তা বুঝতে পেরেছেন।" ছাত্ররা আবার সাহেবের ক্লিনিকসে যাওয়া শুরু করল। ছাত্ররা ক্লিনিকসে যোগ দিতে রাজি হল দুই শর্তে। সব অনুপস্থিত চিহ্ন কেটে উপস্থিত লিখতে হবে। দ্বিতীয়ত, ক্লিনিকস শেষ হয়ে গেলে বার্নার্ডো সাহেবকে ছাত্রদের ভোজ দিতে হবে। সাহেব রাজি। বিরাট ভোজ দিলেন বার্নার্ডো সাহেব তাঁর বাড়িতে। ভোজন শুরুর পূর্বে সুরসিক বার্নার্ডো সাহেব উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে বললেন— "Gentlemen, before we start let me remind you that the capacity

of normal human stomach is four ounces only. Now let us start". ছাত্রের চাহিদায় ছিল তখন বনফুলের। এ ধরনের ঘটনা বহু ঘটেছে। তার কি আর কোনও তালিকা করা যায় এ ধরনের বিশদভাবে লেখা। তবু যে উপায়ে সম্ভব তা নয়, শামলাও।

ছাত্রাবস্থায় বনফুল মেডিক্যাল পরীক্ষায় প্রথম হিসেবে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তারপর উপেন ব্রহ্মচারীর কাছে কালাজ্বর নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। তখন কালাজ্বর রোগের জন্য এই কাজ সরকারিভাবে উৎসাহ দেওয়া হত এবং পুরস্কারও ঘোষণা করা হল। ডাঃ ব্রহ্মচারী তাঁর রিসার্চের ফলাফল কোন জার্নালে প্রকাশ করতে পারেননি। বনফুল তাঁকে দেখেছেন ইনজেকশন নিয়ে রোগীদের জন্য ঘুরে বেড়াতে হাসপাতালের পেছন দিকে বারান্দায়। এই বিষয়ে গবেষণার শেষ ফল কালাজ্বরের অব্যর্থ ওষুধ Urea Stibamine আবিষ্কার।

মেডিক্যাল কলেজে এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটেছে যা বলে শেষ করা যায় না। বনফুল নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর "পশ্চাৎপট"-এ। একসময় বড় ডাক্তার ও সে সময়ের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। দুঃখের কথা তাঁর অমূল্য লেখাগুলি নানা কাগজে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। লেখক হিসেবে তাঁর সুনাম বিশেষ ছিলেন উপন্যাস। কোন প্রকাশকও এগিয়ে এসে লেখাগুলি একত্র করে কোন সংকলন প্রকাশ করেননি। রবীন্দ্রনাথের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় পায়ের অস্ত্রোপচার করার জন্য জোড়াসাঁকো থেকে কলকাতা এসে সাহায্যের জন্য ধরলেন বনফুলকে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় তখন Surgical outdoor-এ। বনফুল রোগীকে নিয়ে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের কাছে হাজির করলেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় অপারেশনের প্রয়োজন হবে বলে ওয়ার্ডে Prince of Wales হাসপাতালে ভর্তি করে নিলেন। বনফুলকে বললেন Senior House Surgeon-কে অনুরোধ করতে যাতে অপারেশনের জন্য দু-এক দিনের দিকে "Put up" করা হয়। তখন Senior House Surgeon "Put up" না করলে রোগীর অপারেশন হয় না। বনফুল অনুরোধ করতেই—Senior House Surgeon জবাব দিলেন—তাকে "Put up" করা। কিন্তু সে কাজ আর হলো না। হঠাৎ একদিন রোগী বললেন—"আমি কিছুতেই থাকব না।" শেষে রোগীটি ওয়ার্ড ছেড়ে দেখা করে সেই "ঘরে" সম্পূর্ণ করলেন। ভুল ছিল এই একটি কথা ও নাম পড়েছে তাঁর। দুশ্চিন্তায় বনফুলকে বললেন—"কেউ আমার পেছনে হাত দিয়ে রাখবেন বলে অপারেশন হয়ে গেল।" বনফুল আসলে ডাঃ বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় এই দুঃখের কথা জেনে প্রিন্সিপাল ডাঃ ব্র্যাডফোর্ড কাছে বিচার চাইলেন। নালিশ প্রথম ভুল। ব্র্যাডফোর্ড সাহেব কড়া শাস্তি দিতে চাইলেন। ডাঃ উইলসন সাহেব বললেন—"দুর তো জানতে পারেই নি। কোনদিন ধরি দিতে দিন দিতে আমরা কি এই রোগীকে ভর্তি মুলতুবি করে হাসপাতালে ঠিক দিই না? এও তো এক প্রকারের ঘুষ।" শেষ পর্যন্ত শাস্তি হিসেবে Senior House Surgeon-কে অন্যত্র বদলি করা হয়। Bunon এই ঘটনা সম্বন্ধে পরে বনফুলকে বলেছিলেন—"সুযোগ পেলেই অনেকে ঘুষ নেয়। কারণ সংসার বিশাল, মাইনে কম, প্রলোভনও কিছু বেশি। সবাইকে শাস্তি দেওয়া তো যায়। তার আগে ইনস্টিটিউটকে তো সারানো!"

বনফুল বন্ধু পরিমল গোস্বামীর মাধ্যমে জোড়াসাঁকোয় একদিন রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে আসেন। পরিমল সেই সময় জোড়াসাঁকোতে কিছুদিন ছিলেন ও সেখানে এর এ পড়াচ্ছিলেন। তখন কথা বিশেষ কিছু হয়নি। এর কিছুকাল পরে যখন বনফুলের সাহিত্য-খ্যাতি বহু বিস্তৃত, তখন রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে একাধিকবার শান্তিনিকেতনে সাহিত্যের তাঁর অতিথি গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শ্রী দীপঙ্করী নিয়ে তাতে যদিও অন্য সম্পর্ক তৈরি করে উপহার দিয়েছিলেন। কবি একটি সম্পর্ক থেকে বলেছিলেন বললেন—"বাংলাদেশে দুজন বড় গল্পকার ছিল অনেকদূর—এক প্রভাত গেল, দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবার তৃতীয়ের আবির্ভাব হল।" পিতৃপুত্র উভয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার মধ্যে সাজানো জিনিসগুলিতে হাত লাগিয়েছে। বা-বাবা শাসন করতে গেলে—রবীন্দ্রনাথ বললেন—"আহা, কিছু বোলো না। শিশুর হাতে দু-একটি সাজানো পুতুল ভাঙলে কোনদিন দুঃখ পেয়ো।" রবীন্দ্রনাথ একদিন বনফুলকে বললেন—"তুমি আমার কাছ থেকে কিছু চেয়ে নাও। আমার লেখা একটা কথা দিই।" বনফুল বিনীতভাবে বললেন—"একটা আমার অনেক আছে। বরং আপনার পরিহিত পুরনো একটি জোব্বা দিন আমাকে।" কবি তখন বললেন—এমন অদ্ভুত উপহার আমি কেউ তো কোনদিন চায়নি তাঁর কাছে। তখন এ বিষয়ে আর কোনও কথা হয়নি। সে যাত্রায় ভাগলপুর ফিরে আসার অনেক পরে কবি খবর পাঠালেন বনফুলকে তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বনফুল গিয়ে দেখেন কবি চুপচাপ বসে আছেন। হাতে সুন্দর একটি প্যাকেট। বনফুল যেতেই ফিরে দেখে প্যাকেটটি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—"এই নাও যা চেয়েছিলে, আমার একটি জোব্বা।" লেখাপড়ার ঘর থেকে সুরক্ষিত সেই জোব্বা বনফুল আমাকে দেখিয়েছিলেন।

কলকাতায় দুটি বনফুলকে খুশি করেছে। নবনালন্দা ও জোড়া সব হাতের কাছেই। পাকাপাকি ভাবুকজন সব দেখেছেন আর লেখার দৃষ্টি করেছেন স্মৃতির প্রতিচ্ছবির। খাটি স্নানে বসে গল্পটি ফেরিওয়ালা নিয়ে সময়ানি প্রবাসী সম্পাদককে পাঠিয়ে জানাতে চাইছেন গল্পগুলি মনোনীত কিনা। সবকটির নামকরণও করেননি। সহ-সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় জবাবে লিখলেন—গল্পটি গল্পই সুন্দর এবং প্রবাসীতে সেগুলি ছাপার জন্য মনোনীত হয়েছে। চারুবাবু বনফুলকে প্রবাসী অফিসে আসবার নিমন্ত্রণ জানালেন।

চঞ্চলাবু লেখক পড়া হয় বেশ ভেবেছিলেন কলকাতাই প্রেমী কোন মহাজ্ঞেয় হবেন। কেননা ভর্ত কলকাতী চঞ্চলাবু তা আসলেই পারেননি। এইভাবে বনফুলের সঙ্গে সজনীকান্তর প্রথম পরিচয়। উত্তরকালে এই দুজন গাঢ় বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিলেন।

মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় একটি আশ্চর্য চরিত্রের সঙ্গে দেখা ও পরে গভীর বন্ধুত্ব হয়। ইনিও ডাক্তারির ছাত্র। নাম নিরঞ্জন বসুমল্লিক। বনফুলের সর্ববৃহৎ উপন্যাস "জঙ্গম"-এর বিখ্যাত চরিত্র শঙ্কর এই নিরঞ্জনের প্রতিচ্ছায়া। 'মানসপ্রতিমা', 'মধ্যবর্তী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি নিরঞ্জনের সৃষ্টি। সংসার চালানোর জন্য চাকরি করতে হত। পড়া প্রতিভার সাহায্যে মেডিক্যাল কলেজের খাতায় নাম থাকত। আকস্মিকভাবে ডাক্তারি পাশ করে নিরঞ্জন ভাগলপুর এসে এ পাশ করেছিলেন। ১৯৩২-এ অল্পবয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে ডি পি এইচ, এবং ল' পড়ছিলেন। খাঁটি অদ্ভুত লোক ছিলেন নিরঞ্জন।

কলকাতাই বনফুলকে সাহিত্যিক করে তুলেছে। নিজেই তিনি লিখেছেন—"আমার কলিকাতা জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা আমার পরবর্তী অনেক লেখায় ফুটিয়াছে।" বনফুল কলকাতায় থাকবার সময় কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠীভুক্ত হননি বা তাদের সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করেননি। কাগজে কাগজে লেখা পাঠিয়ে দুঃসাহস অপেক্ষা করতেন। কোনরকম তদ্বির করতেন না।

বনফুল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় পায়ে হেঁটে ঘুরতে খুব ভালবাসতেন। বড় রাস্তা পেলে না হেঁটে সরু গলি পাকালেন ছোট রাস্তা বা অলিগলি দিয়ে হাঁটা পছন্দ করতেন।

বনফুলের পরমবন্ধু পরিমল গোস্বামী তাঁর "স্মৃতিচিত্রে" গ্রন্থে বনফুলের কলকাতার জীবনের কিছু পরিচয় দিয়েছেন। বনফুলের চরিত্রে একটি অদ্ভুতত্ব ছিল সব সময়।

চিত্র: বিকাশ ভট্টাচার্য

চারদিকে তীক্ষ্ণ চোখে সব দেখছেন। একবার এক অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখে বললেন, "আপনার মুখে যে অসুখের লক্ষণ দেখা দিয়েছে—শীঘ্র খুব হবে, অবিলম্বে চিকিৎসা করা দরকার। চলুন আপনার বাড়িতে, সব বলছি।'

"লোক তাঁর বাড়িতে। অত্যন্ত গরিব পরিবেশ। ভাঙাচোরা বাসা। প্রস্তাব শুনে প্রায় কেঁদে ফেললেন ভদ্রলোক। বললেন বাড়ির জিনিসপত্র সব বেচে ফেলেছে। কিন্তু তিনি বললেন তাহলে চিকিৎসা ছাড়া তাঁর আর বাঁচবে না, মারা যাবে। বললেন 'ও সব ছাড়ুন, আগে বাঁচতে হবে তো খাটি পড়ুন, কড়ি-কৌড় জানেন।' অবশেষে ভদ্রলোক বনফুল যা বললেন, সবই করলেন।" চিকিৎসার সব ব্যয় বহন করেছিলেন বনফুল। পথের লোক ধরে বন্ধুত্ব করার ক্ষমতা ছিল বনফুলের। এ বিষয়ে সাক্ষী বন্ধুবর পরিমল গোস্বামী। বনফুল চরিত্রের আরও পরিচয় আছে "স্মৃতিচিত্রে"-এ। মেসের এক বন্ধু হঠাৎ খেতে বসে গোল করবে। তাঁর বনফুলের খেয়াল হল মেসের ভাত ভাল নয়। "হঠাৎ কাছে ডাক দেওয়া হল, সম্ভবত তাঁর এই খবর দেওয়ার দরকার এবং এর মধ্যেকার মজাটা দেখে এমন মুখ হবেন যে তাঁকে নিশ্চয়ই বড় থালা বসিয়ে সব সাজিয়ে খাওয়াইবার পাতে তুলে দিলেন, ইনিয়ে-বিনিয়ে নিষেধ করলেন না।" এরকম নিত্য ঘটনা শুধু বনফুলের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

বিহার সরকার ছাত্রদের প্রতি উদাসীন মেডিক্যাল কলেজে প্রতিবাদ করেছেন। আসলে বিহারের মহামারীতে সব ছাত্রের জন্য অতিরিক্ত পাটনা খুলে হয়। বিহার সরকার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানালেন বিহারী ছাত্রদের পড়ার খরচ যা লাগবে তা বহন করে দেওয়া হবে। বনফুল এই খবরে মুষড়ে পড়লেন। মেডিক্যাল কলেজের শেষ বৎসর। কলকাতায়, পাশ হবে পড়লে, ভালবাসা জন্মেছে। তাঁর এই ভালবাসা ছেড়ে যান ভাগলপুরে ছুটে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে অন্য কলেজে বিহার সরকারের সাহায্য না নিয়ে পড়লে শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত অদ্ভুত কলকাতা থাকা সম্ভব হতে পারবে। বাবার বুক কেঁপে গেলেন তিনি কি করে মেডিক্যাল কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল ডাঃ ব্রেনার সাহেবের কাছে। ব্রেনার সব বনফুলের সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। কিন্তু বনফুলকে ভর্তি করতে রাজি হলেন না। তিনি উপদেশ দিলেন—"পাটনাতেই যাও। পাটনার প্রথম ব্যাচে এম বি হতে পারলে অনেক সুবিধে হবে।"

নিরুপায় বনফুল কলকাতার পাট তুলে পাটনায় এলেন। সেখানকার প্রিন্সিপালের সঙ্গে প্রায় ঝগড়া হল। তখন পাটনা মেডিক্যাল কলেজে যথোচিত Maternity Ward খোলা হয়নি। বনফুল ও তাঁর কয়েকটি Sixth-year-এর ছাত্রের ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষা শুরু। সেখানকার Victoria হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা হল। এম বি পরীক্ষায় বসবার আগে নিয়মানুযায়ী অন্তত তিনটি প্রসব করানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বনফুল তখন এক পাকড় বন্দোবস্ত। কর্তৃপক্ষকে কথা দিয়েছিলেন বছর পরে। হাসপাতালের Matron কড়া প্রাণী। বলেছেন এ চলবে না। কাল থেকে পার্ট

পরে আসতে হবে। উনি একটি পার্টির মেট এ-দুটি মানতে না। বনফুল সেই ব্যাপারে খেলার জন্য অতিরিক্ত ধুতি নিয়ে যেতেন দুটি trouser বানালেন। ছিটের রঙিন বস্ত্রের পাঞ্জাবি। পরের দিন ক্লাসে সেগুলি দিয়েই খেলুন কটাক্ষ করে বনফুলের দিকে তাকালেন। আইন ভঙ্গ হয়েছে। ছাত্রাবাসে কয়েকজন তরুণী অতিথি রেখেছিলে বনফুল ইংরেজিতে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। যেমন পঙ্‌ক্তির এই কবিতার চারটি লাইন ছিলো তাৎপর্য হয়। যেমন বনফুলেরও মেয়েটির প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল। পঙ্‌ক্তি চারটি এই:—

"When the heart is full and
feelings melting
We try to hide and alter
When the eyes speak,
the tongue denies
Words fail or falter."

বনফুলের পুরো নামটিও ঐ নাম জানতেন না। পাটনায় ফিরে এসে উনি একখানা বড় চিঠি পেলেন। ঠিকানা এইরূপ—

Student Mukherjee,
C/o. Principal, P. W. College
Patna, Bihar.

চিঠিতে উচ্ছল প্রেমের প্রকাশ ছিল না। ছিল পাওয়া রমণীদের অনিশ্চিত দাম্পত্য জীবনের ব্যথা-বেদনার কাহিনী।

বনফুল কৃতিত্বের সঙ্গে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের M. B. B. S. পাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিহার সরকারের চাকরির নিয়োগপত্র। প্রথম পোস্টিং পাটনা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র স্টাফ সার্জেনের পদে। চাকরিতে যোগ দিতে গিয়ে বনফুল প্রথম বিভ্রাটটি বেধে গেল। একটি ধারার লেখা— "Whenever a junior officer or a student meets the superiors, he must show him respect by touching forehead with his palm."

বনফুলের আঁকা "শীতের সকাল"

এটি পড়েই বনফুলের মাথায় রক্ত উঠল। সেই মুহূর্তে ঠিক করলেন কোন দিনই চাকরি করবেন না। যে অফিসার ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট করতে এসেছিলেন তাঁকে বললেন যে চাকরিতে এই রকম শর্ত—তা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। Good-bye করে বের হয়ে এলেন। উত্তরে কোন উত্তর দেবার অবকাশ দিলেন না। সেখান থেকে সোজা গেলেন Patna Station-এর waiting room-এ। সারা জীবনের পথ সেখানে চিহ্নিত হয়ে গেল। নিজেরা ঘরে বসে Pathology Practice ও সাহিত্যচর্চা করবেন। Pathology Practice বই পড়ে হয় না। কোন বিজ্ঞ Pathologist-এর কাছে হাতেকলমে শিক্ষা নিতে হয়। কলকাতা গিয়ে শিক্ষক ও সেকালের নাম করা Pathologist ডাঃ চারুব্রত রায়ের শরণাপন্ন হলেন। প্রার্থনা জানালেন হাতেকলমে কাজ শেখাতে। চারুব্রত বনফুলের প্রার্থনা না-মঞ্জুর করলেন। নিরুপায় হয়ে তখন গেলেন ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি ডাঃ চারুব্রত রায়েরও শিক্ষক ছিলেন। বনফুলের কাছে তাঁর চাকরি না করার কারণ শুনে বললেন—'বেশ বনফুল, যে দেশে জন্মেছ সে দেশে তাঁদের হয়ে সেবাও করতেই হবে। চাকরিতে একজন উচ্চ শিক্ষিত লোককে সেলাম করলে অন্য কাউকে সেলাম করতে হবে না। আর যদি চাকরি না কর তবে হাজার হাজার লোককে সেলাম করতে হবে। তা না হলে তোমার private practice চলবে না।' বনফুল তখন তাঁর শেষ যুক্তি দেখিয়ে বললেন—"আমি সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যেতে চাই। Laboratory practice করলে তার সময় পাব। চাকরি করলে বা সাধারণ প্রাকটিস করলে তা পাব না।" বনবিহারী মুখোপাধ্যায় খুব খুশি হলেন। ডাঃ চারুব্রত রায়কে তখনই ফোন করে বনফুলকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে রাজি করালেন।

বনফুল যখন আবার ডাঃ চারুব্রত রায়ের কাছে গেলেন তখন তিনি বললেন—'তা হলে হাতেকলমে শিক্ষা আমাকে দিতেই হবে—তবে তিনটি শর্ত তোমাকে মেনে নিতে হবে।

প্রথম—তোমাকে পুরো এক বছর হাতেকলমে আমার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

দ্বিতীয়—ল্যাবরেটরির সব যন্ত্রপাতি এখনই কিনতে হবে।

তৃতীয়—শিক্ষা শেষে কলকাতায় প্র্যাকটিস করতে পারবে না।'

ডাঃ চারুব্রত রায়ের হয়ত সন্দেহ ছিল বনফুল শেষ পর্যন্ত Pathology-তে টিকে থাকবে কিনা—তাই পূর্বাহ্ণেই সব যন্ত্র কিনতে বলেছিলেন।

বনফুল তিনটি শর্তই মেনে নিলেন। বাবার টাকায় তখন একটি মাইক্রোস্কোপ কিনলেন। বাকি সব ডাঃ চারুব্রত রায়ের জামিনে শতকরা সাড়ে ১২ টাকা সুদে বাকিতে কিনলেন। এক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে বনফুল ডাঃ চারুব্রতকে খুশি করলেন। বনফুল ডাঃ চারুব্রত রায় ও ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ভাগলপুরে ল্যাবরেটরি স্থাপন করে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। প্যাথলজির শিক্ষাগুরুর তৃতীয় শর্ত না থাকলে বনফুল হয়ত কলকাতায় practice করতেন। সে

ক্ষেত্রে কলকাতার কথা ছিল ও বহুমুখ সাহিত্য-সাধনায় বিঘ্ন ঘটত। অধিকাংশ সময়ে কলকাতায়—কিন্তু সাহিত্যের বিচরণ ক্ষেত্র ভাগলপুরে। পরে উত্তরজীবনে আরও কত দেখেছেন, আরও কত অভিজ্ঞতা হয়েছে। তার অনেক কিছু তাঁর সাহিত্যে নানাভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বনফুল সাহিত্যের ব্যাপারে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। তাই কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ বরাবরই রক্ষা হয়ে এসেছে। ১৯৪০ সালে বনফুল ভাগলপুরের আদমপুরে ভাল একটি বাড়ি (পোড়াকুটি) কেনার সুযোগ পেলেন। কিন্তু টাকা? তাই বিশ্বাসী বনফুল কলকাতায় এলেন অর্থের সন্ধানে। এখানে এলেন সজনী দাস বন্ধুর সাহায্যে। একাধিক প্রকাশক, খদ্দের কাগজের মালিক, যার এদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বাড়ি কেনার টাকা জোগাড় করে ভাগলপুরে ফিরলেন। সম্ভবত সেই টাকা তিনি লেখার রোজগার থেকে যথাসময়ে শোধ করেছিলেন। কলকাতা তখন সাহায্য না করলে বনফুলের বাড়ি হত না।

দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে কলকাতায়। দুই ছেলে কলকাতায় কর্মরত। এদের ইচ্ছা অনুসারে শেষ বয়সে ভাগলপুরের বাড়ি বিক্রি করে পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে এলেন ছেলেদের কাছে। এই বাড়ি বিক্রির ব্যাপারেও বনফুল সাধারণের বহু ঊর্ধ্বে ছিলেন। এক ক্রেতার সঙ্গে বাড়ি বিক্রির কথাবার্তা হবার পরে আর এক ক্রেতা এলেন পরের দিন। যে দাম উঠেছে তার উপর আরও ২০,০০০ টাকা দিতে চাইলেন। প্রলোভনমূলক প্রস্তাব। বনফুল বললেন—বাড়ি তো কালই বিক্রি হয়ে গেছে। নতুন ক্রেতা আইন দেখিয়ে বললেন—দলিল তো হয়নি, বেশি টাকা নিতে বাধা কোথায়? বনফুল তাকে অন্যভাবে পথ দেখিয়ে বললেন—কথার চেয়ে দলিল কখনও বড় হয়?

ভাগলপুরে বনফুল যে কতবড় মানুষ ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বনফুলের বাজার-করা দেখবার মতো ছিল। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ও পথে তাঁর মোটরে ভাগলপুরে তাঁকে বাজার করতে সবাই দেখেছি একাধিকবার। বাজারে ঢুকতেই মাছ, মাংস ও তরিতরকারি-বিক্রেতা দাঁড়িয়ে। সবাই ডাকাডাকি। এটা নিন, ওটা নিন। ভাল মাছের খোঁজে সবার ডাকাডাকির দিকে নজর। দাম-দস্তুর কথা নেই, সঙ্গে সঙ্গে টাকা দেওয়া নেই। ডাকাডাকির সঙ্গে কোনো নির্দেশমতো থলি ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। বিক্রেতা পরে কম্পাউন্ডারের এসে টাকা নিয়ে যেত। মাছ, মাংস কিনতেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত। শীতকালীন দুপুরে এ নিয়ে নানান ঘটনা। ছুটি নিয়মিত। ভোজনবিলাসী ছিলেন। অতিথি-আপ্যায়নও ছিল বড় মাপের। আমাকে বলতেন—লেখার ছিটেফোঁটা না হলেও— জীবনটা ছিপের মতোই কাটিয়ে গেলাম। সঞ্চয়ের কথা ভাবতেন না। দেনা করা হলেও বাধ্য হতেন না। অটুট বিশ্বাস ছিল তাঁর জীবনের উপর।

অপেক্ষাকৃত কম বয়সে প্রিয়বন্ধু সজনী দাসের মৃত্যুতে বনফুল বড় বেদনা পেয়েছিলেন। বড় মেয়ের বিয়ের সময় টাকার থলি নিয়ে বরে বনফুল নয়, সজনী দাস। চিঠিতে বন্ধুর প্রতি দেনা-পাওনা মিটিয়ে যাচ্ছেন। বনফুল সাংসারিক বিষয়ে পটু ছিলেন না। সজনী দাসের মতো কোন না কোন লোকের সাহায্য পেয়ে গেছেন। সজনীর মৃত্যু-শোক প্রকাশ করেছিলেন একাধিক কবিতায়।

'...এই সেদিন তো তুমি একমনে
লেখার হাসায় ফিনিক
হঠাৎ—
তারপর থামেও।
হঠাৎ চলে গেলে
আমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছি
দুহাত রাশে অন্ধকার ভিড়,
লোক বুঝছে
[illegible] জন্যে [illegible] করতে হয়—
এর মধ্যে কেমন করে এল তোমার ডাক?
তুমি চলে গেলে...'

এই শোকগাথায় চিত্রের পিছে বনফুল কলকাতার ধন-বাহনের [illegible] [illegible] ফুটিয়েছেন।

সজনী দাসের এক জন্মদিনের কবিতায় বনফুল এক অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

'...আজ তোমার মোটা হয়েছে,
আমারও হয়েছে—
কিন্তু সেই ছিপকাঠি আজ হয়তো
খাচ্ছে খেয়ে,
আর সুতো ধরে টানাটানি করে
বসে আছে,
ঢাকা অন্তরাই।
যে ছিপের খাবার অন্তরে।
আমরাও মুড়ে ছিপকাঠ হয়ে থাকব,
অবনি টানাটানি করে
সেটাই আর থাকবে না,
কিন্তু এই ছিপকাঠ থাকবে।'

কলকাতার বাড়িতে [illegible] শান্তিতে মুক্তি থাকবে না। দেশের অধিকার যে আশা পূর্ণ করেনি তা বনফুল একাধিক কবিতায় প্রকাশ করেছেন। অতি দুঃখে এক পত্নীবিয়োগে অসুস্থ বনফুল লিখেছেন—

"অনেক পেয়েছি ঠিক কি।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
যে [illegible]
সেটুকু [illegible]—[illegible]
তা হলে পূর্ণ [illegible] পূর্ণ [illegible]
পেয়ে যায়।"

কলকাতায় এসে অবসাদ [illegible] সঙ্গে মারা গেলেন থেকে উঠে গেলেন শেষ উঠিতে নিজের বাড়িতে। সেখানে লোকসমাগমের অন্ত ছিল না। সাহা-সমিতিও তাঁকে পেয়ে ধন্য। মাঝে মাঝে বলতেন—কলকাতার আরাম করা যায়, লেখা যায় না।

বনফুল অন্যত্র দু-একবার বলেছিলেন যে কলকাতাকে কেন্দ্র করে তিনি একখানি বড় উপন্যাস লিখবেন। শেষ জীবনে কলকাতায় দুর্দিনে পড়ে তা আর সম্ভব হয়নি। ভাগলপুরের নির্বিবিলিতে হয়তো বা তা সম্ভব ছিল।

যে কলকাতা বনফুলকে বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়ে সাহিত্যের খোরাক জুগিয়েছে, বাসস্থানে সাহায্য করেছে, সেই কলকাতায় নিজগৃহে মহাপ্রয়াণে বনফুল [illegible] বিলিয়ে গেলেন। তিথিটি ছিল ২৫ মাঘ, ১৩৮৬।

বনফুলের নাটক : একটি রূপরেখা

বিজয়কুমার দাস

ছদ্মনামটি গ্রহণ করেছিলেন ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। আর নেশা ছিল সাহিত্যচর্চা। সাহিত্যচর্চার গুণেই হয়ে উঠেছিলেন প্রথিতযশা সাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যের আকাশে এখনও তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র। বনফুল ঝরে পড়ুক অথবা না পড়ুক— তার সৌরভ অনুভূত হবেই। সাহিত্যিক বনফুল জীবিত নেই। কিন্তু তাঁর সাহিত্যের সৌরভে বাংলা সাহিত্য এখনও সমৃদ্ধ।

এখন তিনি স্মৃতিলোকে। তবু তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য এখনও আমাদের, সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে এখনও আমাদের কাছের মানুষ মনে হয়। তিনি প্রাত্যহিক মানুষ জীবন থেকে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন, পাঠকের অন্তরে তাঁর আসনটি অম্লান পাতা আছে। বনফুল যে কালে লেখালেখি করেছেন, তখন বাংলা সাহিত্যের আকাশে অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির আলোয় উদ্ভাসিত সাহিত্যের জগৎ— অথচ সেই কালেই বিষয়বৈচিত্র্যে আর বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে 'বনফুল'ও তাঁর সাহিত্য প্রতিভার সুগন্ধ বিতরণ করে পাঠকের অন্তরে স্থান করে নিয়েছিলেন।

অন্যান্যদের মতোই কবিতা দিয়েই শুরু করেছিলেন তিনি। বিশেষত ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁর দক্ষতা ছিল। পরে গল্প-উপন্যাসে তিনি সুখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন যথারীতি, পাশাপাশি নাটক রচনার ক্ষেত্রেও। তাঁর নাটক নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, নাট্যকলা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন।

বনফুল যে কালে সাহিত্যচর্চা করেছেন, সেই সময় অনেকেই গল্প-কবিতা-উপন্যাস রচনার পাশাপাশি নাটকও লিখেছেন। এ ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাজী নজরুল ইসলামের নাম অবশ্যই করা যায়। আসলে বাংলার রঙ্গমঞ্চে সে সময়টা ছিল নাট্যকলার সুসময়। নাট্যজগতের বিশিষ্ট নট-নটী এবং নাট্যকাররা ছিলেন তৎকালীন কবি লেখকদের কাছের মানুষ। স্বভাবতই গল্প কবিতা উপন্যাস রচনার পাশাপাশি তাঁরা নাটক রচনার ক্ষেত্রেও মনোযোগী হয়েছিলেন। আর এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই ছিলেন একটি দৃষ্টান্ত।

বনফুলের নাটক নিয়ে আলোচনার আগে সেই সময়ের নাট্যচর্চা বা নাট্য পরিবেশের দিকে চোখ রাখা যেতে পারে। তখনকার দিনে নাটক দেখা এবং নাটক নিয়ে আলোচনা করা লেখক বুদ্ধিজীবীদের একটা ঝোঁক ছিল। বলাইচাঁদ যখন ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২৭) হলেন, বাংলা রঙ্গমঞ্চে তখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ি। নাট্যকার হিসাবে খ্যাত হয়ে উঠেছেন মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, [illegible], জলধর চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাত, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্করও তখন নাটকের জগতে বিচরণ করছেন।

বনফুল লিখে ফেললেন 'রূপকথা' নামে একটি নাটক। কিন্তু নাটক লিখলেই তো হবে না, একান্ত চাই তৎকালীন নাট্যাচার্যদের নজরে নাটকটি নিয়ে আসা। বনফুল নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়িকে নাটকটি দেখিয়েছিলেন। একটি সুপ্ত ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে। শিশিরবাবুর ভাল লাগলেই নাটকটি মঞ্চে অভিনয়ের ছাড়পত্র পেয়ে যেতে পারে। আর মঞ্চে কোন নাটক অভিনয়ের ছাড়পত্র পেলে এবং সেই নাটকের অভিনয় সফল হলে নাট্যকার হিসাবে পরিচিত হওয়া খুবই সহজ হয়ে ওঠে। শিশিরবাবু নাটকটি পড়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বনফুলকে। আরও নাটক লেখার পরামর্শও দিয়েছিলেন। তবে পরামর্শ অভাবে নাটকটি তিনি যে মঞ্চস্থ করতে পারছেন না, সেটাও শিশিরবাবু বনফুলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার ইচ্ছা পূরণ না

হলেও নাট্যজগতের তৎকালীন নক্ষত্র শিশির ভাদুড়ির এই প্রেরণা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আরও নাটক লেখার ইচ্ছেটা তাঁর থেকেই গিয়েছিল। পরবর্তীকালে বেশ কিছু নাটক লিখে প্রশংসা পেয়েছিলেন। গল্পকার-ঔপন্যাসিক বনফুল হয়ে উঠেছিলেন নাট্যকার বনফুল-ও।

বনফুলের আত্মজীবনী 'পশ্চাৎপট' গ্রন্থে নাটক লেখার ইতিহাস সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তা এইরকম : বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন বনফুলের শিক্ষাগুরু। এই বনবিহারীবাবুর সঙ্গে সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে বনফুলের আলাপ-আলোচনা হত। এইরকম একটি আলোচনায় একদিন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটকের প্রসঙ্গ ওঠে। ট্র্যাজেডি এবং কমেডি নিয়ে দুজনের তর্ক বাধে। বনবিহারীবাবু প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আলিবাবা' নাটকটি কি ট্র্যাজেডি হতে পারে?... বনফুল বলেছিলেন, পারে। তাঁর এই কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনি 'আলিবাবা' নাটক নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন। লেখা হল 'রূপান্তর' নাটকটি। বনফুলের ভাবনায় নতুনভাবে নাটকটি নতুন মাত্রা পেল। 'আলিবাবা'-র চরিত্রগুলো এবং তাদের সুখ-দুঃখ যেন আলোকিত হল নতুন আলোয়। ১৩৩৪ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় পরপর তিনটি সংখ্যায় নাটকটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিতও হল। উল্লেখ্য, যে নাটকটি তিনি ডাক্তারি পাশ করার পর লিখে শিশির ভাদুড়ির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই 'রূপকথা' নাটকটি প্রকাশিত বা মুদ্রিত হয়নি কোথাও।

এবার বরং তাকানো যাক বনফুলের নাট্যসম্ভারের দিকে। সেটি এইরকম : মন্ত্রমুগ্ধ (১৯৩৮), শ্রীমধুসূদন (১৯৩৯), বিদ্যাসাগর (১৯৪০), মধ্যবিত্ত (১৯৪৩), দশভাণ ও আরও কয়েকটি (১৯৪৩), সিনেমার গল্প (১৯৪৯), কঞ্চি (১৯৪৬), বন্ধন মোচন (১৯৪৮), আসন্ন (১৯৫৩)। এ ছাড়াও 'পুত্র' নামে তিনি একটি নাটক লিখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনাকে ধরে রেখে। দুটি জীবনী নাটক শ্রীমধুসূদন এবং বিদ্যাসাগর লিখে নাট্যকার হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন। পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাশাপাশি একাঙ্ক নাটক রচনাতেও দক্ষতা দেখিয়েছিলেন বনফুল। 'দশভাণ ও আরও কয়েকটি' নাট্যগ্রন্থটি তাঁর একাঙ্ক নাটকেরই সংকলন। এইসব নাটকে বনফুল তাঁর নাট্য কুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'ত্রিনয়ন' নাট্য সংকলন।

কেমন নাট্যকার ছিলেন বনফুল? তাঁর জীবনে তিনি নানা চরিত্রের মানুষ দেখেছেন। যে পেশার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন, সেই পেশার জোরেই নানারকম মানুষ, নানারকম চরিত্রকে কাছে পাওয়ার সুযোগ তাঁর ছিল। এইসব মানুষের, এইসব চরিত্রের নানা ঘটনা, নানারকমের সুখ-দুঃখ তাঁদের। 'নাটক' মানেই নানারকম চরিত্রের সমাবেশ। তাই গল্প লেখার অভিজ্ঞতাকেও তিনি এ ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছিলেন। নাটকের তো একটি

যৌবনে বনফুল

গল্প থাকতেই হয়। স্বভাবতই বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে তিনি যেসব নাটক লিখেছেন, তাতে প্রাধান্য পেয়েছে তৎকালীন সমাজ এবং মানুষ। নানাধরনের নাটক লিখেছেন। জীবনী-নাটক, প্রহসন, ব্যঙ্গ নাটক এবং সিরিয়াস নাটক। ছোটগল্পের মতোই কোনও কোনও নাটকের শেষে তিনি দিয়েছেন চমক। বাংলা সাহিত্যে জীবনীনাটকের সংখ্যা তো হাতে গোনা। জীবনীনাটক লেখার চেষ্টা করে ব্যর্থও হয়েছেন অনেকে। সেক্ষেত্রে বনফুল কিন্তু অনেকখানি সফল।

বিদ্যাসাগর আর মধুসূদন। একজন শিক্ষা ও সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব, অন্যজন সাহিত্যের এক অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। তাঁদের জীবনস্রোতে নানা ঘটনা—তা সবটাই নাটকের মতোই। এই দুটি জীবনের সুখ-দুঃখ, শোক-যন্ত্রণা রূপায়িত করলেন তিনি।

মধুসূদন জন্মেছিলেন সোনার চামচ মুখে নিয়ে। ছিল অফুরন্ত সাহিত্যপ্রতিভা। ইংরেজি সাহিত্যের বড় কবি হওয়ার বাসনা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল। নানা দুঃখকষ্ট ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন মধুসূদন। তীব্র আবেগ তাঁকে এক দুঃখ থেকে আর এক দুঃখে পরিবাহিত তাড়া করে বেড়িয়েছে। তিনি যেন আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী হয়েও জীবননাট্যে হয়ে উঠেছিলেন এক ট্র্যাজিক হিরো। বনফুল আশ্চর্য দরদ এবং দক্ষতায় এই চরিত্রটিকে রূপায়িত করলেন। মধুসূদনের যৌবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে জীবন, সেই জীবনের নানা ঘটনাকে

ভূমিকায় প্রভাব নাটকে চিত্রিত করেছেন তিনি। কিছু ত্রুটি থাকলেও 'শ্রীমধুসূদন' বাংলা নাট্যসাহিত্যে অন্যতম জীবনীনাট্য হিসাবে চিহ্নিত। বস্তুত মানুষের একটি মানুষের জীবন নিয়ে নাটক লেখার কাজটি সহজ নয়। কিন্তু বনফুল সেই কাজটি করেছিলেন। ত্রুটিযোগ আছে, এই নাটকে নিয়ন্ত্রিত কিছু ঘটনার সঙ্গে মধুসূদনের জীবনের ঘটনার মিল নেই। তবুও 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে মধুসূদন চরিত্রটি তাঁর একটি অমর সৃষ্টি।

'শ্রীমধুসূদন' এর পর 'বিদ্যাসাগর'। উনবিংশ শতাব্দীর এই মনীষী ব্যক্তির জীবন অবলম্বনে নাটক রচনার কাজটি ছিল দুঃসাহসী। বনফুল সেই দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন ১৩৪৮ সালে। বনফুল 'বিদ্যাসাগর' নাটকটি লেখেন। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় বেশ কয়েকটি সংখ্যা ধরে নাটকটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনও ঘটনাবহুল। শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কিত নানা আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন বলিষ্ঠ, প্রতিবাদী এবং দয়াপরায়ণ। এই নাটক রচনার ক্ষেত্রে বনফুল ছিলেন আরও কিছুটা সতর্ক। বিদ্যাসাগরের জীবনের নানা ঘটনা, তথ্য ও উপাদান সংগ্রহে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। পরে সেগুলি নাটকে প্রতিফলিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মানবিক দিক উদ্ভাসিত এই নাটকে। তাঁর চরিত্রে যে তেজ, দীপ্তি, পৌরুষ এবং উজ্জ্বলতা ছিল, বনফুল সেগুলিকে যথাযথ দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এ জাতীয় চরিত্র অনেক সময়েই লেখকের অসতর্কতায় 'অতিমানব' হয়ে ওঠে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি।

বিধবা বিবাহ বহু প্রথার আন্দোলনে বিদ্যাসাগর নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করে বিধবা বিবাহ দিয়ে দিয়ে আর্থিক দিক থেকেও তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তবু পিছিয়ে আসেননি বিদ্যাসাগর। নানা কারণে এক সময় স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গেও সম্পর্কহীন(?) হয়েছিল তাঁর। এমন একটি পৌরুষ শেষ জীবনে হয়ে পড়েছিলেন একা নিঃসঙ্গ।

বনফুল অসাধারণ দক্ষতায় এইসব ঘটনার পরিবেশে বিদ্যাসাগরের আপসহীন চরিত্রটি রূপায়িত করার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই নিঃসঙ্গতা বিদ্যাসাগরকে হয়তো হতাশাগ্রস্ত(?) করেছিল, কিন্তু বনফুল 'বিদ্যাসাগর' নাটকটি শেষ করেছিলেন অন্যভাবে। নাটকের শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি, বিদ্যাসাগর এক বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহিত জীবনের আনন্দ ছবি দেখে যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। সেখানে হতাশার অন্ধকার থেকে উঠে আসা আলোকপিয়াসী বিদ্যাসাগর বলে উঠেছেন: এই তো, এই তো, এই তো বিধ্বস্ত মরুভূমির মাঝখানে এই তো একটি সবুজ শিষ।... এই সংলাপে নাট্যকার বনফুল যেন বিদ্যাসাগর চরিত্রটিকে আশ্চর্যভাবে সুন্দর করে তুলেছেন।

নাটকটিতে প্রাধান্য পেয়েছে বিধবা বিবাহের ব্যাপারটি। তৎকালীন সমাজে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগর যে এত দুঃখ পেয়েছিলেন, তাতে সমগ্র সমাজ আলোড়িত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের পরবর্তী জীবনে যে যন্ত্রণা, যে নিঃসঙ্গতা—তার মূলে বিধবা বিবাহ আন্দোলনটি গভীরভাবেই জড়িয়ে ছিল। হয়তো এ কারণেই এই ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছিল নাটকে। সর্বোপরি, ঘটনাগত দিক থেকে কিছু ত্রুটি থাকলেও 'বিদ্যাসাগর' চরিত্রটিকে তিনি সমাজের আদর্শ হিসাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। সে ক্ষেত্রে বনফুল অবশ্যই একজন সার্থক নাট্যকার।

নাটক সমাজের দর্পণ। নাটকের ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বড় কথা। সকল নাট্যকারই তাঁর নাটকে সমাজের নানা ঘটনাকে তুলে ধরতে চান। তবে বিভিন্ন নাট্যকারের নাট্য উপস্থাপনার রীতিটি ভিন্ন হতেই পারে। বনফুলের বেশ কয়েকটি নাটকে তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুটিত—তাই এইসব নাটককে সামাজিক নাটক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। মধ্যবিত্ত, কঞ্চি, দশভাণ(?) মোহন, আসর প্রভৃতি নাটক বনফুলের সামাজিক নাটক হিসাবে চিহ্নিত। একটা কথা বলা দরকার, সমাজকে বনফুল চিনেছেন গভীরভাবেই। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা তাঁর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর ছোটগল্পে, উপন্যাসে উঠে এসেছে তাঁর সমাজ দেখা নানা চরিত্র। তিনি নিজেও ডাক্তার হওয়ায় তাঁর সৃষ্টি সাহিত্যের চরিত্র হয়ে উঠেছেন। নাটকের ক্ষেত্রে বনফুল তাঁর চেনাজানা সমাজের ছবি আঁকতে চেয়েছেন বেশ কয়েকটি নাটকে। সেই সমাজকে চিত্রিত করতে গিয়েই উঠে এসেছে নানা চরিত্র। সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরিত্রগুলি সক্রিয় হয়েছে। 'মধ্যবিত্ত' বনফুলের এইরকম একটি সামাজিক নাটক। আর্থিক অভাবে অসহায় মানুষের ট্র্যাজিক রূপটি এ নাটকে বাস্তবতার আলোয় প্রকাশিত। ১৩৪৮ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় নাটকটির কিছুটা পরিবর্তনও ঘটিয়েছিলেন বনফুল।

'কঞ্চি' নাটকের বিষয়বস্তু ছিল অসবর্ণ প্রেম এবং বিয়ে। 'মধ্যবিত্ত' নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার ঠিক এক বছর পরে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাতেই (১৩৪৯, কার্তিক সংখ্যা) 'কঞ্চি' নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল। অসবর্ণ বিয়ে তৎকালীন সমাজে গর্হিত কাজ হিসাবে বিবেচিত হত। 'কঞ্চি' নাটকে বনফুল ব্রাহ্মণের মেয়ে সুলতার সাথে বৈদ্য জাতের ছেলে কিরীটির ভালোবাসার কথা বলেছেন। এখানেই মেয়ে ব্রাহ্মণী, বনফুল, সুলতা-কিরীটীর বিয়েও হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায়, নাট্যকার হিসাবে তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত। নাটকের পুরুষ চরিত্র কিরীটি তখন ভাবছে সুলতাকে বিয়ে করলে পিতার সম্পত্তি থেকে সে বঞ্চিত হতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নাটকের নায়িকা সুলতাকে দিয়ে বনফুল বলিয়েছেন— 'তোমার টাকাকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছি— এ কথা যদি তুমি ভেবে থাক, তাহলে আমাকে ভুল বুঝবে তুমি।'— এই একটি সংলাপেই

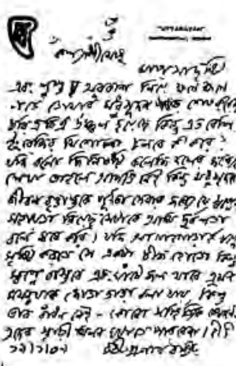

একটি নারী চরিত্রকে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন। এই সুন্দরীর ডাকনাম 'কঞ্চি'— তাই নাটকটির 'কঞ্চি' নামকরণ। সংলাপ ব্যবহারে বনফুল এ নাটকে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

১৩৫৪ সালে বনফুলের আরও একটি নাটক প্রকাশিত হয়—নাটকটির নাম '[illegible]।' নামকরণেই নাটকটির বক্তব্য আন্দাজ হয়। এ নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতেও নারী। পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের জীবনে নানা অসহায়তা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী সেই অসহায়তাকে মেনে নিয়েছে 'ভাগ্য' হিসাবে। কিন্তু এই অসহায়তা ভাঙতে চেয়েছে এমন সাহসিনী নারীচরিত্র সমাজেই দেখা গেছে। '[illegible]' আসলে এক নারীর মাথা তুলে দাঁড়ানোর, নারীজাতির প্রতি অবহেলার বিরুদ্ধে কেমন প্রতিবাদের নাটক। এই নাটকটি বনফুলের আর একটি সাহসী সৃষ্টি। এই নাটকে বনফুল যথেষ্ট একথার প্রমাণ করতে পেরেছেন, সামাজিক কুসংস্কার থেকে তিনি মুক্ত।

১৩৭২ সালে 'নবকল্লোল' পত্রিকায় বনফুলের একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকটির নাম ছিল '[illegible]'। ১৩৮০ সালে এই নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় নাটকটির [illegible] নাটকে [illegible] বনফুলের [illegible] নাটককার বনফুল এখানে দুর্বল, বোধহয়।

বনফুলের নাটকগুলির মধ্যে 'মন্ত্রমুগ্ধ' উল্লেখ্য। এই নাটকটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি' (১৩৫৯) পত্রিকায়। পরে নাটকটি একটি নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এ নাটকে অন্য এক বনফুলকে পাওয়া যায়, যিনি কৌতুকরস সৃষ্টিতে দক্ষ। নাটকটি একদা দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল কৌতুকরসের গুণেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বনফুলের এই নাটকটির কৌতুকরসের প্রশংসা করে বনফুলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। অনেকটা প্রহসনের রীতিতে 'মন্ত্রমুগ্ধ' রচিত। মঞ্চেও [illegible] অভিনীত হয়ে 'মন্ত্রমুগ্ধ' জনপ্রিয় হয়েছিল। নিউ থিয়েটার্সের উদ্যোগে [illegible] 'মন্ত্রমুগ্ধ' চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। বনফুল নিজেই [illegible] দিয়েছিলেন।

এবারে আসা যাক বনফুলের একাঙ্ক নাটকের প্রসঙ্গে। নাটক একদা ছিল বিনোদনের মাধ্যম। নাটক করে এবং নাটক দেখে কিছু মানুষ সাময়িক আনন্দ পেতেন, তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ বিশেষ ছিল না। ধর্ম বা নীতির প্রচারেও তখন নাটক একটি জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের সংজ্ঞা এবং চরিত্র বদলাতে থাকে। নাটকের ক্ষেত্রেও সামাজিক সচেতন প্রতিনিধিরা এলেন। তাঁদের উন্নত ভাবনার ফলে নাটকের চরিত্র বদলে যেতে শুরু করল। বিনোদনের নাটক হয়ে উঠতে শুরু করল সমাজসচেতন নাটক। পরিবর্তন এল নাটকের [illegible] বিষয়েও। সমসাময়িক সামাজিক ঘটনা, জীবনের সংকট নাটকের বিষয় হয়ে উঠল। নাটক হল জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার। নাটক করা বা নাটক দেখা শহরবাসীর নিছক বিনোদন নয়, তার ভাবনার মাধ্যমও হয়ে উঠেছিল। এই পথ ধরেই এসেছিল একাঙ্ক নাটক।

একাঙ্ক নাটক তাই সমকালের সচেতনতার একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল এক সময়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একাঙ্ক নাটক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যথেষ্ট জনপ্রিয়তার জায়গায় এসে দাঁড়াল। পরবর্তীকালের নাট্যকাররা তাই একাঙ্ক নাটক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেননি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ছিল রাজনীতিতে এক উত্তেজনাপূর্ণ সময়। একদিকে শোষণ, বঞ্চনা—অন্যদিকে শোষণ আর বঞ্চনার নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হল কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। কার্ল মার্কস নতুন আলো জ্বাললেন মানুষের সংগ্রামী চেতনার পথে। এ সময়টা তাই অন্যায়-শোষণ-লাঞ্ছনা-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত মানুষের মাথা তুলে দাঁড়ানোর সময়। সাম্যবাদের আদর্শে সে সময়ে দীক্ষিত হয়েছিলেন একটি সচেতন শ্রেণী। সোভিয়েত,

তিনীতিঃ মানুষকে সংগঠিত করতে তাঁরা তুলে নিয়েছিলেন কলম, তাঁরা নাটক লেখেন, তাঁরা সে ক্ষেত্রে নাটককেই হাতিয়ার করেছিলেন। প্রসার ও বৃদ্ধি ঘটেছিল একাঙ্ক নাটকের।'

একাঙ্ক নাটকের এই ধারায় বনফুলও শামিল হয়েছিলেন। ছোটগল্প-উপন্যাসের মত সাহিত্যিক বনফুলের ধাতে ছিল, নাটক একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। তাই বেশ কিছু একাঙ্ক নাটকও লিখেছিলেন তিনি। তাঁর সমকালে বেশ কয়েকজন ছিলেন, যাঁরা কোন জাতাই নাট্যকার। এঁদের মধ্যে বনফুল বাদ ব্যতিক্রম। বনফুল কোন জাতই নাট্যকার ছিলেন না, কিন্তু নাট্যকার হিসাবে তিনি সবসময়েই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজসচেতনতার তাগিদেই যেন তিনি নাটক লেখার তাগিদ অনুভব করতেন।

১৯৪৪ সালে বনফুলের একাঙ্ক নাটকের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংকলনের নাটকগুলি ছিল বিষয়বৈচিত্র্যে ভিন্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটক রচনার রীতিনীতিকে তিনি মান্য করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, নাট্যকলা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত নাট্য সংকলনের সব নাটকগুলিই একাঙ্ক। মোট দশটি নাটক ছিল এই সংকলনে। 'দশভান' নামে এই নাট্য সংকলনটির নাটকগুলিতে বনফুল যথার্থই এক দক্ষ নাট্যকার—তিনি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলো ফেলে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন সমাজের স্তরে জমা অন্ধকার। স্বভাবতই এই নাটকগুলি জনসমাদৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় সংস্করণে যুক্ত হয়েছিল আরও পাঁচটি একাঙ্ক নাটক।

এই সংকলনের নাটকগুলির মধ্যে স্বপ্নঃ, শিককাবাব, মানগ্রহ, অবাস্তব, জল প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন নাটকের বিষয়বস্তু যেমন বিভিন্ন, নাট্যরসেও তেমনি বৈচিত্র্য। কোথাও তিনি প্রতিবাদী, কোথাও সমাজসচেতন, আবার কোথাও কৌতুকপ্রিয়। কিন্তু সব নাটকগুলিরই শিকড় প্রোথিত মানুষ ও সমাজকে কেন্দ্র করে।

'স্বপ্নঃ' বনফুলের অন্যতম জনপ্রিয় একাঙ্ক। এখনকার বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের কাছেও নাটকটি সমাদৃত। কাল্পনিক কাহিনীকে অবলম্বন করে নির্মল হাস্যরস বিতরণে বনফুল এই নাটকে সফল নাট্যকার। জম্বুদ্বীপের রাজকন্যাকে কবিতা লিখে যে খুশি করতে পারবে, রাজকন্যা বসুন্ধরা তাকেই বিয়ে করবে। স্বভাবতই কবিতা এ নাটকের একটি সহায়ক বিষয়। বনফুলের সাহিত্যজীবন বিশ্লেষণ করলে জানা যায়, সাহিত্যচর্চার শুরুতে তিনি কবিতাই লিখতেন। শুধু তাই নয়, ব্যঙ্গ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। স্বপ্নঃ নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে কবিতা এবং সেইসব কবিতার ছন্দ-মাত্রা মিলিয়ে বনফুল রীতিমতো এ নাটক জমিয়ে দিয়েছেন। এই নাটকে ব্যবহৃত ব্যঙ্গ কবিতাগুলি কবিপ্রিয় বনফুলকে নতুন করে চিনিয়ে দিয়েছে।

এই সংকলনে 'শিক-কাবাব' নাটকটির কথা উল্লেখ করতেই হয়। না, রসকবিত্ব বনফুল নয়, এ নাটকে পাওয়া যায় প্রখর সমাজ-সচেতন এবং প্রতিবাদী নাট্যকার বনফুলকে। এ নাটকের উপজীব্য 'নারী'। বনফুলের সমকালীন এক কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় লিখেছিলেন—'পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকেদের দাবি এসে সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।'... এই একই কথার প্রতিধ্বনি যেন 'শিক-কাবাব' নাটকে। এক শ্রেণীর অভিজাতের কাছে নারী শুধু রসনাতৃপ্তির ভোগের সামগ্রী। দ্য, শিক-কাবাব সহযোগে ভোগ করা হবে এক নারীকে, অভিজাত সমাজের তরফে প্রস্তুতি নিচ্ছেন — এইরকম একটি মুহূর্তে নাটকের শুরু। প্রস্তুতি শেষ হলে মেয়েটিকে ডাকা হয়। কিন্তু মেয়েটি আসে না। দেখা যায়, গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে। শেষ মুহূর্তে নাটকটি যেন চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে সমস্ত সমাজের গালেই যেন চপেটাঘাত করেছে। নারীমাংসলোলুপ অভিজাতের হাতে নিজেকে নিবেদন করার চেয়ে মৃত্যু সেই মেয়েটির কাছে অনেক সম্মানের—আত্মহত্যার মাধ্যমে নাট্যকার বনফুল হয়তো এ কথাই বলতে চেয়েছেন। মৃত্যু তাই এখানে একটি প্রতিবাদ।

মানগ্রহ, অবাস্তব, জল প্রভৃতি নাটকেও বিষয়-বৈচিত্র্য। নাট্যকার বনফুলের মধ্যেও কিন্তু ছোটগল্পের বনফুল মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে। তাঁর সব নাটকেই আছে টান-টান গল্প—যা নাটকগুলির সাফল্যে অনেকটাই সহায়ক। 'মানগ্রহ' একটি সার্থক এবং জমজমাট নাটক। 'জল' নাটকে বনফুলের বিজ্ঞান চেতনার প্রকাশ। 'অবাস্তব' নাটকে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ। বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন বনফুল। 'নমুনা' নাটকে বনফুল আরও বেশি সচেতন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষজনিত বিপর্যয় এবং মুনাফাখোরদের অবস্থান এ নাটকের উপাদান।

'দশভান ও আরও কয়েকটি' শীর্ষক একাঙ্ক নাট্য সংকলনের নাটকগুলি হল—শিক-কাবাব, সোয়া, জল, অবাস্তব, নব-সংস্করণ, স্বপ্নঃ, মানগ্রহ, অনুষ্ঠিতে, আকাশ নীল, ১লা অঘ্রান ১৩৪৮। পরবর্তীতে সংযোজিত নাটকগুলি হল: কবিতা বিভ্রাট, কুজন পূর্ণিমা, ত্রিপদস্ফোট, নমুনা, আত্মজা মিলন। ১৩৫২-৫৮ সালের বিভিন্ন সংখ্যায় তৎকালীন সাহিত্য পত্রিকা শনিবারের চিঠি, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় নাটকগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৬৯ সালে সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'পুতুল' নামে তাঁর একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় শেষ জীবনে ১৯৭৬ সালে তিনটি নাটক একত্রিত করে 'ত্রিনয়ন' নামে একটি নাট্যগ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। টুইবি, ঘটকচূড়ি, কৈকেয়ী—এই তিনটি নাটক নিয়ে 'ত্রিনয়ন' নাট্য সংকলন। তাঁর 'তৈত্তির' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে 'দিনেমার চক্র' নামে একটি রোমান্টিক চিত্রনাট্য লিখেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের জগতে অনেক খ্যাতকীর্তি নাট্যকার আছেন। কিন্তু সেই তালিকা থেকে বনফুলের নামটি কোনওভাবেই বাদ দেওয়া সম্ভব হবে না। একজন সচেতন এবং দায়বদ্ধ নাট্যকার হিসাবে 'বনফুল' তাঁর সৌরভকে বাংলা নাট্যজগতে এখনও যুক্ত করে রেখেছেন। এখানেই নাট্যকার বনফুলের সাফল্য।

অসাধারণ

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

শতবর্ষে বনফুল

বনফুলের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই। তবে যেহেতু তিনি আমার দাদা। মানুষ বনফুল সম্বন্ধে আমি দু-একটা কথা বলতে পারি। মানুষটা ছিলেন—আপাত বিদ্রোহী। খানিকটা অস্বাভাবিকও বলা যেতে পারে। রেগে গেলে জ্ঞান থাকত না। হাতও চলত। আবার মন ভাল থাকলে মাটির মানুষ। বিলাসিতা একেবারে ছিল না। বারোমাস খদ্দরের ধুতি এবং পাঞ্জাবী এবং পায়ে সাধারণ একটা জুতো। খাবারে চিনি নিতেন না। তিনটি জিনিসের খুব শখ ছিল। বই পড়া, খাওয়া এবং ফুল গাছ। বিশেষ করে গোলাপ। প্রতিদিন মাংস খেতেন। মাসে দু'দিন বাইরে। ছাদে বা উঠোনে শুতেন। এমন কি মানুষটা খামখেয়ালী ছিল। কিন্তু কর্তব্যবোধ ছিল। ওঁর ভাগলপুরের বাড়িতে বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন থেকে পড়াশুনা করত। থাকতেন ভাগলপুরে। আমাদের আসল বাড়ি মনিহারী গ্রামে। ওইখানেই দাদার জন্ম এবং শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে। মনিহারীর মাইনর স্কুলে দাদা প্রথম বারেই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে প্রথম হয়ে স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করে, সাহেবগঞ্জ হাইস্কুলে পড়েন। হাজারিবাগ কলেজ থেকে পাশ করে কলকাতা এবং পাটনায় মেডিকেল থেকে ডাক্তার হন। বিহারে নামকরা ডাকসাইটে প্যাথলজিস্ট ছিলেন। মনিহারীর কোন রোগী এলে ফি নিতেন না। আবার মনিহারীর কেউ অসুখ হলে, তার যদি ভাগলপুরে আসার সামর্থ্য না থাকত তবে দাদা ট্রেনে করে সাহেবগঞ্জ হয়ে সকরিগলি ঘাটে স্টিমারে পার হয়ে

মাইক্রোসকোপ সঙ্গে নিয়ে মনিহারীতে গিয়ে সেই রোগীকে দেখে আসতেন। অবশ্য এইসব করতেন বাবার জন্য। বাবা ডাঃ সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ওই অঞ্চলে প্রথম অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার। তাঁরও খুব সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। অসুখ না সারলে ফিজিট নিতেন না। তাঁর মনিহারীর বাড়িতে অনেক পোষ্য ছিল। আত্মীয়স্বজন ছাড়া অনেক ছাত্র, শিক্ষক, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান ছিল। তাঁরা আমাদের বাড়ি থেকে পড়তেন এবং পড়াতেন। এক একদিন দেখেছি, বাবা মুসলমান ছাত্র মহম্মদিন মৌলভি সাহেবের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে খেতেন।

তারাশংকর (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) বাবাকে খুব ভক্তি করতেন, মনিহারীতে গেলেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। যতদিন জীবিত ছিলেন প্রতি বছর বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে পত্র দিতেন। বাবাও বাবার মতো তথাকথিত জাতপাত মানতেন না। বাবার ল্যাবরেটরিতে শুধু ইউরিন পরিষ্কার করার জন্যে সিতারি নামে একটি মেথর এবং জাতের লোক ছিল। এমনি সে জাতের ভুলের জন্য অনেকবার মারও খেয়েছে। বাবার ল্যাবরেটরিতে তা জানার ব্যবস্থা ছিল। সিতারি তা করতো। সিতারির মেয়ের বিয়েতে বাবা সেই মাধবপল্লিতে গিয়ে সিতারির মেয়েকে সুন্দর একটি শাড়ি দিয়ে আশীর্বাদ করে ওই মাধবদের সঙ্গে তৃপ্তি সহকারে মোটা লুচি, তরকারি, ডাল, শুয়োরের মাংস, টকদই খেয়ে এসেছিলেন। আবার ১৯৩৫ সালে একজন বিহারী ম্যাজিস্ট্রেট বাবার ল্যাবরেটরিতে এসে তাঁর স্ত্রীর ইউরিনটা এখুনি পরীক্ষা করে দিতে হবে, হাকিমি কায়দায় হুকুম করেছিল। বাবা তক্ষুনি তাঁর স্ত্রীর ইউরিনটা নালিতে ফেলে দিয়ে সেই ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছিলেন। সেই সময় ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটদের আজকালের মুখ্যমন্ত্রীদের চেয়েও বেশি দাপট ছিল। বাবা সে সব পরোয়া করতেন না। বাবার অন্য সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে অনেকের বদ অভ্যাস ছিল, মদ্যপান করা ইত্যাদি। বাবা কিন্তু এসব ব্যাপারে খুবই কনসারভেটিভ ছিলেন। তিনি ওসব ছুঁতেনই না। নেশার মধ্যে ছিল চা এবং খৈনি। বাবার চরিত্রের সব চেয়ে বড় দিক ছিল কখনো মিথ্যে কথা বলতেন না এবং অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতেন না। সেইজন্যে বাবাকে সবাই শ্রদ্ধা করত এবং ভয় করত। ভাগলপুরে আড়ালে অনেকে বলতো—বলাইবাবুকো আদমি নেহি হ্যায়, মহাদেব, শিউ (শিব) হ্যায়। বলেই মাথায় হাত ঠেকাত।

'ডানা' বইটি লেখবার সময় বাবা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বায়নোকুলার নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে পাখি দেখতেন। আর কত যে পাখির বই পড়তেন ভাবা যায় না। এই বইটা লিখতে উনি যে কত পরিশ্রম করেছেন ভাবা যায় না। সুরসিক রাজশেখর বসু (পরশুরাম) আমায় বলেছেন—'বনফুল ডানা বইটা অনুবাদ করে নোবেল পুরস্কারের জন্য পাঠাচ্ছে না কেন? যাহোক, বাবা এইসব পুরস্কার-টুরস্কার পছন্দ করতেন না। শিল্পের বিচার করবে কাল-সময়। সেই সময়ে রাজ্যপালের চিফ সেক্রেটারি মিঃ বি আর গুপ্ত না থাকলে বাবা বোধহয় পদ্মভূষণ খেতাবটা গ্রহণ করতেন না। বাবা বিনয়বাবু (বি আর গুপ্ত)-কে খুবই ভালবাসতেন। উনি খুবই

সম্পূর্ণ এক। নির্ভীক ব্যক্তি ছিলেন। এই বিনয়বাবুর প্রসঙ্গে একদিন একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। এটি খাকি ট্রাউজার্স ও সাদা শার্ট টাইট। আমি প্রতি মাসে অন্তত দুটি রবিবার সকালবেলা দাদার কাছে যেতাম টিফিন হাতে নিয়ে। সারাদিন থাকতাম। খুব ভাল লাগত। নানা নতুন লেখা শোনাতেন।

এমনি একদিন রবিবারে সেই টাইটে গেছি। দাদা সাধারণত খালি গায়ে লুঙ্গি পরে থাকতেন। আমাকে দেখে বললেন, এসেছিস, ভাল করেছিস। চল, বিনয়কে দেখে আসি। আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতেই—বিনয় একটু অসুখ করেছে বলে দাদা একটা হাফশার্টের পাঞ্জাবী পরে নিলেন। সাধারণত জামার বোতাম লাগাতেন না। বোতাম কাটিয়ে খোলানো … নিলেন। আর নিলেন ওঁর সব সময়ের সঙ্গী ছোট্ট সুটকেসটি। দাদার ছোট্ট নট সুটকেস। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ, পোস্টকার্ড, খাম, কলম, ডাইরি, চিনি, পড়ার চশমা, ল্যাবেন্ডুস, টিপ, কান খুসকি, ছুরি, ছোট্ট কাঁচি, আর একটা মানিব্যাগে কিছু খুচরো টাকা-পয়সা থাকত।

বিনয়বাবুর বাড়িটা দাদার বাড়ির কাছেই। কি-ব্লকের পেছন দেখেন দিকে। বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখি দাদার বাড়ির পাশের খালি জায়গাটায় আগের দিন রাতে বিয়েবাড়ির ভোজ হয়ে গেছে। তারই উচ্ছিষ্ট, পাতা, লুচি, সন্দেশের অবশিষ্টাংশ ফেলেছে। সেখান থেকে কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েরা মাংস, চপ, মিষ্টি খুঁজে খুঁজে বার করে খাচ্ছে। দাদাকে দেখে আমায় হাসল। দাদা একটা চার-পাঁচ বছরের কালো মেয়েকে ডাকলেন। মেয়েটা ভয়ে ভয়ে এল। দেখলাম তার দু'নাক দিয়ে সাদা শিকনি ঠোঁটে এসে ঠেকেছে। দাদা তাকে আদর করে বসালেন। পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে তাকে কাছে ডেকে তার নাকের শিকনি সযত্নে মুছিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে রুমালটি আবার পকেটে রেখে দিলেন। এরপর ছোট্ট সুটকেসটি খুলে তার থেকে একটি করে টাকা ও সন্দেশ

প্রত্যেক বাচ্চার হাতে দিয়ে আবার হাঁটতে উঠে, মাথা উঁচু করে ইলেকট্রিক তারের দিকে তাকিয়ে আমায় বললেন, ওই দ্যাখ একটা বুলবুল ফিঙে। এই ফিঙেটা খুব তেজী টাইপ। তারপর ফিঙে পাখির ইতিহাস বলতে বলতে বিনয়বাবুর বাড়ির দিকে চললেন। বিনয়বাবু তখন আছেন। খুব দুর্বল এবং অসুস্থ। দাদা দেখলেন। এর আগে বলে রাখি দাদা যেহেতু মাংসাশী তাই বিনয়বাবুর স্ত্রী প্রায়ই দাদার জন্য বেসিন'র রান্না করে রাখতেন খাবার জন্য। মাঝে মাঝে বাড়িতেও লোকের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। দাদা বিনয়বাবুর দুর্বলতা ও অসুস্থির কথা শুনে গম্ভীরভাবে বললেন তোমাকে ভালভাবে পুষ্টিকর মাংস খেতে হবে। আমি তোমার রেসিপি মাংস রান্না করে পাঠাচ্ছি। খুব ভেঙে গেছে। বিনয়বাবুর নির্মল হাসিতে মুখটা ভরে গেল।

দু'সপ্তাহেই বিরাট কিছু হতে শুরু করল। দাদার প্রসঙ্গে বলতে গেলে বৌদিকে না উল্লেখ করলে অন্যায় করা হবে। তিনি ছিলেন আমার মায়ের মতন বৌদি, শিক্ষা দেবী। সাহিত্যিক বনফুলের তিনি শুধু যথার্থ সহধর্মিণী ছিলেন না, ছিলেন প্রেরণা, শিক্ষয়িত্রী এবং পরিচালিকা। দেখাশুনার দায়িত্বেই ছিলেন। দাদার লেখার উৎসাহ দেওয়া এবং দাদা প্রত্যেকটি লেখা লিখে প্রথমে বৌদিকে দেখাতেন। বৌদি ছিলেন খুব স্পষ্টবাদিনী। লেখার কোথাও ত্রুটি থাকলে না বলে ছাড়তেন না। জনৈক আমেরিকান … কি … গ্রেট … আর্টিস্ট … স্কুল আমেরিকার … বৌদি ছিলেন তাই। দাদাও বৌদিকে কত ভালবাসতেন, তা বৌদি চলে যাবার পর বুঝলাম। বৌদির মৃত্যুর পর 'কী' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন—এটি দাদার একটি অসাধারণ সৃষ্টি। তারপর প্রতিদিন বৌদিকে চিঠি লিখতেন যেগুলো ঠিক চিঠি নয় প্রতিদিনের ডায়েরি। এছাড়া দাদা বর্তমানে দেশের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে যে সব মন্তব্য এবং ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন, তা অনেকেই আজকালকার ভবিষ্যৎবাণী যেন। দাদা সম্বন্ধে বলতে গেলে বিরাট একটা বই হয়ে যাবে। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন তাঁদের—'শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থ রূপ দেখাতেন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যেমন ক্ষুদ্র অণু পরমাণুকে বড় করে। ঐ মাইক্রোস্কোপের বিপরীত কোন যন্ত্র যদি থাকত, যার দ্বারা হিমালয়ের মতো বিরাট বস্তুকেও ক্ষুদ্র করে দেখানো যায়, সেই যন্ত্র যদি আমার কাছে থাকত তাহলে আমি বিরাট মহান শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে আপনাদের দেখাতে পারতাম।' আমার দাদাও আমার কাছে ঠিক ঐ শিবনাথ শাস্ত্রীর মতন বিরাট মহান।

আজকে দাদার শতবর্ষে তাঁকে স্মরণ করে আপনারা যে বিশেষ রচনা বার করেছেন তার জন্যে আমি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে আপনাদের অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরলোকে বনফুল : বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের অবসান

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রবীণ ও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বনফুল শুক্রবার ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, ২৬ মাঘ, ১৩৮৫ প্রাণত্যাগ করেন। সরস্বতীর বরপুত্র পুজোর দিন, ১ ফেব্রুয়ারি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ-যোগে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং নয় দিন অবিরাম মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে শুক্রবার প্রত্যুষে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর ৭ মাস।

বনফুলের দেহাবসানের খবর প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে লেকটাউনে তাঁর বাড়িতে গুণমুগ্ধ মানুষ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব উপস্থিত হন চিরনিদ্রায় শায়িত বনফুলকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। কলিকাতা পৌরসংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংস্থা, বিদ্যালয়, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বনফুলের মরদেহে মাল্যার্পণ করে।

দ্বিপ্রহরে বনফুলের মরদেহ নিয়ে শোকযাত্রা বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমার পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ সহ বিভিন্ন সংস্থা ঘুরে নিমতলা মহাশ্মশানে উপস্থিত হয়। এখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

বনফুলের পূর্বপুরুষ আদিতে ছিলেন হাওড়া জেলার অধিবাসী। তাঁর প্রপিতামহ বিহার রাজ্যে পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে বসবাস করতে যান। বনফুলের পিতা স্বর্গীয় সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় মণিহারীতে চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সত্যচরণের পঞ্চপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলাইচাঁদ অর্থাৎ বনফুল পূর্ণিয়া

জেলার মণিহারী গ্রামে ১৯ জুলাই, ১৮৯৯, বঙ্গাব্দ ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

মণিহারী গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্কুলে ভর্তি হন। কৈশোরেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় তাঁর লিখিত প্রথম কবিতা দুটি ছোট সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তিনি বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক কর্তৃক তিরস্কৃত হন। লেখা না লিখে সময়টা পাঠে ব্যয় করার জন্য প্রধানশিক্ষক বলাইচাঁদকে সদুপদেশ দেন। সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখতে কৃতসংকল্প বলাইচাঁদ হয়তো প্রধানশিক্ষকের চোখে বা অন্য কোনো কারণে 'বনফুল' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। বলাইচাঁদ যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ১৯১৮ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রথম তাঁর গদ্য রচনার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এইবার প্রধানশিক্ষক বলাইচাঁদকে আশীর্বাদ করে 'বনফুল' নামে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হবার কথা বলেন। এই বছরেই তিনি বৃত্তি পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে আই-এস-সি পড়তে ভর্তি হন। ১৯২০ সালে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে শুরু করেন এবং যথাসময়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ডাক্তারি পাশ করার পর প্রথম চাকুরির তিক্ত অভিজ্ঞতায় তিনি চাকুরি-জীবন চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেন এবং কলকাতাতেই জীবিকার জন্য একটি চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগাড় করেন। এই প্রচেষ্টায় তাঁর চিকিৎসক বন্ধুরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন।

বলাইচাঁদ এই সময়েই গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করেন। বিবাহের একদিকে থাকার তখন বনফুল ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কবিতা মুদ্রিত আকারে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পর তাঁর স্ত্রী লীলাবতী দেবীর আড়াই বছর আগে মৃত্যু ঘটে।

কলকাতায় দোকান দেবার এক বছর পরেই তিনি আজিমগঞ্জে যান এবং স্থানীয় একটি হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসারের চাকুরি করেন মাত্র এক বছরের জন্য। ১৯২৯ সালে তিনি ভাগলপুর যান এবং সেখানে একটি ল্যাবরেটরি খোলেন যেটি তিনি পরবর্তী ৪০ বছর চালিয়ে এসেছেন তাঁর সাহিত্যসাধনার সঙ্গে সঙ্গে। ১৯৬৮ সালে ভাগলপুরের পাট চুকিয়ে এক বছর বসবাস করে ১৯৬৯ সাল থেকে বনফুল লেকটাউনের স্থায়ী বাসিন্দা হন। ব্যক্তিগত জীবনে সুদর্শন ও সুকাঞ্চনবর্ণ অধিকারী এই পুরুষ ছিলেন সুরসিক। সকলের অতি কাছের মানুষ। লেকটাউনে তাঁর বাড়িতে সকলের দ্বার ছিল অবারিত।

১৯২৯ সাল থেকেই বনফুল সাহিত্য সাধনায় সর্বপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং সাহিত্যের সকল বিভাগ তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

বাংলার ১৩৩৫ সালে তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'তৃণখণ্ড'। এই উপন্যাসের নায়ক বলেছেন, ''আমি ডাক্তার, আমি কবিও। আমার জীবনকাহিনী যদি শুনিতে চান তবে আমার কবিতাও পড়িতে হইবে। তবেই আমার জীবনের সত্যপ্রকাশ।' ডাক্তারি জীবনের অভিজ্ঞতা ও শিল্পীজীবনের অনুভূতিতে মিশ্রিত হয়ে উঠেছে এই 'তৃণখণ্ড'। এ যেন বনফুলের নিজের জীবনেরই একটা প্রতিবিম্ব মাত্র। তাঁর পরবর্তী বই 'বৈতরণীর তীরে'। এই বইয়ের উৎসর্গপত্রে বলা হয়েছে, ''ইহা শুধু তৃণের মত নহে—বর্তমানেরও নহে এবং খুব সম্ভব ভবিষ্যতেরও।'' এই বইতে একজন অনিচ্ছুক ডাক্তারের কথা বলা হয়েছে। এখানেও সেই ডাক্তার। তিনি অপ্রকৃতিস্থ মনস্তত্ত্বে কয়েকটি অসম্পূর্ণ ছবির রেখাচিত্র এবং সেই সাথে ফুটে উঠেছে কয়েকটি জীবনের তথা তুলির ও উদ্বেগ রূপ। এই বই পড়ে রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে লেখেন, ''এর মধ্যে বীভৎস রস ও করুণ রসের যে মিশ্রণ ঘটিয়েছ তাতে তোমার সাহস এবং নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে রচনার অপূর্বতা আছে।''

''কিছুক্ষণ'' বইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''ইস্টেট-পড়া জোগানটি যে আসলের জমা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে তার মধ্যে থেকে তুমি দ্রুতই ধন আদায় করে নিয়েছ।''

বনফুল একশো তেত্রিশেরও বেশি বই লিখেছেন। ডানা, বাঁশ, উদয়াস্ত, স্থাবর জঙ্গম, ভুবনসোম, হাটে বাজারে, অগ্নীশ্বর, দ্বৈরথ, জঙ্গম, সুখদুঃখ, চতুর্দশী, মৃগয়া, মানদণ্ড, পঞ্চপর্ব ও অন্যান্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বহু রচনার চিত্ররূপ হয়েছে। তাঁর লেখা শেষ উপন্যাস 'হরিশ্চন্দ্র'। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত তাঁর উপন্যাস প্রকাশ করে। বনফুল ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর লেখা নাটকের মধ্যে শ্রীমধুসূদন ও বিদ্যাসাগর নাটক দুটি বাংলা রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কবিতা রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

প্রাক্তনীদের দুই হাতে যে লেখনী বনফুল তুলে নিয়েছিলেন পূর্ণ মর্যাদায় প্রথমবয়সেও সে লেখনীকে বনফুল নিজের হাতে বিশ্রাম দেননি। তাঁর নিরীক্ষাধর্মী 'পশ্চিমতট' এক অসাধারণ লেখনাক্ষর। শুধু কলম নয় তুলিতেও বনফুল পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর মনোজগতের কল্পনাকে নানান রঙে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরই আঁকা অসংখ্য ছবিতে।

বাংলার বাইরে জীবনের শ্রেষ্ঠ এবং দীর্ঘতম অংশ কাটিয়ে যে ব্যক্তি বাংলা সাহিত্যের সকল ধারাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তিনি বনফুল। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সাহিত্যিক সাগরময় ঘোষ বলেছেন, ''বাংলার বাইরের কোনও বাঙালি যদি কথাসাহিত্যে বহির্বঙ্গকে এনে থাকেন, তবে প্রথম নামটি বনফুল। শরৎচন্দ্রের রচনায় তুলনায় বাংলার বাইরের প্রসঙ্গ অল্পই। আর সতীনাথ ভাদুড়ী এসেছেন অনেক পরে। কিন্তু বনফুল প্রথমে সেই রাজপথটি তৈরি করে দিয়েছিলেন বললেই হয়!''

বনফুলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের অবসান ঘটল।

[লেখাটি ১০ ফেব্রুয়ারি '৭৯ তারিখে বনফুলের মৃত্যুর পরে যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল]

বনফুল পরিচিতি

রঞ্জনকুমার দাস

জন্ম: ৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৬ (১৯ শে জুলাই ১৮৯৯)/মঙ্গলবার / বিহারের মনিহারি গ্রামে।

আদি নিবাস: হুগলী জেলার শিয়াখালা গ্রামে।

পিতা: ডাঃ সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়।

মাতা: মৃণালিনী দেবী।

পত্নী: লীলাবতী দেবী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট)।

পুত্র কন্যা: কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী: শান্তি কুমার, কন্যা: [illegible])। ডাঃ অসীম কুমার (প্যাথলজিস্ট) (স্ত্রী: মাধবী, কন্যা: [illegible], পুত্র: সমুদ্র)। চিরঞ্জন (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার) (স্ত্রী: ডঃ [illegible], কন্যা: [illegible])। করবী (স্বামী: অরুণ কুমার, কন্যা: মাধবী, [illegible])।

কর্মস্থল: ভাগলপুর। বাস: ভাগলপুরে 'গোলাপবাগ' নামে বাড়িতে। শেষ দশ বছর কলিকাতার লেক টাউনে।

শখ: ছেলেবেলায় কুকুর, বেড়াল, খরগোশ, পাখি ইত্যাদি পোষা, বাগান করা—বিশেষ করে গোলাপ ফুলের বাগান ও টবে গোলাপ চর্চা। বার্ড ওয়াচিং, নক্ষত্র চর্চা, ছবি আঁকা এবং দেশি বিদেশি বই কেনা ও নিয়মিত পাঠ।

উপাধি ও সম্মান লাভ: রবীন্দ্র পুরস্কার (হাটে-বাজারে উপন্যাসের জন্য)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, শরৎচন্দ্র-স্বর্ণপদক, কুমার বিশ্বনাথ রায়-স্মৃতি-স্বর্ণপদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র ও ডি এল রায় লেকচারার। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার: সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্তি। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' সম্মান লাভ। ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি-লিট' উপাধি প্রাপ্তি। তাছাড়া বহু সাহিত্য সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও মানপত্র প্রদান।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

শিশুকালে বাড়ির মুসলমান মক্তব ভ্রমণে শ্রীম ক্রমান্বয়ে বর্ণমালা লাভ। মনিহারিতে মাইনর স্কুলে বৃত্তি পেয়ে পাশ করে ১৯১৪ সালে সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে হাইস্কুলে ভর্তি। সেখানে বিন্দু বোর্ডিং এ বাস।

সাহেবগঞ্জ বোর্ডিং এ বাল্যকালীন কবিতা চর্চা ও 'বিকাশ' নামে হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ। হস্ত-লিখিত পত্রিকা বোর্ডারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ পরে সুধাংশুশেখর মজুমদার (ঘুঁটু)-র প্রচেষ্টায় কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশ। কবিতা প্রকাশে স্কুলের হেড পণ্ডিত জানতে পেলে রোষ এবং তাঁর ভয়ে 'বনফুল' ছদ্মনাম গ্রহণ। 'বনফুল' ছদ্ম নামে জোতিরিন্দ্রের 'ভারতী' পত্রিকা এবং 'ভারতী' পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ। পরে ওই পত্রিকা সম্পাদকের উৎসাহে সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ চর্চা এবং তার সাইনের একটি অনুবাদ কবিতা 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশ (১৯১৮ সাল)। সেখা গুরুর অধীনে কিছু দিন গোড়া লেখা। বিশ্বভারতী ও মাতৃভাষায় আশ্রয়।

১৯১৮ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস। হাজারিবাগের সেন্ট কলোম্বাস কলেজে ভর্তি। সেখানে 'শর'র বিষয়ে কবিতা লিখে কলেজে সম্মান লাভ। সহপাঠী সাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয়। কলেজে 'সাজাহান' অভিনয়ে 'দারা'-র ভূমিকায় অভিনয়। কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক জ্ঞানবাবুর 'মানুষের অতীত' বিষয়ে বক্তৃতা শুনে 'জঙ্গম' উপন্যাস লেখার কল্পনা। বটানি পরীক্ষককালে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ। মহেশ অধুনা উপলক্ষে কলিকাতায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পরিচয়।

আই-এস-সি পাসের পর কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি (১৯২০)। প্রখ্যাত অভিনেতা শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে পরিচয়। 'প্রবাসী' অফিসে 'শনিবারের চিঠি'-র সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে পরিচয়। নিয়মিত কবিতা ও গল্প লেখা ও নানা পত্রিকায় প্রকাশ। ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসা এবং তাঁর নির্দেশে তাঁর লাইব্রেরিতে ইতিহাস পাঠ। বিনয় বসুমল্লিকের সঙ্গে পরিচয়। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত কালক্রমে 'জঙ্গম' উপন্যাসে 'ভন্টু' চরিত্র অঙ্কন। অবসর মতো প্রতিদিন বসে মাসিক পত্রিকা পাঠ। এর মধ্যে মিনিটে প্রতি দুলালীন নামের হবি-র নির্বাক ছায়াছবি দেখার আগ্রহ। বিদেশী লেখার নেশা।

বিহারের অধিবাসী হওয়ায় নতুন নিয়ম অনুসারে ষষ্ঠ বর্ষে পাটনা প্রিন্স অফ ওয়েলস মেডিক্যাল কলেজে ছাত্ররূপে যোগদান। সেখানে Maternity ward না থাকায় গাইনোকোলজি বিভাগের হাসপাতালে শিক্ষা গ্রহণ। সেখানে তাঁর প্রতি তরুণী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নার্সের অনুরাগ। নার্সটির অনুরোধে ইংরেজিতে কবিতা রচনা। বনফুল কর্তৃক নার্সটির প্রেম প্রত্যাখ্যানে সে দেশের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করে বনফুলকে সকরুণ চিঠি প্রেরণ।

বর্ধমান অ্যাডভোকেট গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, কলিকাতার বেথুন কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী লীলাবতীর সঙ্গে বিবাহ। তারিখ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪।

পরে এম বি বি এস পরীক্ষায় পাস।

পরিবারের সুবিধার জন্য General Physician না হয়ে ডাঃ চারুব্রত রায়ের অধীনে প্যাথলজিতে ট্রেনিং। আজিমগঞ্জ হাসপাতালে ৮০ টাকা বেতনে মেডিক্যাল অফিসারের চাকরি (১৯২৮)। আজিমগঞ্জে স্ত্রী লীলাবতীকে নিয়ে সংসার। কথার

ভাগলপুরে মিশনারি Maternity হাসপাতালে প্রথম সন্তান কেতার জন্ম।

পরে মণিহারির কাছে ভাগলপুরে ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি 'The Seco Bacto Clinic' স্থাপন ও প্র্যাকটিস শুরু। জ্যেষ্ঠপুত্র জন্ম, দ্বিতীয় সন্তান অসীমের জন্ম। ক্লিনিকে দুটি যেকেন বিভাগ, পরে তার ছেলে সীমান্তিকে নিয়ে। ল্যাবরেটরিতে তার হাতে তৈরি মা-পসা এবং সুন্দর মডেল দেখানো শার্টিফিকেট। ভাগলপুর ইনস্টিটিউটে নিবন্ধিত পুস্তক পাঠ। এই সময়ে বিহারে বিধ্বংসী ভূমিকম্প।

শনিবারের চিঠির উৎকর্ষীয় সম্পাদক সজনীকান্ত সোস্বামীর তাগিদে নিয়মিত ব্যঙ্গ কবিতা রচনা। কবিতা ও প্রবন্ধের উদ্যোগে প্রথম উপন্যাস 'তৃণ খণ্ড' প্রকাশ। সম্পাদক সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দাদামশাই)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁরই নির্দেশে ব্রজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 'গল্প সংগ্রহ' প্রকাশ। ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ। বহু বিখ্যাত উপন্যাস রচনা। হঠাৎ সজনীকান্তর পরিবারের সঙ্গে মণিহারিতে উত্তর ভারত ভ্রমণের ব্যবস্থা। 'দ্বৈরথ' উপন্যাসটি মাকে উৎসর্গ করা ও অগ্রিম হিসাবে ১০০ টাকা পাওয়ায় মাকে দিতে গেলে মায়ের আপত্তি এবং সে কারণে মায়ের পুরী দর্শনের ব্যবস্থা।

এই সময় 'বনফুল রচনা' নামে বহু রচনা এবং নানা পুস্তকাদি প্রকাশ। 'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর' নাটক রচনা। তবে এ ধরনের আরও নাটক রচনা হওয়ায় সে প্রচেষ্টা ত্যাগ। রাজনীতিতে যোগ না দিয়েও স্বাধীনতায় আগ্রহ। সুভাষচন্দ্রের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। অনেক স্বদেশী বিপ্লবী যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ। 'অগ্নি' উপন্যাসে ইংরেজের অত্যাচার কাহিনী 'রাত্রি', 'বিদ্যাসাগর', 'আত্মকথা' বইগুলি দেশের যুবকদের উদ্দেশে রচিত।

সজনীকান্ত দাসের প্রচেষ্টায় ভাগলপুরে 'খোলঘুটি' বাড়ি ক্রয়।

মণিহারিতে মায়ের মৃত্যু।

সুরেশ মজুমদারের অনুরোধে আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যার জন্য 'মানদণ্ড' উপন্যাস রচনা। দক্ষিণা স্বরূপ ১,০০০ টাকার জায়গায় ৭০০ টাকা প্রাপ্তি ও প্রতিশ্রুতি মতো সুরেশ মজুমদারের নিজের থেকে ৩০০ টাকা দেওয়া। কারণ এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের জন্যও সর্বোচ্চ দক্ষিণা ধার্য ছিল ৭০০ টাকা।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শোকসভায় 'হে মহা পথিক হে মহাপ্রাণ' স্বরচিত কবিতা পাঠ। এই সময়ে তেলেঙ্গানার রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তিতে 'ত্রিবর্ণ' উপন্যাসের পরিকল্পনা।

জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহের পর শান্তিনিকেতনে প্রাইভেটে বি. এ পরীক্ষায় পাস। ভাগলপুরে ও সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষিত হয়ে থাকা সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অবিচ্ছেদ্য।

মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় পক্ষিতত্ত্ববিদ সত্যচরণ লাহার কাছে পক্ষী চর্চা শিক্ষা এবং পরে ইংল্যান্ড থেকে বড় অধিকার প্রাপ্ত ডাক্তার সেনগুপ্তের কাছে কার্যকরী শিক্ষা। পরে এই বিষয়ে 'ডানা' উপন্যাস রচনা।

কলকাতায় বড় মেয়ে কেতার বিবাহ। এই বছরই বিহারে বড়ছেলেকে ডাক্তারিতে অ্যাডমিশন পেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাস, তবে বাঙালি হওয়ায় স্কলারশিপ না পাওয়া। তাই কলকাতায় ডাক্তারের প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি। পরে ছোট ছেলে কিরণের ম্যাট্রিক পাস ও প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি। একই সময়ে অসীমের কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি। ও কিরণের শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি। সাহিত্যিক মনোজ বসু ও শচীন মুখোপাধ্যায়ের যৌথ আগ্রহে বেঙ্গল পাবলিশার্স কর্তৃক দুই ছেলের পড়ার খরচ জোগান এবং সে কারণে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য নানা বই লেখা।

সেই সময় সিনেমায় 'মন্ত্রমুগ্ধ' ও বিদেশের প্রশংসা এবং পারিবারিক অন্তর দিয়ে ইন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণের অসমর্থ হীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহায়তা ভাগলপুরে তাঁকে দেখানো।

৪০সালের জীবিতকালীন নিমিত্তে সাহিত্য-আকাদেমিতে সদস্যপদে যোগদান এবং তাঁদের পুরস্কার নির্বাচনের ব্যবস্থা মনঃপূত না হওয়ায় সদস্যপদ ত্যাগ।

অসমর্থ ভ্রাতু পিতাকে নিয়ে স্মৃতিকথা লেখানো এবং সেই ভিত্তিতে 'উদয়-অস্ত' উপন্যাস রচনা।

ডি এম লাইব্রেরির গোপালদাস মজুমদার কর্তৃক বনফুলের জন্য নতুন অস্টিন গাড়ি ক্রয় এবং সেই ঋণ শোধের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের অনেক বই লেখা।

ভাগলপুরে তাঁর বাড়িতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সাহিত্যিকের আগমন, তাঁদের ঘনিষ্ঠ আলাপনে ও নানারকম কৌতুককর ঘটনা।

সপরিবারে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ।

মণিহারিতে পিতার মৃত্যু—ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪।

ছোট মেয়ের বিবাহের পর ভাগলপুরের বাড়ি বিক্রয়। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে ভাগলপুর ত্যাগ।

কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে কুমারেশ ঘোষের বাড়ির কাছেই এক বছর একটি ভাড়া বাড়িতে বাস এবং পরে লেক টাউনে বাড়ি ক্রয়।

কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সভাপতির পদ এবং পানিহাটির বঙ্গীয় সাহিত্য তীর্থ-র তীর্থপতি পদ গ্রহণ। কলকাতার বাসকালীন বহু রকমের পুস্তক রচনা, বিজ্ঞাপন এবং প্রতিদিন দিনলিপি 'মর্জি মহল' লেখা (১৯৭১-১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত।)

স্ত্রী লীলাবতীর মৃত্যু ২৭ জুলাই ১৯৭৬ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। লেক টাউন বাসভবনে।

বনফুলের মৃত্যু ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ শুক্রবার বেলা ৪টেয়। ৮০ বছর বয়সে। লেকটাউন বাসভবনে।

বনফুলের গ্রন্থপঞ্জী ও বিভিন্ন কাহিনীর চলচ্চিত্র রূপায়ণ পঞ্জী

মিত্রা মুখোপাধ্যায়

(বনফুলের গ্রন্থ ও কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ তালিকা প্রকাশ কাল অনুযায়ী পরপর সাজানো হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জীতে প্রথমে গ্রন্থের নাম, প্রকাশক, প্রকাশ কাল, গ্রন্থ পরিচয়, মূল্য এবং চলচ্চিত্রায়ণ তালিকার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের নাম, পরিচালক, মুক্তির বছর, প্রযোজক এবং অভিনেতাদের নাম পরপর দেওয়া হয়েছে।)

গ্রন্থপঞ্জী

বনফুলের কবিতা॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৬। কবিতা সংকলন। মূল্য: ৫.০০।

তৃণখণ্ড॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৫। উপন্যাস। মূল্য: ১.০০।

বৈতরণী তীরে॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৩৬। উপন্যাস। মূল্য: ১.২৫

বনফুলের গল্প॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৩৬। গল্প সংকলন।

দ্বৈরথ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৩৭। উপন্যাস। মূল্য: ৩.০০।

কিছুক্ষণ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৭। উপন্যাস। মূল্য: ১.৫০।

বনফুলের আরও গল্প॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৩৮। গল্প সংকলন। মূল্য: ১.৫০ টাকা।

মন্ত্রমুগ্ধ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৩৮। নাটক। মূল্য: ২.০০।

রূপান্তর॥ মিত্র ও ঘোষ, ১৯৩৮। নাটক। মূল্য: ২.০০।

শ্রীমধুসূদন॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৩৯। নাটক। মূল্য: ১.৭৫ টাকা।

অঙ্গারপর্ণী॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৪০। কবিতা সংকলন। মূল্য: ১.৮০।

চতুর্দশী॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৪০। কবিতা সংকলন।

মৃগয়া॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪০। উপন্যাস। মূল্য: ২.০০।

নির্মোক॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৪০। উপন্যাস। মূল্য: ৩.৫০।

রাত্রি॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪১। উপন্যাস। মূল্য: ৩.০০।

বিদ্যাসাগর॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৪১। নাটক। মূল্য: ২.৫০।

ভূয়োদর্শন॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪২। প্রবন্ধ সংকলন। মূল্য: ৩.০০।

সে ও আমি॥ বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৩। উপন্যাস। মূল্য: ৩.০০।

আহবনীয়॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৪৩। কবিতা সংকলন।

বাহুল্য॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৪৩। গল্প সংকলন। মূল্য: ২.০০।

মধ্যবিত্ত॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৪৩। নাটক। মূল্য: ০.৭৫।

জঙ্গম (১ম খণ্ড)॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৪৩। উপন্যাস।

বিন্দু বিসর্গ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৪। গল্প সংকলন। মূল্য: ২.৫০।

[illegible]॥ বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৪। প্রবন্ধ সংকলন। মূল্য: ২.৭৫।

জঙ্গম (২য় খণ্ড)॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৪৫। উপন্যাস।

মূল্য: ৩.০০

জঙ্গম (৩য় খণ্ড)॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৪৫। নাটক।

কঞ্চি॥ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৫। নাটক। মূল্য: ১.০০।

সপ্তর্ষি॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৫। উপন্যাস। মূল্য: ৩.৫০।

অগ্নি॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৬। উপন্যাস। মূল্য: ২.০০।

নঞ তৎপুরুষ॥ বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৬। উপন্যাস। মূল্য: ৫.০০।

সিনেমার গল্প॥ মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৬। নাটক। মূল্য: ১.৭৫।

স্বপ্ন সম্ভব॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৬। উপন্যাস। মূল্য: ৩.০০।

অনুগামিনী॥ মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৬। গল্প সংকলন। মূল্য: ২.০০।

আরও কয়েকটি॥ বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৭। গল্প সংকলন।

[illegible]॥ বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৮। নাটক। মূল্য: ২.৫০।

ডানা (১ম খণ্ড) ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৪৮। উপন্যাস। মূল্য: ৪.০০।

মানদণ্ড ॥ বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৮। উপন্যাস। মূল্য: ৪.৫০।

স্বপ্নসম্ভব ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৯। উপন্যাস। মূল্য: ৪.৫০।

করকমলেষু ॥ বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, কবিতা সংকলন। মূল্য: ৫.০০।

নবদিগন্ত ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৪৯। উপন্যাস। মূল্য: ৩.৫০।

ডানা (২য় খণ্ড) ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৫০। উপন্যাস। মূল্য: ৪.০০।

কষ্টিপাথর ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৫১। উপন্যাস। মূল্য: ২.৫০।

স্থাবর ॥ বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, ১৯৫১। উপন্যাস। মূল্য: ৭.০০।

নদী ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৫২-। গল্প সংকলন।

উত্তর ॥ বিহার সাহিত্য ভবন, ১৯৫৩। প্রবন্ধ সংকলন। মূল্য: ১.৭৫।

লক্ষ্মীর আগমন ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৫৩। উপন্যাস। মূল্য: ৫.০০।

বহুবর্ণ ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৫৪। গল্প সংকলন।

পিতামহ ॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৫৪। উপন্যাস। মূল্য: ৯.০০।

বিষম জ্বর ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৫৪। উপন্যাস। মূল্য: ১.২৫।

পঞ্চপর্ব ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৫৪। উপন্যাস। মূল্য: ৫.০০।

ডানা (৩য় খণ্ড) ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৫৫। উপন্যাস।

[illegible] ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৫। প্রবন্ধ সংকলন। মূল্য: ৩.৭৫।

[illegible] ॥ শান্তি লাইব্রেরী, ১৯৫৫। গল্প সংকলন।

নিরঞ্জনা ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৫৫। উপন্যাস। মূল্য: ৫.০০।

রঙ্গনা ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং, ১৯৫৬। গল্প সংকলন। মূল্য: ২.৫০।

ভুবন সোম ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৫৭। উপন্যাস। মূল্য: ২.০০।

[illegible] ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৭। নাটক। মূল্য: ১.৭৫।

মহারাণী ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৫৮। উপন্যাস। মূল্য: ৩.৫০।

অনুগামিনী ॥ বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৮। গল্প সংকলন। মূল্য: ৩.০০।

বনফুলের আরো কবিতা ॥ বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৮। কবিতা সংকলন। মূল্য: ৬.৫০।

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ॥ অনুপম, ১৯৫৮। গল্প সংকলন। মূল্য: ২.০০।

[illegible] ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৮। গল্প সংকলন। মূল্য: ১.৭৫।

অগ্নীশ্বর ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৫৯। উপন্যাস। মূল্য: ৫.২৫।

জলতরঙ্গ ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৯। উপন্যাস। মূল্য: ৪.০০।

নূতন বাঁকে ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৯। কবিতা সংকলন। মূল্য: ২.৫০।

উদয় অস্ত (১ম খণ্ড) ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৫৯। উপন্যাস। মূল্য: ৮.৫০।

দুই পথিক ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬০। উপন্যাস। মূল্য: ২.৫০।

ওরা সব পারে ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬০। উপন্যাস। মূল্য: ২.৫০।

সপ্তমী ॥ মিত্র-ঘোষ, ১৯৬০। গল্প সংকলন। মূল্য: ৫.০০।

হাটে বাজারে ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬১। উপন্যাস। মূল্য: ২.৫০।

দূরবীন ॥ [illegible] সাহিত্য, ১৯৬১। গল্প সংকলন। মূল্য: ৪.০০।

ছোটদের ভালো ভালো গল্প ॥ শ্রীপ্রকাশ ভবন, ১৯৬১। গল্প সংকলন। মূল্য: ২.০০।

[illegible] ও আরো কয়েকটি ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬২। প্রবন্ধ সংকলন। মূল্য: ৩.০০।

বনফুলের গল্প সংগ্রহ (১ম শতক) ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬২। গল্প সংকলন। মূল্য: ৮.৫০।

কন্যাসু ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬২। উপন্যাস। মূল্য: ২.৫০।

সীমারেখা ॥ [illegible] বুক হাউস, ১৯৬২। উপন্যাস। মূল্য: ২.৭৫।

মনন ॥ বেঙ্গল এজেন্সী, ১৯৬২। প্রবন্ধ সংকলন।

মণিহারী ॥ গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৬৩। গল্প সংকলন। মূল্য: ৫.০০।

পীতাম্বরের পুনর্জন্ম ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৩। মূল্য: ৩.০০।

[illegible] ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৩। নাটক। মূল্য: ১.৭৫।

ত্রিবর্ণ ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৩। উপন্যাস। মূল্য: ১৪.০০।

বর্ণচোরা ॥ এম সি সরকার, ১৯৬৪। উপন্যাস। মূল্য: ৯.০০।

পক্ষীমিথুন ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৪। উপন্যাস। মূল্য: ৪.০০।

[illegible] ॥ গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৬৫। গল্প সংকলন। মূল্য: ৪.০০।

বনফুলের গল্প সংগ্রহ (২য় শতক) ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৫। গল্প সংকলন। মূল্য: ৮.০০।

গন্ধরাজ ॥ [illegible], ১৯৬৬। উপন্যাস। মূল্য: ৮.০০।

মানসপুর ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৬৬। মূল্য: ৬.০০।

তীর্থের কাক ॥ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৬। মূল্য: ৬.০০।

এক ঝাঁক খঞ্জন॥ বাক্ সাহিত্য, ১৩৬৭। গল্প সংকলন। মূল্য: ৬.৫০।
প্রচ্ছন্ন মহিমা॥ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৩৬৭। উপন্যাস।
কিছু স্মৃতি॥ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৩৬৮। স্মৃতিকথা। মূল্য: ৪.২৫।
অধিকলাল॥ বাক্ সাহিত্য, ১৩৬৯। উপন্যাস।
[illegible]॥ [illegible] পাবলিশার্স, ১৩৬৯। উপন্যাস।
গোপালদেবের স্বপ্ন॥ উপন্যাস, ১৩৬৮।
বিন্দুবিসর্গ॥ ১৩৬৭। প্রবন্ধ সংকলন।
রূপকথা ও তারপর॥ ১৩৭০। উপন্যাস।
রৌরব॥ [illegible] পাবলিশার্স, ১৩৭০। উপন্যাস। মূল্য: ৪.০০।
নব-দিগন্ত॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৭০। উপন্যাস। মূল্য: ৫.০০।
[illegible]॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৭০। কবিতা সংকলন। মূল্য: ১২.৭৫।
তুমি॥ করুণা প্রকাশনী, ১৩৭২। উপন্যাস। মূল্য: ৩.০০।
সন্ধিপূজা॥ প্রকাশ ভবন, ১৩৭২। উপন্যাস। মূল্য: ৬.০০।
এরাও আছে॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৭২। উপন্যাস। মূল্য: ৪.৫০।
কৃষ্ণপক্ষ॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৭৩। উপন্যাস।
[illegible]॥ ডি জি পাবলিশার্স, ১৩৭৩। নাটক। মূল্য: ৪.০০।
প্রথম গরল॥ বাক্ সাহিত্য, ১৩৭৪। উপন্যাস। মূল্য: ৮.০০।

উদয় অস্ত (২য় খণ্ড)॥ ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৭৪। উপন্যাস। মূল্য: ২২.০০।
নবীন দত্ত॥ মণ্ডল বুক হাউস, ১৩৭৪। উপন্যাস। মূল্য: ১০.০০।
ধূমাবতী॥ মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৪। উপন্যাস। মূল্য: ৭.৫০।
[illegible]॥ সাহিত্যম্, ১৩৭৫। গল্প সংকলন।
[illegible]॥ [illegible] প্রকাশ ভবন, ১৩৭৫। কিশোরপাঠ্য। মূল্য: ১৫.০০।
বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প॥ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৩৭৮। গল্প সংকলন। মূল্য: ৫০.০০।
[illegible]॥ গ্রন্থম, ১৩৭৬। রম্যরচনা। মূল্য: ৪.০০।
[illegible]॥ গ্রন্থালয়, ১৩৭৬। নাটক সংকলন। মূল্য: ৬.০০।
সাত সমুদ্র তেরো নদী॥ বাণীশিল্প, ১৩৭৬। উপন্যাস। মূল্য: ৭.৫০।
বনফুলের নতুন গল্প॥ বাণীশিল্প, ১৩৭৬। উপন্যাস। মূল্য: ১০.৫০।
[illegible]॥ বাণীশিল্প, ১৩৭৮। উপন্যাস। মূল্য: ১০.০০
অলংকারপুরী॥ নির্মল বুক এজেন্সী, ১৩৭৮। উপন্যাস।
ভাষণ॥ সাহিত্যলোক, ১৩৭৮। প্রবন্ধ সংকলন। মূল্য: ২০.০০।
পশ্চাৎপট॥ গ্রন্থালয়, ১৩৭৮। আত্মজীবনী। মূল্য: ১৮.০০।
মায়াকানন॥ নির্মল বুক এজেন্সি। গল্প সংকলন। মূল্য: ৩.৫০।
হরিশ্চন্দ্র॥ শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৯। উপন্যাস। মূল্য: ১৫.০০।

চলচ্চিত্রায়ণ পঞ্জী

মন্ত্রমুগ্ধ॥ বিমল রায়, ১৯৪৯। নিউ থিয়েটার্স। অভিনয়াংশে: মীরা সরকার, বিপিন বসু, রেবা বসু, কালী সরকার, তুলসী চক্রবর্তী প্রমুখ।
মানদণ্ড॥ রতন চট্টোপাধ্যায়, ১৯৫৩। বীরেন দত্ত। অভিনয়াংশে: মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, চন্দ্রা দেবী, ছবি বিশ্বাস প্রমুখ।
বৈতরণী॥ রতন চট্টোপাধ্যায়, ১৯৫৫। মিলন দত্ত। অভিনয়াংশে: বীরেশ্বর সেন, পাহাড়ী সান্যাল, মমতা সরকার প্রমুখ।
একটি রাত॥ চিত্ত বসু, ১৯৫৬। বঙ্কিম পিকচার্স। অভিনয়ে: উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন প্রমুখ। (মূল গ্রন্থ: [illegible])।
কিছুক্ষণ॥ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৯। এম পি প্রোডাকশনস। অভিনয়ে: অসীমকুমার, জাহ্নবী দেবী, দীপেন বসু, সোমা সেন, গঙ্গাপদ বসু, রবি ঘোষ প্রমুখ।
বর্ণচোরা॥ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৩। এম পি প্রোডাকশনস। অভিনয়ে: কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অনুপ মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা সান্যাল প্রমুখ। (মূল গ্রন্থ: [illegible])।
আলোর পিপাসা॥ তরুণ মজুমদার, ১৯৬৫। [illegible]। অভিনয়ে: সন্ধ্যা রায়, বসন্ত চৌধুরী, অনুপকুমার প্রমুখ।
অর্জুন পণ্ডিত॥ ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৫। [illegible]। মুখ্য ভূমিকায়: সঞ্জীব কুমার। (হিন্দি)।
হাটে বাজারে॥ তপন সিংহ, ১৯৬৭। নেপাল দত্ত। অভিনয়ে: অশোককুমার, বৈজয়ন্তীমালা, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভুবন সোম॥ মৃণাল সেন, ১৯৬৯। মৃণাল সেন। অভিনয়ে: উৎপল দত্ত, সুহাসিনী মুলে। (হিন্দি)।
অগ্নীশ্বর॥ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৫। [illegible]। অভিনয়ে: উত্তমকুমার, মাধবী মুখার্জী, অসিতকুমার, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, কাজল গুপ্ত, নন্দিনী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।
মন্ত্রমুগ্ধ॥ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৭। কে এস ফিল্মস। অভিনয়ে: উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, সোমা সেন প্রমুখ। (পুনর্নির্মাণ)।
পাকা দেখা॥ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ১৯৮০। রঞ্জিত মিত্র। অভিনয়ে: মহুয়া রায়চৌধুরী, উৎপল দত্ত, তরুণকুমার, রেবা ঘোষ, রবি ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, সোমা সেন প্রমুখ।
তিলোত্তমা॥ দীনেন গুপ্ত, ১৯৭৮। অজয় বসু। অভিনয়ে: রঞ্জিত মল্লিক, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত প্রমুখ।
[illegible]॥ [illegible] ঘোষ, ১৯৯৬। এন এফ ডি সি। অভিনয়ে: শাবানা আজমী, নীনা গুপ্তা, কুলভূষণ খারবান্দা, পরেশ রাওয়াল প্রমুখ। (হিন্দি) (মূল গল্প: [illegible])।
এছাড়া বনফুলের জীবনভিত্তিক 'অন্তরালে বনফুল' নামে একটি তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছিল। তথ্যচিত্রটি পরিচালনা করেছিলেন বিজন দাশগুপ্ত। প্রযোজক ছিলেন নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

রুচিশীল ও মনের মত বিভিন্ন স্বাদের বই পেতে হলে কলকাতা পৌরসংস্থার প্রকাশিত বই পড়ুন ও পড়ান

ছোটদের জন্য

আমাদের বিদ্যাসাগর

আমাদের সুভাষচন্দ্র

সাধারণের জন্য

মুক্তি সংগ্রাম ও কলকাতার পার্ক

C. V. Raman Birth Centenary Issue

Anthology Number 1924-1947

Netaji Birthday Com. Vol. Cent. eve-tribute

C. M. Gazette-Netaji Centenary Issue

Mayors of Calcutta

Calcutta-a Glimpse

Calcutta-a set of Pictures

Calcutta at a Glance

C. M. C. Year Book	২৫.০০
Compendium on Assessment & Collection	২০০.০০
Building Permit Manual	২০০.০০

কলকাতা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে পুরতথ্যসমৃদ্ধ পুরশ্রী নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

উল্লিখিত বইগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং
রেকর্ড বিভাগের কাউন্টারে সারা বছর পাবেন।
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
১, হগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০ ০৮৭

সামান্য কিছু সতর্কতা

ম্যালেরিয়া

তাড়াতে পারে

- জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করান ও পুরোমাত্রায় ওষুধ খান
- ম্যালেরিয়ার মশা কেবল পরিষ্কার জলে জন্মায়—খোলা চৌবাচ্চা, হাঁড়ি-কলসি বা ড্রামে ধরা জল সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন পরিষ্কার করুন
- বর্ষার জল বাড়ির ছাদে বা আনাচে-কানাচে জমতে দেবেন না
- জলের ট্যাঙ্ক ঢেকে রাখুন যাতে মশা ঢুকতে না পারে
- শোয়ার সময় অবশ্যই মশারি টাঙান

॥ ম্যালেরিয়া জীবন নেয় সাবধানের মার নেই॥

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসভা

কলকাতা পুরশ্রী

জীবনানন্দ সংখ্যা

নাগরিক পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে বকেয়া কর অবিলম্বে মিটিয়ে দিন

জলই জীবন—এর অপচয় রোধে সক্রিয় সহযোগিতা করুন

আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক সময়ে ফেলুন

কলকাতা আমার—আপনার। এর ঐতিহ্য বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের সবারই

কলিকাতা পৌরসংস্থা

কলকাতা

পুরশ্রী

[illegible] সংখ্যা | ২২ বর্ষ | ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

জীবনানন্দ সংখ্যা

বিষয়সূচি

[illegible]

শতবর্ষের কবি জীবনানন্দ ● [illegible]

[illegible] ● সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

জীবনানন্দ [illegible] ● প্রভাতকুমার দাস

[illegible]

● সৈয়দ হাসমত জালাল

[illegible] ● [illegible]কুমার [illegible]

[illegible] ● [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] ● [illegible] ঘোষ

[illegible] ● [illegible] চক্রবর্তী [illegible]

[illegible] ● [illegible] চক্রবর্তী

[illegible] ● [illegible] চক্রবর্তী [illegible]

[illegible] ● প্রভাতকুমার দাস

প্রচ্ছদ : শিবশংকর ভট্টাচার্য

সহ সম্পাদক : প্রসাদ সেনগুপ্ত

সহযোগী : অরুণকুমার রায় ও সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য : ৮ টাকা

সম্পাদক : অমলেন্দু ভট্টাচার্য

[illegible]

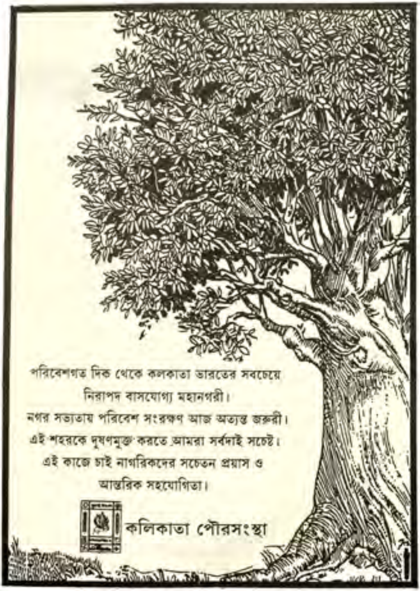
পরিবেশগত দিক থেকে কলকাতা ভারতের সবচেয়ে
নিরাপদ বাসযোগ্য মহানগরী।
নগর সভ্যতায় পরিবেশ সংরক্ষণ আজ অত্যন্ত জরুরী।
এই শহরকে দূষণমুক্ত করতে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট।
এই কাজে চাই নাগরিকদের সচেতন প্রয়াস ও
আন্তরিক সহযোগিতা।
কলিকাতা পৌরসংস্থা

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথ নজরুলের পর কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার অতি প্রিয় কবি। যত দিন যাচ্ছে তত তিনি নতুনভাবে আবিষ্কৃত হচ্ছেন। বাংলার রূপ-রস-গন্ধ-মাটি ভালবেসে কবি বাংলার প্রকৃতিপ্রেমে নিমগ্ন হয়েছিলেন। সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে মানুষের প্রকৃতিলগ্নতা, ইতিহাসবোধ, মানুষী ভাবনা-চিন্তা কবির কাব্যে এক আশ্চর্য জীবনবোধ গড়ে তুলেছে। আবহমানকালের হাজার বছর ধরে চলে আসা মানুষের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। আম, জাম, হিজল গাছের ছাওয়ায়, বক-চিল-শালিখের ভিড়ে, রাতের আকাশের নক্ষত্রমালায়, ধানসিঁড়ি-জলঙ্গী-পদ্মার ঢেউ-এ আমরা চিরকালই তাঁকে অনুভব করব।

কবির শতবর্ষে তাই আমাদের পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর মূল্যায়নের ক্ষুদ্র প্রয়াস এই বিশেষ সংখ্যা। কবির বৈচিত্র্যময় জীবনের নানা দিককে স্পর্শ করার চেষ্টা করা হল কয়েকটি প্রবন্ধে। এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই 'বিভাব' পত্রিকা গোষ্ঠীকে।।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বাঁচো না!

[illegible] বাঁচো না!

[illegible] বলিতে পারে!

[illegible]

[illegible]

কে বলিতে পারে আজ! — [illegible]

কে বলিতে পারে আর? — [illegible]

কে বুঝিতে চাহে আর! — [illegible]

[illegible] বলিতে পারে [illegible]!

[illegible]

[illegible]! — [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সময়গ্রন্থির কবি জীবনানন্দ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র বেশিরভাগ কবিতায় ফুলের প্রসঙ্গ প্রায় অনুপস্থিত। ইয়েটস্ যে অর্থে ফরাসি ওয়েলেসলিকে বলেছিলেন, Why can't you English poets keep flowers out of your poetry?—কবি জীবনানন্দের এই ফুল-বিমুখতার সঙ্গে সে অর্থের কোনও সম্পর্ক নেই। এই অনুপস্থিতি একটা তাৎপর্যপূর্ণ সত্য। আমরা যখন রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ দত্তদের সৌরভময় এবং পুষ্পভারের পরিমণ্ডল পেরিয়ে সেই ধূসর প্রান্তরে প্রথম প্রবেশ করলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। যে সন্ধ্যায় মনে হয়, পৃথিবীর কপালের সূর্যের ক্ষত, এ সন্ধ্যা সে সন্ধ্যা নয়। এ হেমন্তের সন্ধ্যায় যেন কোনও দুটি অন্ধকারের কাঠে পাওয়া গেল। তাই ধূসর পাণ্ডুলিপিতে কবিতার ধরিত্রী স্বাভাবিকভাবে ফুলের বাগান ফোটেনি বললেই হয়। ফলিত এক ভাবটি পার্থিব ফুলের বিমুক্তিকে যেন শুধুই মানা প্রকাশি। নতুন ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে ফুল নেই। ফুল নেই সে সন্ধ্যায়—সে আত্মবিশ্ব অন্ধকারকে মৃত হেমন্তের ফুলের মতো বিবর্ণ নক্ষত্রেরা ফুটে উঠেছে। জীবনানন্দের সমগ্র কবিজীবনে আগাগোড়াই জীবনানন্দ শুধু হেমন্তের কবি নন—হেমন্ত সন্ধ্যার কবি। কেবলমাত্র হেমন্তের অনুষঙ্গ, অন্তত যতদূরে নিছকই বিষণ্ণতাবাচক নয়। হেমন্তের অনুষঙ্গে কখন যেমন আমাদের আনন্দই বাঙালী কৃষকের মনে জাগিত। কিন্তু হেমন্ত সন্ধ্যার বিষণ্ণতাকে জীবনানন্দ অন্যতর অর্থে নিযুক্ত করতে পেরেছেন। বিশ্বব্যাপী যে প্রাণ বাঙালি যুবকেরও উত্তাপ ও উৎসাহকে ঘুচিয়ে দিয়েছিল জীবনানন্দের হেমন্ত-সন্ধ্যা ক্রমাগত সেই বিষণ্ণতার প্রতীক। আর বর্তমানের অর্থে ধূসর পাণ্ডুলিপিতে ক্রমশই একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে জীবনানন্দ মানুষের বিপন্ন সৌন্দর্যবোধের কবি। আক্ষরিকভাবে মানুষের প্রতীককে যদি বেশি গুরুত্ব দেওয়া যায় তাহলে আমাদের বিপন্ন সৌন্দর্যবোধের প্রসঙ্গটি বাংলায় কথা হবে সম্ভবত জীবনের উপপ্রান্তের কথা ওঠে। কিন্তু এ সৌন্দর্যবোধের বিপন্নতার ইতিহাস আছে। হয়তো তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে রোমান্টিকতার ভাবপ্রবণতার শেষ; জড়িয়ে আছে বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ব্যক্তির আত্মস্মৃতির অভিজ্ঞতা, জড়িয়ে আছে ক্রমবর্ধমান আত্মসংশয়ের ফলে সমগ্র ব্যক্তির আত্মস্মৃতির অভিজ্ঞতা, জড়িয়ে আছে ক্রমবর্ধমান আত্মসংশয়ের ফলে সমগ্র ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্যের চেতনা। হয়তো শেষ পর্যন্ত এই সবকিছুরই ফলে কবিচেতনার ভেতর এক উপলব্ধির সৃষ্টি প্রথম হয়েছে—বাংলাকাব্যের মন আজকে ছিন্নমূল হয়ে নয়। কবি জীবনানন্দের মধ্যে মানুষের সেই বিপন্ন সৌন্দর্যবোধের চেতনা নক্ষত্রের প্রতীকে রূপ খুঁজে নিয়েছে। 'যেদিন সরিয়া গেলে নিঃস্ব মৃত্যু আসবে', আর সায়ংকাল মানু চিত্রলেখাদিনী, ছল-ছোঁয়া-হাতে ঝিনুক-ঠাণ্ডা মেয়ে সেই চেতনারই ইঙ্গিত নিয়ে পথে দেখা দিয়েছে।

বিষণ্ণ হেমন্তের যে অন্ধকার ক্রমশ বাড়তে থাকে মানুষের এবং সভ্যতার প্রতিদিন নিরাশা-উদাসীনতার দ্বারা, সে-অন্ধকার, সন্দেহ-বাহিত আত্মসংশয়ের যে ঘূর্ণাবর্ত কিছু, তার বিস্তারের কোনও অন্ত নেই। এ অন্ধকারে নক্ষত্রই একমাত্র আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের সূর্যের আলোয় যে আলোক সৌন্দর্যচেতনা শতধা প্রকাশের পথে বিকীর্ণ হয়েছে, আলোছায়ার বিচিত্র আলপনা এঁকেছে, জীবনানন্দীয় জগতে সে প্রভাব নেই—থাকার কথাও না। অন্ধকার সেখানে সর্বব্যাপী, দূরাগত কম্পমান নক্ষত্রটুকুই সেখানে সম্বল। তখন আমরা কেউ কেউ জেনেছি যে সূর্যের আলোকে সেখানে জীবনের প্রাণ পাই সত্য নয় নক্ষত্রের আলোকেই সেই অন্ধকারকে যথাসম্ভব এড়াতে হবে। এই নক্ষত্র প্রেমের প্রতীক, এই নক্ষত্র শান্ত জীবনের প্রতীক, এই নক্ষত্র ক্লান্ত মানুষের সন্ধ্যার নিজের কাছে (নীড়ে) ফিরে আসার প্রতীক

বুদ্ধদেব বসুর 'আধুনিক-র এই তন্দ্রাময় নক্ষত্রকে দেখলে একথা মনে না হয়ে পারে না যে জীবনানন্দ যতটা নূতন চেতনার উদ্বোধক কবি, তার চেয়ে তিনি অনেক বেশি পুরাতন চেতনার বিস্তারক কবি। বৌদ্ধদের মতোই মানুষের সংস্কারের বিস্তারকে জীবনানন্দ উপলব্ধি করেছেন। তাঁর শব্দচিত্র-রচনায় জীবনের অনুভবে স্মৃতি দুঃখ, কিন্তু দুঃখ।

(১) বাতাসে 'ঝিঁঝিঁর গন্ধ...বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে;

(২) চারিদিকে দেখিয়াছি যেমনমুখরে,
অন্ধকারে ব'সে আমি দেখিয়াছি যেমনমুখরে,
চুপ ক'রে দেখিয়াছি যেমনমুখরে;

নীলাভ নোনার বুকে রস ঘন হয়ে আসে, অথবা 'যেমনমুখ' শব্দটির প্রয়োগ নিঃসন্দেহে সেই রূপ প্রকাশনে বুদ্ধদেব বসুর দেখেছেন শরীরিকতা। কিন্তু এ শরীরিকতাকে কোনও মতেই শব্দচিত্রগতভাবে বলা যাবে না। বরং একে বলা যাবে শব্দচিত্রের স্মৃতিসঞ্চরতা। উদ্ধৃত অংশ দুটিতে শব্দচিত্রগতভাবের প্রকাশ যতটা পরিস্ফুট তার চেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে শব্দচিত্রের আকুলতা। জীবনের অন্তরতম সত্যকে লেখে চায় যেখানে যে কাব্য স্মৃতি এক অস্পষ্ট আকুলতায় ভর দেয় এই আকুলতা সেই জাতীয়। এখানেও সন্ধ্যার স্মৃতি অনিবার্য আত্ম-প্রসঙ্গ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই সন্ধ্যার অন্তর্লোকেই ফুটে উঠেছে জীবনানন্দের নক্ষত্রেরা।

(ক) তুমি আর আমি
উঠো যেন ঝিনুকের মত বুকে থামি
সেইখানে ঝরে পড়ে
যেখানে সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝরে।

(খ) মানুষের অন্তরের অন্তরে—বুকের ভিতর
সমুদ্র ডাকিয়া যায়;—নক্ষত্রের সাথে কত কথা
যখন নক্ষত্র শুধু আকাশের অন্ধকার রাতে—
তখন হৃদয়ে জাগে নতুন সে এক কবিতার
তাই সাথে সেই উচ্চ আকাশেতে যাই যে অন্তরে
জোনাকির মেতে যেন, নক্ষত্রের মত ঝরে নক্ষত্রের সাথে।

(গ) জীবন পুড়িয়া যায়—আকাশের অন্ধ পুড়ে যাই
আকাশে নক্ষত্র হয়ে জ্বলিবার মত শক্তি—শুধু শক্তি চাই।

(ঘ) তোমার পায়ের 'পথ যেন ঝরে যাই'
আমার এ নক্ষত্রের মতো!

—আমি শুধু—তীর জলের মত পা তোমার চলে;—
প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের গানগুলিতে যে অন্ধকার এবং নক্ষত্রের ছবি ও প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে তার সাথে জীবনানন্দের নক্ষত্র প্রসঙ্গের অমিলটুকুও লক্ষণীয়।

তরুণ জীবনানন্দ

(ক) যখন রাত্রি আঁধার হবে
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সবে সবে॥

(খ) প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার মাঝে অমনি ফোটে তারা।

(গ) আমায় না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মত বাজে।

(ঘ) আঁধারের মাঝে মাঝে পড়ল তব
সারারাত ফোটাক তারা নব নব।

রবীন্দ্রনাথের গানে 'তারা' এক নিঃসংশয় আশ্বাসের বার্তাবহ। অন্ধকারের পরতের ইঙ্গিত রয়েছে তাঁর নক্ষত্রাবলিতে, তাঁর নিশীথ আকাশের তারার মেলায়। জীবনানন্দের নক্ষত্রের ভিতরে এই আশ্বাসের প্রেরণার চেয়ে আশ্বাসের জন্য কবির আকুলতাই ফুটে উঠেছে বেশি। সেখানে নক্ষত্রের ইঙ্গিত অপেক্ষা তার শুধু প্রকাশটিই প্রধান কথা। তাই বুদ্ধদেবের আলোচনা কবি-পরিচিতির প্রথম চরণ যতটা সত্য, (সে পথ নির্জন যে পথে তোমার যাত্রা,) এই কবিতাটির শেষাংশে—(একটি কলস্ক তারা আকাশের কলস্ক কপালে যেন এঁকে যায় সেই পথ...)—ততটা জীবনানন্দের কবিত্বের পরিচয়বাহী হয়নি। আকাশের কলস্ক তারা জীবনানন্দের নয়। সে আকাশ অধিকাংশ সময়ে কুয়াশায় আকুলিত এবং চাঁদতারা হারানো। নক্ষত্র সেখানে মৃত্যুর সংকেত।

নক্ষত্রের আলোকের রাস্তায় যে সন্ধ্যাকে জীবনানন্দ উক্ত কবিতায় পথ করে দেখেন সেই সন্ধ্যাই আশ্রয়হীন জীবনানন্দ সৃষ্টি করেছেন উপ জাত এক পুনর্জন্মকামী কথা-প্রসঙ্গ। এ কথা-প্রসঙ্গ এক নীড়। এখানেও দেখা যাবে যে-নীড় রবীন্দ্রনাথের সে-নীড় জীবনানন্দের নয়। রবীন্দ্রনাথ নীড়ের প্রতি মমতাসম্পন্ন নন। রবীন্দ্রনাথের আকাশ-নিলয়ের যে অর্থ-গৌরব তারই বিপরীত আশ্রয় 'নীড়' শব্দটিতে ধরিয়ে। প্রেমপাত্রীকে চিরবিদায় দেবার মুহূর্তেও তাই রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যে নীড়-ছাড়া পাখির প্রতিভূরূপে নিজেকে বিদায় জানান যদি খুঁজে পায়। 'নীড় ছেড়ে পাখি যায়/ সম্মুখে আকাশ রবে/ বিদায়বেলে বুক ভরি দোলে'—আটপৌর অংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু জীবনানন্দ যে নীড়-প্রসঙ্গ সৃষ্টি করেন সে নীড় আকাশে অস্থির-অক্ষম। জীবনানন্দের সৃষ্টি সন্ধ্যার মধুর-বাতি সেই নীড়। অসহায় পরিবেশের দেয়ালে বিবর্তিতনির্মিত প্রাচী, নীড়ের জন্য বিধুর বেদনাকে জানিয়ে। এখানে আমরা স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের আকাশ-নিলয়ের চেতনাটির কাছে ব্যক্তির ব্যক্তির অসহায়তার সঙ্গে জড়িতবদ্ধ। পরবর্তী প্রথম মহাযুদ্ধের পরে উনিশের শতকের অবক্ষয়ী যুগের সেই ব্যক্তির আশ্রয় নানা বিপর্যয়ে ছিন্ন হয়ে গেছে। জীবনানন্দ এই সময়ের শান্তি নিভৃতির সন্ধান প্রায় কুলায়সম নীড়ের কল্পনা করেছেন। নীড় নক্ষত্রের মতোই কবির আবেগের, স্মৃতির, কল্পনার আশ্রয়। যেখানে প্রত্যক্ষভাবে 'নীড়' শব্দটির ধ্বনি সেখানেও প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ বা অনুষঙ্গে প্রসঙ্গ নীড়ের আবহবিধানকে প্রশ্রয় দিয়েছে। যেমন:

(ক) অন্ধকারের অন্তরে যেন নড়—

জানালার মাঝখানে অঙ্গন করে

ভাবনার সন্ধ্যার আলো শেষ হয়

হৃদয়ে নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ—অবসর—

আমাদের ঘেরে শব—তুলে শব অন্ধকারের প্রায় মাথা—

অবসন্ন হয়।

(খ) পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে

পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ

লয়ে গেছে তারে।

(গ) সন্ধ্যায় কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি ঘরে।

(ঘ) সূর্যের আলোয় পড়ে নক্ষত্রের মতো আলো জ্বেলে

সন্ধ্যার অন্ধকার নিয়ে দিন তার পেয়েছে সে ঘুম অবশেষে।

(ঙ) আকাশে জ্যোৎস্না হলো চাঁদের আকাশ দিয়ে ছেড়ে

চলে যাই; কোন এক বন্ধ ঘরে অন্ধকারে ঢিলে?

পাখির বাসার মত আমাদের দিয়েছে সে ছেড়ে

আরো অন্ধকারের দিকে—অন্তরায়—

অনেক অনেক অন্ধকারের দেশে।

এই সব এক একটি রূপসী বাংলার নীড়—বস্তুত আর কবিতাগুলির কথা এবং ধূসর পেন কাব্যগ্রন্থের নীড় প্রসঙ্গকে যদি আমরা স্মরণ করি তাহলে একথা দৃঢ় ভাবেই পরিণত অব

যে জীবনানন্দের কল্পনায় প্রথম আশ্রয় সন্ধ্যার নীড়। অথচ জীবনানন্দ জানেন এ নীড় নিরাপদ নয়ে উদাসীন এক নিষ্ঠুর পৃথিবী যাতে অনেক সহজে ছেড়ে যায়।

(চ) —মধুকর তারা যায়

নিভিয়ে দিয়েছে ঝিকে—পথের উপর

পাখির ডিমের খোসা ঠান্ডাকড়কড়—

(ছ) একটি হয়ে গেছে কবে যেন ফেলে যায়

গাছে আছে বা

পাতা ফুটি তারা ছিঁড়—সাদের খোসার নীড় নীড়

তাই এ মৃত্যুর নিরাপত্তা নয় যে নীড়ের আশ্রয়ে পাখি এবং পাখির জীবনের অনিশ্চয়তার মৃত্যুকে বাধ, তাতেও বাসের মৃত্যুকে চরিত্রের প্রথম জীবনানন্দের কবিজীবনের প্রথম অধ্যায়ে এক চমৎকার বৃত্ত-বলয়ের সৃষ্টি করেছে:

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র কাব্যের এবং বনলতা সেন-এর কিছু কবিতা দুটি এই সূত্রে পৃথকভাবে স্মরণীয়। দুটি কবিতাতেই মৃত্যুর একটি বিষণ্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। জীবনানন্দের কবিতার অস্তিত্বের যে প্রবণতাটুকু অনুভব করা যায় তার সূত্রপাত এখানে। তবু এ বিষয়ে অবশ্যই যে জীবনানন্দের কবিচেতনার মৃত্যু-চেতনা শেষ পর্যন্ত অবিনাশ্য বিস্তার করতে পারেনি। মৃত্যুতে জীবনানন্দ যে পৃথিবী দেখেছেন তা অস্তিত্ব-বর্জিত সৃষ্টি নয় বলেই একটি ঘটেছে। জীবনানন্দ মানুষকে 'মহা-জীবনের' মাধ্যমে অকালে বিচ্ছিন্ন এক সত্তা বলে মনে করেছেন বটে, কিন্তু তাকেই মৃত্যুর হলে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে পেরেছেন এ আশায় যৌক্তিকতা মেনে নেওয়া যায় না। এ কথার প্রকাশবহনেই উল্লেখ করা দরকার 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'সুচেতনা' কবিতাটি:

এই পৃথিবীর রণে রক্তে সফলতায় সত্য বটে কখন এসেছি

বা এসেছি আলো হয় অনুভব করে;

এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি

শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;

ঊদ্বেগ অন্তের শেষ পথে যে উপলব্ধি তা কিছুতেই মানুষের নিরবচ্ছিন্ন অধিকার নয়। মানুষের চেতনার অভাবিতার অবশ্য এখনো দ্বিতীয়। কিন্তু হাল পরে যেখানে সেই চেতনারই সমাহরণ। তাই সেই প্রেমের প্রতীক যে নারী সে সুচেতনা। বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থে 'আমি' ধূসর পাণ্ডুলিপি-র 'আমি' অপেক্ষা সত্তার পরিচয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়েছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে যে ছিল প্রতীক্ষায়—'বনলতা সেন'-এ সে নিজের পরিপূর্ণ অস্তিত্বের আত্মচেতনা সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে 'আমি পথ হাঁটিতেছি'র কথায় যেতে হবে যেখানে 'সেদিনের এক একা একটি পৃথিবী আমি খুঁজে নিতে/ কেন যেন; অথচ আমি জানিনাকো হাজার হাজার বছর ধরে'। তাই 'বনলতা সেন'-এ পথিক এক কবিকে প্রায় দেখেন সমগ্রতার সাধিকার অন্তরালে দুর্লভ অধিক মহিমা। হাতে হাতে যুগযুগান্তরের মুক্তগুলি নিয়ে-ধাওয়া মানুষগুলির কথা মনে পড়েছে। অনুরূপতি সেই সব অভিজ্ঞতার দুঃখের ছায়া তাদের আলিঙ্গ হয়েছে বিচ্ছিন্নতা, শেষ পর্যন্ত তার এক সত্তা খুঁজে পেতে চেয়েছে। এই সমাসমতা-বিমুখ 'বনলতা সেন'-এর কবিকল্পনার উপলব্ধি:

> মানুষ কাটিয়ে রাত—প্রাণ সেই নিরত উজ্জ্বল
> উদ্বেগের পরিধিতে জল কোনো সাগরের জল।

সেই সাগরেরই সন্ধ্যা সুচেতনা—যার অপর নাম; 'মানুষের মতো এক-মানুষীর পবিত্র হৃদয়।' কিন্তু কবিচিত্তের এই অন্বেষণ জীবনানন্দের দুটি ঘটনা প্রাসঙ্গিক পরিচিতিতেই প্রাপ্ত হবে। এই দুটিই পরিণতি পেয়েছে বনলতা সেন পেরিয়ে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য়। তবে ধূসর পাণ্ডুলিপি ও সেই উক্তির সাযুজ্যতা তার নেই। 'বেলেমানুষ' শব্দ 'অভিমন্যু'। এই মহিমা তিনি মনস্তাত্ত্বিককে স্পর্শ করেছেন—তিনি অপূর্ব শব্দ রচনা করেন প্রত্যেক মনস্তত্ত্বে, তাঁর শক্তিতেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বেদনা আত্মশীলতায় পড়া দুঃখময় হয়ে 'বেলা অবেলা কালবেলা'র অভিমানী সাম্প্রতিক নক্ষত্র শব্দের ব্যঞ্জনাগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে বনলতা সেন পর্যন্ত দুটি পর্যায়ে জীবনানন্দের কবিতায় এক বিশেষ বড়ো প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। 'ঝরাপালক হতে' বা তার পরেও দু একটি কবিতা বাদ দিলে এই সময়ের জীবনানন্দের অধিকাংশ কবিতায় পাঠ-রচিত প্রতিক্রিয়ায় এক বিষয় পরস্পর নারীকেন্দ্র শেষ দুঃখের আবহাওয়া, ও অনুভূতি তুলিত হয়ে যায়। যেন শুধু কোনও পথ পরমবিশ্রামী মাধ্যমের আত্মনিবেদনকে জানা গেল, যেন অপরিহার্য নিরর্থকতাকে মেনে নিতে হল—তাদের কাছে আমি বিষয় অনুভবেছি। আমার মনস্তত্ত্বকে উপেক্ষা করে কথাগুলি নীরব প্রেমকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যে বিনা প্রয়োজনে অন্তরালে গুমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক একটি কবিতা আছে যাকে মনে হয় কোনও আত্মজিক কাহিনীর সোপান। ধূসর পাণ্ডুলিপির 'পরিণ মৃত্যু পরে', বনলতা সেন-এর 'দুটি মৃত্যু পরে', 'ধান কাটা হয়ে গেছে', 'আকাশ নদী শুধু খেলা করে' এবং 'আবার আসিব'এ কাহিনী কবিতা। এই দুটি গ্রন্থের কবিতায় আত্মার কাঁদিয়ে রয়েছে এক সমাপ্তি বোধ। ধূসর পাণ্ডুলিপি-র নক্ষত্র প্রান্তরের সেই কলাপ। সমাপ্তিবোধের প্রতিধ্বনি। সন্ধানী হিসেবে দেখা দিয়েছে কখনও বিষাদ, কখনও ক্লান্তি, কখনও বা শান্তির নিশ্চিন্তি। এই সমাপ্তি বোধের পিছনে রয়েছে অধিক প্রাচীন অবচেতন। সময় কিছুক্ষণ তিনি তাঁর অন্তর-ভূমির আড়ালে অন্তর্গত পথে দিয়েছেন। এর পরেই জন্মান্তর সমাপ্তি ঘটেছে। যে সমাপ্তি-বোধ জীবনানন্দের কবিতায় 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে কখনও কখনও ক্লান্তির সুরও বাজিয়েছে তারও মূলকথা এই জীবনের সমাপ্তি। নায়ক বলেছেন—আমার জন্য শেষ হয়েছে এই কাহিনী, যে অভিনয় থেমে গেলে সাধ আর আমার নেই।

সুতরাং কবি ঠিকই জেনেছিলেন যে এই সমাপ্তির অনুভূতিকে সঞ্চারিত করার জন্যে এক কালগত সুদূরতার অভিজ্ঞতা ঘুচিয়ে দেওয়া দরকার। এই দৈশিক উপলব্ধির সূত্রেই জীবনানন্দের কবিতার আবহিক রহস্যও উদ্ঘাটিত হতে পারে। ইতিহাস এবং কালগত দূরত্বকে বাহিত করার জন্যই দীর্ঘস্বরধ্বনির প্রতি জীবনানন্দের পক্ষপাত। দীর্ঘ স্বরধ্বনি, বিশেষ 'আ'-স্বর জীবনানন্দের উক্ত উদ্দেশ্যসাধনে বিশেষ সহায়ক।

(ক) পড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের পর
এই সব স্তব্ধ পাখী কয়েক মুহূর্ত শুধু;—
তারপর কাহিনী অন্তরালে
তাঁহার বিশাল ডানা পার হয়ে,—পাহাড়ের দিকে দিকে
সমুদ্রের পারে;

(খ) ঢুল তারা কবেকার সমুদ্রের বিভিন্ন দিশা,
দূর তারা প্রাগৈতিহাসিক কালস্রোত;

(গ) কাল তারা অতি দূরে আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায়
দীর্ঘ বর্শা হাতে
করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—

(ঘ) মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ;

(ঙ) সুদর্শনা আমারে তো এক প্রাণের
শামলা পালিশ, কাশ্মীরী-শাল, সেদিন তোমাকে নিয়েছিল মুক্ত
প্রবাহ আমার বিদ্যুৎ হবে,' আমার মৃত চোখ, আমার
বিলীন হয় আকাঙ্ক্ষা আর তুমি নারী—

অবচেতনের সঙ্গে কালচেতনার সম্পৃক্ত জীবনানন্দের স্বভাবতই অবস্থার অন্বেষা। যেমন মুহূর্তে তাঁর কালচেতনাকে প্রত্যয় দিতে পারেনি যে সমস্ত মুহূর্তে তাঁর অবচেতনের রাত্রিরই অভিজ্ঞতার অভিপ্রকাশমাত্র। পূর্বে কথিত সমাপ্তি-বোধকে সার্থক করে তোলার জন্য নাগরিক-ক্লান্তি এবং পথিক-ক্লান্তির যে পটভূমিকা দরকার 'আ' ধ্বনি কালসৌধকে দুটিয়ে তুলে সেই ক্লান্তিকে পূর্ণ করেছে। এই প্রয়োজন মেনে নিয়েই জীবনানন্দ দৈশিক ক্রিয়াপদকে এড়িয়ে বিদায় নিতে পারেননি। বনলতা সেন কবিতাটির প্রথম এবং শেষস্তবকের দৈশিক ক্রিয়াপদ দুটি এখানে স্মরণীয়। 'হাঁটিতেছি'-র বিলম্বিত স্বরধ্বনি ছাড়া হাজার বছরের ক্লান্তিকে ধ্বনিত করা যেত না। আবার শেষ স্তবকের 'বসিবার' ক্রিয়াপদটিও সমস্ত

পাঠকসমাজের এক অনুরাগিতার সাথে বিশেষণ করে গেছি। এবং এই প্রসঙ্গেই কবিতার কথা বলার জন্যই জীবনানন্দ বলেন:

...সেই সঙ্গে কবিতার মধ্যে পাঠকসমাজকে নির্দিষ্টভাবে নিযুক্ত করতে গিয়ে 'যে যুগ ও যে দেশে আমি রয়েছি সেখানকার মানুষের দুঃখের প্রকাশ কবিতা কিংবা একরূপ, বা যে কোনও রকম সংকল্পে কবিতা ইত্যাদি না, সংকল্পের সঙ্গে কবিতার সংযোগ নেই বলে নয়, সম্পূর্ণ ব্যাপার, সার্থক কবিতা অবশ্য দুঃখের তাপে ফুটে উঠবে, কিংবা ঠিক দুঃখের তাপ নয় এমনি কোনও তাপে; কিন্তু কোনও বিশেষ সাহিত্যিক অর্থে সেখ উদ্দিষ্ট এই সংকল্পের ভিতর থেকে নয়।

[—কবিতার কথা : মহাযুদ্ধোত্তর : জীবনানন্দ দাশ।]

নিজ কবিজীবনে জীবনানন্দ যে কারণে তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তার ব্যাখ্যা এখানে তিনি দেন নি। তিনিও একটি সংকল্প নিয়োগ করেছেন মাত্র। এবং এই সংকল্প তাঁকে পথ করতে দৈহিক সার্থকতার পথ দেখায় নি। প্রথম পাণ্ডুলিপি থেকে এই বাক্যগুলি-সংক্রান্ত তার পাঠভেদের নিদর্শন তুলনামূলকভাবে দেখি।

(ক) জেগে নিয়েছে যেতে যেন মধ্য যেতে তার পাখা মধ্য লোকান্তির বিস্তারের পথ

(খ) কালো,—অনেক মধ্য—অনেক মধ্যে অন্ধ থেকে আমার রাখিতে আছি, জীবনের এই আলো থেকে

(গ) শিশুর এডিমিয়ের চলে অস্তুতার রাত্রির মতন হৃদয় উঠিতে আছে কোলাহলে কেঁপে বারবার।

এই রকম আরও কিছু জায়গায় দৈহিক ক্রিয়া ও যৌগিক চিন্তার মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা দৈহিক আবহাওয়ার পরিণতি হয়েছে। 'বিয়োগের শেষ নেই আর'—এখানে 'বিয়োগের' শব্দে আপত্তি নেই। যে নারীর রূপ ধরে যাবে তার সম্বন্ধে আরতির অনুভূব তাৎপর্যবিহীন নয়। কিন্তু 'বিয়োগে যেতে' এই উক্তির মধ্যে দৈহিক ক্রিয়াগুলির সঙ্গে একান্তই প্রাকৃতি ক্রিয়াটির মিলন সাধন সম্ভব হয়নি। 'রাখিতে আছি' এবং 'উঠিতে আছে' একদিকে দৈহিক ক্রিয়াপদ অন্যদিকে অনাদিকে জেগে থাকার বিশেষণের অনুভূতির বিশেষত্বের পরিচয়। এই অভিব্যক্তিও কার্যকর হয়নি।

কিন্তু তাই বলে আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে জীবনানন্দের কাছে কথাকবেরই গুরুত্ব ধরা পড়েনি। শাব্দিক বিন্যাসে জীবনানন্দের পারদর্শিতা বাস্তব। তাঁর কোনও কোনও কবিতার অংশবিশেষ এক্ষেত্রে আলোচ্য হতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা হৃদয়ের প্রতিমূর্তি যেন কথাকবেকে ধরে নিয়েছেন জীবনানন্দ। যেমন:

কড়ির অন্ধকারের ভূমির আবহে আমার আত্মা লালিত;
যে চির হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন?

অনেক অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছল ছল শব্দে জেগে উঠতে না চাই; কিন্তু আপনি একটা পদ্ধতিতে কিছু বাক্যানি জীবনানন্দের ইঙ্গিত প্রতিকে আলো করে রয়েছে। অন্ধকারের

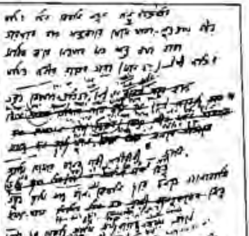

বাক্যটা ক্রিয়াকে নিরর্থকতা থেকে উদ্ধার। সে অস্তিত্ব সকল শাস্ত্রের উত্তরণ। তার অস্তিত্বের শীর্ষ। তার অস্তিত্ব শীর্ষ দ্বিতীয় পঙক্তির শীতল কলারতি সেই নিরাময়তার বিষয় উল্লিখিত। প্রথম স্তবকে নিরাময়তা ব্যতীত গতি—দ্বিতীয় স্তবকে তা চরম। এ প্রতিশব্দ অন্যের প্রতি যাবে অস্তিত্বের সার্থকতার কথা আলো, শব্দে, বাক্যনীতিতে স্মরণ করিয়ে দেয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তির বিশেষণগুলির সঙ্গে যোগ দিল স্বরাঘাত ধ্বনির সুমিত প্রয়োগ—নির্বাচনের মাধুর্য এল। অতঃপর পঞ্চম পঙক্তিতে আবার দ্বিতীয় স্তবকটি নিয়ে এল—শুধু 'কেন' শব্দটি প্রশ্ন বদল করে একটা আর্টিকলিটিকে ধ্বনিত করেছে। এর পরেই আবার অন্ধকারে অপরিচিত-বিস্মৃতির ধারণা—'অবসর' বিশেষণটি বীজের পরিণত শব্দ হয় না। 'অবসর' শব্দে নীরবের বিস্তার নেই। বিশেষণটির ইঙ্গিতে কোথাও বাক্যের ধ্বনি বাজেই অপরিচিত। তার কাছে মূল অন্ধকারের কঠিন আস্বাদও পুনরায়ে ঘুরিয়ে তোলা। এই পুনরায় অনুভূতিকে বাড়ে বাড়ে জীবনানন্দ উক্ত কবিতার নানাভাবে দুই অধ্যায়ে রেখেছেন।

'অবসর অন্ধকার', 'উটের গ্রীবার মতো কোনও এক নিস্তব্ধতা এসে', 'পাখির নীড়ের মতো চোখ', 'ঘোড়ার অশ্বের মতো তার প্রাণ রোদ', 'ভূল যার কথা শুনছে যেন', প্রভৃতি বিশিষ্ট জীবনানন্দীয় শব্দচিত্রের মধ্যে তাঁর কবিতাকে দুঃ বহুল স্বাক্ষিত। এগুলি তাঁর কাব্যের স্বতন্ত্র স্বরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এই স্বর-আওয়াজ, সকল কবির ক্ষেত্রেই যেমন তাঁর ক্ষেত্রেও তেমনি, তাঁর শিল্পসৃষ্টির ধারা। 'অবসর অন্ধকার' এবং 'উটের গ্রীবার মতো কোনও এক নিস্তব্ধতা এসে'—এই দুটি ক্ষেত্রেই অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা শব্দ নয়, কবি-সত্তা ছিল এক অতীন্দ্রিয় পুনরায়

শরীরের বিনাশের অনিবার্যতাকে স্বীকার করে। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' এই উপমায় ব্যবহৃত 'চোখ' কবির উদ্দিষ্ট নয়। উদ্দিষ্ট কবির নিজেরই আশ্রয়াকুল মন। অর্থাৎ, যে জন্য সেখানে চোখ তুলে, তার প্রসঙ্গে অর্থাৎ বনলতার আশ্রয় পাখি বা খুঁজেই পেয়েছে বলেই উপমার সার্থকতা। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার মতো' অন্ধকার উপমা, প্রসঙ্গ প্রতীক। কখন শব্দটি সেই প্রতীককে বহিয়ে দিয়েছে। শ্রাবস্তী, বিদিশা, বিদর্ভ প্রভৃতি নানা কালের মধুরতম এবং মানুষের সমস্যা ও সমাধান শান্তি একসাথে। মাঝে মাঝে জীবনানন্দ অতি মাত্রায় শব্দ করে থাকেন তবে। যেমন তাঁর রচনা থেকে একটা দেখা যায়: 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি।' এখানে 'অনন্ত মৃত্যুর মতো' এই উক্তির আর প্রয়োজন ছিল না। কারণ শব্দের মতো শব্দ নিঃশব্দের জীবনানন্দের মানুষজনের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধূসর পাণ্ডুলিপি-র প্রেমিকা-কল্পনা এবং বনলতা সেনের প্রেমিকা-কল্পনার মধ্যে যে পার্থক্য অনুভূত হয় তাও এই সূত্রেই বিচার্য। বনলতা সেনের প্রেমিকা কল্পনায় জীবনানন্দের মাতৃ-কল্পনার প্রভাব পরিপ্রেক্ষিতে পাওয়া গেছে। প্রেমিকা সেখানে আশ্রয়দাত্রী। অন্যদিক থেকে আবার মৃত্যুর উত্তরণও সেই আশ্রয়ের মধ্যে। তাই কবির মনের মূলের প্রধান জীবনানন্দের মৃত্যু-চেতনার সঙ্গে জড়িত হয়ে তাঁর কাব্যিক মানসলোককে স্পষ্টতা দিয়েছে। ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে প্রেমিকা-কল্পনার এই বৈশিষ্ট্য ছিল না।

কিন্তু এর সত্ত্বেও জীবনানন্দের যে সমষ্টি-চেতনার কথা আগে পূর্বে বলেছি তা কিছুতেই পূর্ণতার চেতনা নয়। পূর্ণতার চেতনার জন্য যে দার্শনিক বিশ্বজনীন প্রয়োজন তার অভাব জীবনানন্দে ছিল না। কিন্তু এই বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি কোনও সামগ্রিক দর্শনে অর্জন করেননি। করেননি বলেই এটা তাঁর কাছে সহজ আয়ত্তের ব্যাপার ছিল। যেমন রবীন্দ্রনাথ যেমন অনেক উঁচুতে আবেগনার বিষাদের সঙ্গে যৌক্তিক ও দার্শনিক বিশ্বাসের সাযুজ্য ঘটিয়ে পারেন, জীবনানন্দ তেমন পারেননি। মানুষের প্রতিক্রিয়া, নিঃসঙ্গতা, তার গ্লানি ও বিষাদের কথা তিনি লিখেই গেছেন। তা থেকে উত্তরণের জন্যও একজন মানবতাবাদী কবির বিশ্বাসী আত্মমগ্নতা-সচেতন প্রতিক্রিয়া কাব্য তিনি প্রকাশ করেন কিন্তু এই দুই প্রান্তকে মেলাতে পারেন না। বনলতা সেন এবং অনুরূপ কয়েকটি কবিতার মধ্যকালের সার্থকতা সত্ত্বেও একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, জীবনানন্দের প্রায়-কবিতাগুলিতে কোনও মধ্যপথ নেই। প্রথম স্তবকে বা কয়েক লাইনেই কবিতাটির মূল কথা শেষ হয়ে যায়। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই এ লক্ষণ ছিল। কিন্তু কবিতার দুপক্ষের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ যে সূক্ষ্ম পরম্পরার অন্তর্বর্তী সৃষ্টি করেছেন তার সর্বাঙ্গীণ অভিজ্ঞতা। সে ক্ষেত্রে জীবনানন্দের আশ্রয় ছিল তাঁর আত্মমগ্ন বিশ্বাস। এই যে সীমাবদ্ধতা তার দায় তাঁকে বোধ করতেই হয়েছে। তবু 'শব্দ' কবিতা এবং দীর্ঘ কবিতার সমাপ্তিতেই এই নৈতিক বিচ্যুতি ঘটেছে। তাঁকে অবশ্যই বিচার-কবিত আবেগময় বিশ্বাস এবং যৌক্তিক বিশ্বাসের পার্থক্যের সমস্যা এবং এলিয়টের মতাদর্শ এখানে আলোচনা করতে চাই না। বরং এলিয়টকে আমরা এখানে বিশ্বাসের ব্যাপারে বিরোধী হিসাবে দেখি না। বিশ্বাসের শাস্ত্রে দুজনে বিশ্বাস সমস্ত চৈতন্যেরই বিষয়। আত্মগত ভূমিকা সেখানে স্বতঃই গৌণ। কিন্তু সেখানেই সে সিদ্ধান্তের পার্থক্য পাওয়া যাবে। বিশ্বাসে একবারে স্থির বা কবিতামধ্যে স্থির থাকতে পেরেছে কিনা। 'বেলা অবেলা কালবেলা'র বিশ্বাসের সেই ভূমিকা প্রধান। তবে 'বেলা অবেলা কালবেলা'র জীবনানন্দের দার্শনিক অভিপ্রায় আরও স্পষ্টতা লাভ করেছে, সেই অভিপ্রায় দ্বিধার স্তর কবির প্রয়াসও যুক্ত হয়েছে। বস্তুত 'আট বছর আগের একদিন'-এর সেই শূন্যতা সংক্রামী ক্লান্তিবোধ, সেই নিঃসঙ্গ চেতনা থেকে 'বনলতা সেন'-এ 'সুচেতনা' কবিতায় পৌঁছে জীবনানন্দ আশ্চর্য প্রতিষ্ঠায় প্রতি অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। 'বেলা অবেলা কালবেলা'র অবিচল নিষ্ঠাই [illegible] দিক থেকে তাঁকে আরও অগ্রসর করে দিয়েছে। কিন্তু কবিতা তো শুধু নিষ্ঠা নয়, শুধু দর্শন নয়। 'বেলা অবেলা কালবেলা'র এখানে ওখানে নিঃসঙ্গ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কাব্যোক্তি অসংবৃত প্রসঙ্গগুলির পুতুল নাচের শব্দে শব্দে কম্পমান। সে পুতুলরা আপন বিচ্ছিন্নতাই হয়। 'আট বছর আগের একদিন'-এ নৈতিক বিচ্যুতি ঘটেছে, কিন্তু সে বিচ্যুতি অন্য জাতীয়। এই কবিতাটির প্রধান অসঙ্গতি দৃষ্টিকোণ সংক্রান্ত অসঙ্গতি। যে সব দীর্ঘ কবিতায় দ্বিতীয় পুরুষ সম্বোধন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সেখানে উত্তমপুরুষের উক্তি, 'তার' এই সর্বনামের প্রয়োগ এবং নৈর্ব্যক্তিক বক্তব্যগুলি সাম্যপরিধির মধ্যে কবিতাটি পূর্ণতা প্রদান করে। প্রসঙ্গত আমরা এলিয়টের বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা The Love Song of J. Alfred Prufrock-এর কথা স্মরণ করতে পারি। 'আট বছর আগের একদিন'-এ রয়েছে, যেখা কোথাও উত্তমপুরুষের নিজের কাহিনী বা কথা নেই। 'লোকটা' বলে যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তার ভূমিকাও স্বভাবতই গৌণ। সমস্ত কবিতাটিই 'তার' কথা। এই কবিতায় যাকে 'তুমি' বলা হয়েছে এবং যাকে 'তার' এই সর্বনামে উল্লেখ করা হয়েছে এরা এক ব্যক্তি। 'লোকটা' বলে বলা হয়েছে সেই চৈতন্যের ওপারের বন্ধু প্রেতাত্মা। কবিতাটির শেষে 'আমি' এসেছে। একেবারে শেষে এসেছে 'আমরা'। 'আমি' বলে যে কথা বলেছে তার দার্শনিক উক্তি এবং পরিশেষে 'আমরা' যে উক্তি করেছে-সেই 'আমরা'র অন্তর্বর্তী আমি এক নয়। 'তবু' শব্দটিই তার প্রমাণ। 'আমরা' শব্দে যে ঔচিত্য-বিচ্যুতি তার প্রকৃতি কবিতাটিতে নেই। আমার যে দ্বি-ব্যক্তিত্বের কল্পনা থেকে আয়াস বিস্তার করেছে তার অনিবার্য জীবনদর্শন-সংক্রান্ত পুনর্বিবেচনা জন্য উচিত হতে পারেনি। এইভাবে কবিতাটি বিভাজিত হয়েছে। তাছাড়া যে কবিতাটি শিরোনাম পেয়েছে সে 'তার' কথা। কিন্তু 'বেলা অবেলা কালবেলা'র যে নৈতিক বক্তব্য তার অভিপ্রায়ের কোনও অসঙ্গত বাধা হয়ে ছিল না। 'মাঘ সংক্রান্তির রাতে' কবিতাটি 'বেলা অবেলা কালবেলা'র কবি-অভিপ্রায়ের সফল বহন করেছে। আমরাও সচেতন হয়ে উঠি এই বোধে যে যৌক্তিক

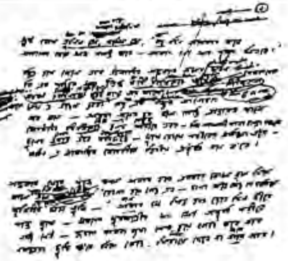

বিষণ্ণতার মধ্যে কোন্ বাসন্তী আশ্বাসের জোয়ারে কবি পৌঁছোলেন দেখা যাক:

মহাবিশ্ব তমিস্রায় মৃত্যু হয়ে গেলে
সূর্য বা রজনী, নারী, মনে না রেখেও তার প্রীতি
শক্ত হেনে অন্ধকার শক্তি যদি আর সূর্যের মতো
শেষ হয়ে চলে যাবে—তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

নিঃসন্দেহে এই অংশে আশার বাণীতে আশাবাদটি ধরা। কিন্তু এই আশার বাণীকে কবিতার আবহে প্রসারিত করতে গেলে যে প্রকরণ প্রয়োজন সেখানে কবির শৈথিল্য ঘটেছে। কেননা, যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য ধারণার মধ্যে জীবনানন্দের ইন্দ্রিয়মুখী চিত্রকল্প গ্রথিত ছিল তার সাযুজ্য না থাকায় অবিশ্বাসেই ছিল অতীতনির্ভর। তিনি মূলত বিষণ্ণতার কবি, শেষোক্তিগুলি দুঃখ-বেদনার গীতের কথা বিধুর করি। আমরা আগেই বলেছি যে বেদনাবোধ যে গভীর ধান কাটা হয়ে গেছে যার সম্মুখে পড়ে শূন্যতা, তা কবি জীবনানন্দের প্রিয় প্রসঙ্গ। এইখান থেকে যাত্রা সম্প্রসারিত হতে উত্তরণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু এই উত্তরণের প্রকৃতির দিকে জীবনানন্দের তেমন দৃষ্টি ছিল না। ছিন্নভিন্ন আশ্রয় থেকে নিজেও একটা আর একবার জন্ম নেবার 'সুচেতনা' জীবনানন্দের কবি জীবনের সর্বশেষ লিখিত কবিতা। এইখানে তার সেই বিশুদ্ধ বিষয়ে কথা নেই যা আমাদের স্পর্শ করে। যার এক বিষয়ের কথা আছে, তা আমাদের বুক ভরে রাখে। তবু সে বিষয়কে উপেক্ষা করেই প্রতীতিকে ভর-প্রায় শব্দের আহ্বান। কবিদের সৃষ্টির বিবর্তনের কথা জীবনানন্দ এর আগেও বলেছেন। কিন্তু 'সুচেতনা' কবিতায় দেখা গেল ঐ বিবর্তনই সব কথা নয়। এই পথে আলো জ্বেলে এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে—এই দৃঢ় প্রত্যয়টুকু এত আলোকে উদিত। বিশ্বাসও এই কবিতায় প্রথম দেখা গেল। 'সুচেতনা' কবিতায় এর আগে এমন করে জীবনকে ভয় করলে উচ্চারণ করেন নি, যেমন করলেন সুচেতনায়। 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে'—এ অনুভূতি এবার বিদায় নিল।

তথাপি এই কবিতাতেই আমরা উপলব্ধি করি যে যে জীবনানন্দ তাঁর অন্তর্গত বিশ্বাসের সব খুঁটিনাটি মনের সাহায্যেও প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন না। যেই তিনি অনির্দিষ্ট মানবতার মুক্তির পথে নক্ষত্রলোক নক্ষত্রের ভিন্ন আলোকে খুঁজতে যান, তখনই তাঁকে ইতিহাসের প্রসঙ্গকে অনিবার্য বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাঁর সেই সুপ্ত অতীতের পাণ্ডুলিপি অবাধ ভূমিকা শুরু হয়ে পড়ে। তখনই তাঁর প্রবল নৈতিক আকাঙ্ক্ষা থেকে আমরা বঞ্চিত হই। জীবনানন্দের কাব্যজীবনে যে ভঙ্গি দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান তা অসতর্কতার ফলে থেকে এখানে প্রকট হয়ে উঠল। দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে, প্রাবল্যের শিক্ষা থাকল। 'প্রথম শতাব্দী' কবিতার মধ্য পঙক্তি থেকে সংগ্রাম পঙক্তি এর একটি সাধারণ প্রমাণ বলে উপস্থাপিত করা চলে। জীবনের যে বিকৃতির বিকটি কবি কোনওদিন দেখেননি—মানুষের জীবনের দিকে তাকাতে গিয়ে সেই বিকৃত জীবনের কথাই তাঁর মনে পড়েছে। কিন্তু এই বিকৃতিকে আয়ত্ত করতে গেলে তাঁর দরকার ছিল নতুন করে টেকনিকের সন্ধান করা। দুর্ভাগ্য তাঁকে সেই সময় দেয়নি। জীবনানন্দ তাঁর আবেগের ভিতর দিয়ে মানুষকে দেখিয়েছেন; অন্যভাবে। আর তাঁর বাস্তবতার ভিতর দিয়ে নিষ্ঠাকে দেখিয়েছেন: যদি আমরা আত্মিক একক্রমে এর কোনোটাই যেন নির্দিষ্ট করে সত্য বা absolute না হয়।

কাছের মানুষ জীবনানন্দ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

জীবনানন্দকে প্রথম দেখি ১৯৫৫ সালে। সেদিক দিক থেকে কথা বলতে গেলে আলাপটুকুন এক মাসের মধ্যে। তখন রাসবিহারী ও ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে 'সুতৃপ্তি' রেস্টুরেন্টকে কেন্দ্র করে লেখক ও চিত্রশিল্পীদের একটি চমৎকার আড্ডা ছিল। আজকের এমন কোনও নামকরা কবি সাহিত্যিক বা চিত্রশিল্পী নেই যে এখানে আড্ডা দেয়নি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় জীবনানন্দ বেড়াতে বেরিয়ে ফিরতেন। একদিন ল্যান্সডাউন ও রাসবিহারী অ্যাভিনুর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছি, আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু হাত তুলে জীবনানন্দকে দেখিয়ে দিয়ে বললো "ঐ দ্যাখ জীবনানন্দ"। আমি তখনও কিছু লিখি না, তবে যা পাই তা গোগ্রাসে পড়ি। অকালেই অনেক কবিতা স্মৃতিধার্য হয়ে যায়। জীবনানন্দের অনেক কবিতা তখনই আমার কণ্ঠস্থ। একটু মাথা নিচু করে হাঁটছিলেন জীবনানন্দ। পরে লক্ষ করেছি এটাই তাঁর স্বাভাবিক চলার ধরন। হাত থাকতো ঠিক তার এপাশ দিয়েই হাঁটতেন। দিক ঠাহর না করা ছিল তাঁর স্বভাব অভিজ্ঞ। তখন দুটিমাত্র কিছুটা আগে হাত থাকতো দেখতাম মোটামুটি দ্রুতপদে হেঁটে কবি রাস্তা পার হয়ে গেলেন। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম তার ঠিক উল্টো দিক প্রায় তিন কোণা ফুটের পেট্রোল পাম্প। তার একটা বাড়ি পরেই জীবনানন্দ ১৮৩ নম্বর ল্যান্সডাউন রোডের একতলায় থাকতেন। এখন সেখানে নাকি চিত্রতারকা মৈত্রী রায় তাকে নিয়ে থাকেন। বহুতলের চেহারা স্বাভাবিক ভাবেই বদলে একেবারে অত্যাধুনিক হয়ে গেছে। শুধু পুরনো সামনের গাছ ও নিম গাছটি আছে। নিম গাছটি নতুন। পুরনো নিম গাছটির পাশেই এর ঠিক তেমনই সবুজ হয়েছে। আমার প্রথম বন্ধু কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে সঙ্গে আমরা একদিন গিয়ে হলাম জীবনানন্দের বাড়ি। শক্তি আগে থেকেই ছিল কবির বাড়ি।

পড়ুয়া বনিতা শাখা নিয়ে যেতো। সঙ্গে আসতে বেশিই কবি জেনেছেন শক্তিচার্য ও সুধাংশু রায় ছিলেন। এই সুধাংশু রায় ছিলেন জীবনানন্দের ঘনিষ্ঠতম পার্শ্ব। মনে পড়ল সেদিন সন্ধ্যার শেষ থেকে ফেরার সময় জীবনানন্দ শক্তি একাই দেখছিলাম। আমাকে দেখে কিছুই বললেন না, শুধু শক্তিকে বললেন 'বসো।' কিন্তু বসার জায়গা কোথায়? একটি ঘরজোড়া খাট। পাশে একটা বাক্স (সম্ভবত টিনের)। বাক্সটির ওপরে পাঁচ নম্বরের একটা এক্সারসাইজ খাতা। টেবিলের দিকে পুরু কাগজের ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র খাতা ব্যবহার করতেন। জানিনা ঐ খাতা থেকে কিছু পড়ে শোনাচ্ছিলেন কিনা। আমরা ঢুকতেই খাতাটি পাশের ঘরে চলে গেল এবং জাফরি জানলাগুলোর উপর। আর বসে কবির দিকে তাকালাম। খুবই সাধারণ চেহারা। একজোড়া চোখ ছাড়া আর কিছু লক্ষণীয় কিছু নেই। চোখ দুটি প্রায় গোলাকৃতি এবং বেশ বড়, প্রায়শই অন্যমনস্ক। আমাদের সামনেই শক্তিকে বললেন "বীরেন (কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) আমার সম্পর্কে কি লিখেছে দেখেছো?" শক্তি নিরুত্তর। আসলে জীবনানন্দ কোনও উত্তর চেয়ে যে প্রশ্নটি করেছিলেন এমন মনে হয় না। সে সময় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবনানন্দ বিষয়ে একটি লেখা লিখেছিলেন, তাতে বেশির ভাগই প্রশংসার সঙ্গে জীবনানন্দের লেখায় দেশকাল ও সমাজ চেতনার কিছুটা অভাব দেখতে পেয়েছিলেন বীরেন্দ্র। তাছাড়াও জীবনানন্দের ব্যক্তিত্ব যে কবির প্রতিভানুসারী নয়, এমন ইঙ্গিতও বোধহয় ছিল। হঠাৎ জীবনানন্দ জানত বসে বসে উঠলেন "বীরেন আমার কবিতা বুঝতেই পারেনি।" একথা বলেই যেন খেয়াল হলো এখানে আমিই একমাত্র তাঁর অপরিচিত। আমাকে সরাসরি না জিজ্ঞাসা করে শক্তিকে বললেন "এ কি করে?" আমার দিকে একবার তাকিয়ে শক্তি বললো কাঁচ ইস্কুলে পড়ে। আপনার কবিতার ভক্ত। আপনার

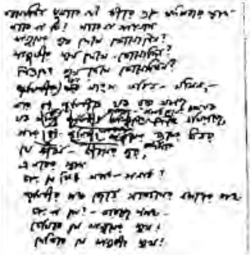

শুধু কবিতা ঢুকে যেতে পারে। যেখানে এসেছে আনন্দে। শুনেই জীবনানন্দ কাকোকাহিনিরকে হঠাৎই হো হো করে হেসে উঠলেন। পর মুহূর্তেই হাসিটি গিলে ফেলে বললেন বেশ তো? আমার এ চেহারা কি বর্ণনীয়।" বলতে বলতেই বাচ্চাদের মতো মিটে গেল কাঁধিকের দিকে। আর দেখে রুগ্ন ঘরের অন্যান্য কাজ ছিলেন সঞ্জয়কে দেখে ছিলেন—যেন ওরকম উচ্চহাসে হেসে ওঠাটা তাঁর উচিত হয়নি।

সত্যি জীবনানন্দ কোনও অর্থেই তেমন আকর্ষণীয় ছিলেন না চেহারায়। একজোড়া চোখ দুটি ছাড়া। চোখ একেবারেই সাধারণ মানুষের মতো নয়। ঠোঁট দুটি চাপা, ওপরের ঠোঁটটি অনুপাতে একটু বেশি পুরু। দেখলে মনে হয় এখনি কিছু বলবেন, কিন্তু বলছেন না। তারপর তিনি যথারীতি সুতোর চাদর নিয়ে ঢাকতে মনে হলো বাড়িয়ে কোথাও বেরুবেন। ফিরে আসতে আসতে সঞ্জয়কে বললাম উনিতো সারাক্ষণ আমার সঙ্গে একটি কথাও বললেন না। কেনরে? সঞ্জয় জানালো অচেনা লোকের সামনে উনি সাধারণত স্বল্পবাক্‌ই থাকেন। খুব ঘনিষ্ঠ—যেমন অরবিন্দ গুহ, ভূমেন্দ্র গুহ, অরুণ সরকার, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু এবং চিত্রশিল্পী সুবোধ দাস ছাড়া আর কারও সামনেই জীবনানন্দ তেমন স্বচ্ছন্দ নন। তাঁর সমসময়ে, এমনকি 'বনলতা সেন' প্রকাশিত হবার পরও, তিনি যোগ্য মর্যাদা পাননি। এই উপেক্ষা তাঁকে মনের দিক থেকে প্রায় সর্বদাই বিষণ্ণ করে রাখতো। পরে যখন আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়, তখন আমি এবং অরুণ সরকারের সামনে এক সন্ধ্যায় গভীর বিষাদ নিয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন "আমার কিছু কবিতা কি থেকে যাবে না?" এতদিন পরে মনে পড়ছে না তাঁর কথাগুলো ঠিক এমনই ছিল কিনা। তবে মূল প্রতিপাদ্য ছিল তাই।

দেখা গেছে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ আন্তর্জাতিক কবিই সমকালে কম বেশি উপেক্ষিত হয়েছেন। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে উপেক্ষা ছিল অনেক বেশি মাত্রায়। তার কারণও ছিল। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কি ভাষা ব্যবহারে, কি প্রকরণে, বা অন্তর্বস্তুগত ভাবনায় তাঁর তুল্য কবি রবীন্দ্রনাথের পরে কেউ আর আসেননি এ কথা অনেকে মেনে নিতে পারেন না। নিজেকে কোনওভাবে জাহির করার প্রবণতা তাঁর ছিল না। তথাপি তিনি উপেক্ষিত, অনাদৃত, এমনকি নিজের তীব্র প্রত্যয়ের প্রতিনিধিত্ব তিনি নিজেই করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথকে জীবনানন্দ একাধিকবার সবিনয় অনুরোধ করেছিলেন। (বিস্তারিত: জীবনানন্দ সংখ্যায় প্রকাশিত চিঠি দুটি দ্রষ্টব্য) তাঁর অনুরোধ একটা কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে অভিমত জানাতে। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের সে অনুরোধ রাখেননি। নিতান্ত সাদামাটাভাবে "তোমার কবিতার চিত্ররূপময়তা আছে" বা "চিত্ররূপময়" এই কথার বাইরে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেই ক্ষান্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অথচ রবীন্দ্রনাথ অনেক অখ্যাত কবিকেও যেমন যেমন ক্ষেত্রে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন তা আমরা দেখেছি। সম্ভবত জীবনানন্দের কবিতার মূল সম্পদটিকে ধরতেই পারেননি রবীন্দ্রনাথ।

আসলে, প্রকৃতপক্ষে জীবনানন্দ তাঁর সম-সময় থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। বাংলা কবিতায় তিনি ছিলেন একেবারেই অনন্য-পূর্ব। তিন দশকে একমাত্র যোগেন্দ্র নিয়ে বাদ দিলে জীবনানন্দের সমসাময়িক কবিরা সকলেই ছিলেন ইংরেজির ছাত্র এবং সকলেই কোনও না কোনও সময় অধ্যাপনা করেছেন। কেউ কেউ একাধিক ভাষাও জানতেন। এ প্রসঙ্গেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সুতরাং সঙ্গত কারণেই কোনও না কোনও সময় তাদের ওপর বিদেশী প্রভাব পড়েছিল। জীবনানন্দও এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। তবে জীবনানন্দের ক্ষেত্রে এই প্রভাব অনুঘটকের কাজ করেছিল, তাঁর নিজস্বতার বিকাশেই সহায়ক হয়েছিল। নিজস্বতা ও বিদেশী প্রভাব একত্রেই মিশেছিল তাঁর। এভাবেই এগিয়ে ছিলেন তিনি যে সাধারণ কবিতা—অনেক পাঠকের পক্ষে তাকে সমান অনুধাবন করা অসম্ভব ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। জীবনের অন্তরালেও—কি শারীরিক, কি অনুভূতিক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত উপেক্ষারই শিকার হয়েছেন তিনি।

সমকালীনদের সূচনা থেকেই তাঁর প্রকৃত কাব্য প্রতিভা পাঠকের কাছে অনাবৃত হতে থাকে। তবে জীবিত অবস্থায় নয় বরং মৃত্যুর পরেই তিনি প্রথম তরুণ কবিদের মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠতে থাকেন। সিগনেট প্রেস ১৯৫০ সালের যে অর্থিক বছর শেষ হয়েছিল তাতে "বনলতা সেন" বইয়ের সাকুল্যে বিক্রি হয়েছিল মাত্র ৩০০ কপি। সিগনেট প্রেস থেকে রয়্যালটি পেয়েছিলেন একশোটির মত কিছু বেশি। প্রকাশের পর হঠাৎই তা অনেক থেকে বিলোহিল।

বলে অভিভাবিকা ছিলেন তাঁর মা। সদা নিজের জাতীয় উন্নতির জন্য চেষ্টা করতেও, একেবারে নয়, উপন্যাসে লিখেও জীবনানন্দকে কোথাও প্রগতি দিতুই। কি না করতে হয়েছেন কবি। টিউশিওয়েলের মাস্টারি, দৈনিক কাগজের বড়িবেশনীয়দের সম্পাদনা, ছাতার কাঁচ, ছিট—কোনোটাই পরিকল্পনায় করতে পারেননি। ব্যবসার একটি পার্টি জোগাড়ের জন্য রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত দৌড় মন্ত্রী না করায় শেষে অভাবেও রয়ে গেছেন। এরকম জীবনের শেষ দিকে হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনার চাকরি তাকে খানিকটা মানসিক শান্তি দিয়েছিল। একবার অধ্যাপিকা জিজ্ঞেস করেছিলাম মেয়েদের পড়াতে আপনার কেমন লাগছে? বলেছিলেন, ক্লাসে মেয়েরা বড়বড়ই শান্ত। তবে এরা পড়াশোনা করে কম বেশি চাকরি পাবে জানে। সময়ের অভাবে, এখানে কয়েকজন মহান অধ্যাপিকা একসঙ্গে বেশ কিছু ছাত্রী আমার কবিতার খুব ভক্ত। কয়েকজন ছাত্রী তো লেখায় দুঃখও বলতে পারে।

দাম্পত্য জীবনে যে কবি সুখী ছিলেন না সেটা এখন সর্বজ্ঞাত। আমরা যখন নিয়মিত যেতাম তখন তাঁর স্ত্রী লাবণ্য দাশকে অতিথি সামনে বসিয়ে ঘরে আসতে দেখেছি। স্কুল থেকে ফিরে বেড়াতে গেছেন, সন্ধ্যা হয়ে গেলেও প্রায়ই দেখতাম তখনও লাবণ্য দাশ স্কুল থেকে ফেরেননি। তবে কি অসামান্য এক প্রতিভাবানের সঙ্গে ঘর করছেন তিনি কখনই, এমনকি নিজের মৃত্যু পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না! সংসার অর্থ কষ্টের জন্য লাবণ্য দাশকে স্কুলে কাজ নিতে হয়েছিল। লাবণ্য দাশ প্রাইভেটে আই-এ, বি-এ পাশ করে পরে সার্কাসে একটি মেয়েদের স্কুলে হেডমিস্ট্রেস হয়েছিলেন। জীবনানন্দই মাঝে মাঝে পড়া দেখিয়ে দিতেন। আমি তখন স্কুলের টিন ছোড়া বুদ্ধিতেই থাকতাম। প্রায়ই লাবণ্য দেবীর সঙ্গে দেখা হতো, দুটো কথা কেমন হতো না। চেহারা উজ্জ্বল শ্যামল হয়ে থাকিল; নানারকম রোগে ভুগছিলেন। উঁর অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের তুলনায় তাঁর স্বামী জীবনানন্দ প্রায় কিছুই যে রোজগার করতে পারছেন না এই চিন্তাটাই লাবণ্য দাশকে নিয়ত পীড়া দিত। এ কারণেই একবার কোন কিছুদিন কবিতা লেখা থামিয়ে জীবনানন্দ তাকে পুস্তক-সমালোচনা, ও গল্প রচনায় মন দিয়েছিলেন। এমনকি নিজের নাম লেখার কথাও ভেবেছিলেন। কবির সমকালপ্রতিভাবান অশোকানন্দ অনেকবারই কবির নিদারুণ অর্থ সংকট উদ্ধার করেছেন। কবির ছোট বোন সুচরিতা দাশও মাঝে মাঝে দাদার স্বল্পতার মাঝখানে সাহায্য করতেন দাদাকে বুঝতে না দিয়েই। জীবনানন্দের পরিবারে একমাত্র সুচরিতাই জীবনানন্দের প্রতিভা সঠিক অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

আবাল্যকাল থেকে এক বাক্যেই ভাবনাবাদের কবি। তবে বরিশাল থেকে কোন বয় কবেকার থেকে তিনি ছিলেন খুবই আত্মকেন্দ্রিক, নিজেকে পরিহার প্রবণ। বরিশালে থাকতে অবসর সময়ে তাঁর প্রেমে অন্যমনস্ক ও নেশা ছিল গোলাপবাগানে ভ্রমণ। মাঝে

[illegible]

মাঝে তার কাঁটাদের দিকে, কেউ ফুল চুরি করত কিনা দেখতে রাতে একাকিনিবার খাটে উঠে জেগে দেখতো কেউ ফুল চুরি করছে কিনা। আমি নিজে যখন জীবনানন্দ প্রসঙ্গে বরিশালে গেছি, যে বাড়িটিতে তিনি থাকতেন সেই বাড়ির নাম তখন "সর্বানন্দ ভবন" থেকে বদলে "ধানসিঁড়ি" উপন্যাস বাড়িটির প্রতিটি কোণ ঘুরে দেখে এসেছি। বাড়িটার গেট দিকার উপরেই 'ধানসিঁড়ি' লেখা রয়েছে। নদীর ছবি তুলে পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের সেই ছবি প্রথম উপহার দিয়েছি। শুধু পশ্চিমবঙ্গের কেন পূর্ববঙ্গের জীবনানন্দপ্রেমীরা প্রথমবারের মতো সে নদীর ছবি প্রত্যক্ষ দেখেছেন ('দিবস' জীবনানন্দ শতবর্ষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। বরিশালে অশীতিপর কিছু বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলে জীবনানন্দ সম্পর্কে অনেক তথ্য জ্ঞাত হয়েছি। জানিনা সত্যি কিনা, ওদের একজন যিনি জীবনানন্দকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন (নাম রফিক আলী) বললেন কলকাতায় দেখা হতে এক সময় হঠাৎ জীবনানন্দ নাকি ওঁকে বলেছিলেন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের চাকরিটি ছেড়ে দিয়েছে অনভিপ্রেত পরে, স্ত্রীকে বরিশালে রেখে, কলকাতায় যাওয়া উচিত হয়নি। তাঁর অপ্রকাশিত ডাইরিতে এখন প্রকাশ ব্যক্তি জীবনের নানা চমকপ্রদ তথ্য আমাদের সামনে আসছে। এগুলি প্রকাশিত হলে পাঠকরা মানুষ জীবনানন্দকে যে নতুন ভাবে আবিষ্কার করতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কবির রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অবগতির জন্য বলা যায় তিনি সক্রিয়ভাবে কোনও দলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন না। তবে মানসিকতায় বেশ খানিকটা বাম ঘেঁষাই ছিলেন। তাঁর আণবিক যুদ্ধ নিয়ে "Atomic energy and Nation" আলোচনা নিয়ে রাশিয়া ও আমেরিকার ভূমিকা সম্পর্কে নানা আলোচনা করে রাশিয়াকেই স্পষ্ট সমর্থন করেছিলেন। পঞ্চাশের শেষে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন হয়েছিল তার সঙ্গে অন্যান্য বাম রাজনৈতিক মানুষের সঙ্গে জীবনানন্দও সই করেছিলেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় সে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে অন্যত্র

এটি উদ্ধৃতি দিয়েছি। তাঁর বহু লেখায় যে আধুনিকতার বিকাশ, যেখানে মূলত মানুষের সম্বন্ধে এবং শহুরে নাগর আচরণের বিরুদ্ধে তাকে উচ্চকণ্ঠ হতে দেখি। কবি হিসেবে শহর হবার জন্য গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেও 'urbanisation of rural life'এর তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তাই লিখেছিলেন "হাতে আছে কেবলি নগর, ঘর এবং/গ্রামগঞ্জের পথ নয়।"

জনবিরোধী মোড়ে এখন যেখানে দেশ বিনিময় শীতল সে সময় সেখানেই ছিল 'দেশী বাড়ে।' যেদিন ট্রাম দুর্ঘটনা হয় সেদিন ওখানে গিয়েই রাস্তার একপাশে অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দিয়ে কবি ট্রামের নিচে পড়েন এবং কয়েকদিন পরে শম্ভুনাথ হাসপাতালে তিনি মারা যান। "দেশী বাড়ে"-এর উল্টো দিকে মোড় থেকে অনেকটাই পশ্চিমে এবং মোড়ের ট্রাম লাইন থেকে অনেকটাই দূরে। সাধারণত ওখান দিয়ে তিনি কখনই রাস্তা পার হতেন না। আমি কতবার তাঁকে রাস্তা পার হতে দেখেছি। প্রত্যেকবারই মোড় দিয়ে এবং সবসময় চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে। দুর্ঘটনার দিন আলো ছিল বাড়ী অশোকানন্দের বাড়ির সামনে ট্রামলাইন পার্কের সামনের রাস্তার সাতকড়িবাবুদের বাড়ি পেরিয়ে ছুটেছিলেন অশোকানন্দের বাড়িতে। বাড়িতে সকলে নিরাপদে আছেন কিনা তাই দেখতে গিয়েছিলেন জীবনানন্দ। তিনি নিজেও ধুতি পরে ট্রাম দুর্ঘটনা কবলে পড়েন, তার এই দুটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়। দুর্ঘটনার মাত্র কদিন আগে তাঁর রেডিওতে কবিতা পাঠ ছিল। সঙ্গে কট্টর, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আরও কয়েকজন সেখানে কবিতা পড়েন। জীবনানন্দ যে কেমন কাপড়ের জুতোটি পরতেন তা ছিঁড়ে গিয়েছিল। ফলে আঙুলটি প্রায়ই বেরিয়ে পড়তো। রাশভারি কোন সুধীরা দত্তকে কবি "বুড়ি" বলেই ডাকতেন। সেদিন অনুষ্ঠানে (তখন Live programme হতো) তাকে আসে বিকেলে সুধীরা এসে জীবনানন্দ বললেন "বুড়ি, আমার তো জুতো ছেঁড়া। সুধীনবাবুরা তো স্যুটবুট পরে আসবেন, আমি কি এ জুতো পরেই রেডিওতে কবিতা পড়তে যাবো?" কোন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পাম্পসু কিনে এনে দিয়েছিলেন গড়িয়াহাটের মোড় থেকে। নতুন চকচকে জুতো জোড়া পড়তে পরতে এই ভয়ে সেদিন টিকিটেওই রেডিওতে গেলেন কাটি দিয়েছিলেন কবি। পোষাক দিকে জীবনানন্দের খোঁচা একটু টাক উঁকি মারতে শুরু করেছিল। জীবনানন্দ বাড়ির যেন দুদিকে পেছনের চুলটা একভাবে আঁচড়ে দিতে বলেছিলেন যেন তার টাকটা দেখা না যায়। এতদিনের দেখেছি তিনি নিজেও চুল আঁচড়াতেন খানিকটা সময় নিয়ে। জীবনানন্দ রোজ রোজ সুখী ছিলেন। দুপুর আসে সাদাসিধে ছিলেন। এ সময়েই একদিন "দেশী বাড়ে"তে বসে (এর সাথে একটি বিলিতি মোকাম ছিল) তাকে ডালমুট খেতে দেখেছি। জীবনানন্দের খাওয়া ছিল অদ্ভুত। একসাথে এক একটি ডালমুট টপ করে মুখে দিতেন। যেন সেটি কখনই অন্য কেউ তোটটি সরিয়ে নেবে। একদিন আমাকে ডেকে আমাকে বলছিলেন, ভালো জল লিখতে গেলে জল অদ্ভুত অন্যায়। (রবীন্দ্রনাথের জন্য অনেক কিছু বাংলা বাদল ছিল) তবে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মতো থাক। রবীন্দ্রনাথের কবিতা কত ওরা ছিল লক্ষ্য করেছেন আপনি?" জীবনানন্দ চুপ করে গেলেন। আমাকে নিয়মে কথাপ্রসঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েরা যেমন মানুষ হয়ে থেকে পারছে না সেটা তাকে পীড়া দিত। এই রবীন্দ্রনাথের কথাই অন্তরে তাঁর দুঃখ জাগিয়ে রেখেছিল। দুঃখের সান্ত্বনা দিতে হয়েছিল অবজ্ঞার ওষুধের মতো জিনিস। সুদেষ্ণ এই কবির শেষ কবিতের প্রায় শান্তনুর সঙ্গী ছিলেন। তার 'অনুপম' বইটিতে শেষ কবিতের আবহাওয়া ধরা আছে।

আমি ইচ্ছে করেই জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে কোনও আলোচনায় প্রবেশ করলাম না। কেননা এর আগে ও বছরই প্রকাশিত একাধিক লেখায় তা করেছি। শুরু থেকে তাঁর কবি জীবনের অন্তিম তার সঙ্গে আছেন তারা তো জানেন জীবনানন্দের কাব্যালোচনা একটি এক ব্যাপক বিষয়, তার জন্য সমালোচনার এক বিপুল পরিসর দাবি করে। এ বছরেই কেন অন্ততঃ আলোচনাগ্রন্থ অসংখ্য প্রবন্ধ পুস্তিকা এবং ছোটো বড়ো সমস্ত কাগজেই জীবনানন্দের ওপর বহু বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। যা অনেক ক্ষেত্রেই সত্যিই পাঠকপ্রিয়। কোনও বিশেষ লেখকের শতবার্ষিকীর সময় আমরা বাঙালি পাঠকেরা মেতে উঠি। রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ অবধি এই একটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করে আসছি। যেমন লেখকের ওপর আলোচনা বিশ্লেষণ বড় বড় হয় সমৃদ্ধ হয় সাহিত্যের দিকটি। অভিজ্ঞতায় দেখেছি অনেক পাঠক লেখকই কি মনন প্রতিভায়, কি মনোসমীক্ষণে সময়কাল থেকে অনেক অনেক এগিয়ে থাকেন। পরবর্তী প্রজন্মই পরে কোনো ঘটনা দিয়ে লেখককে নতুন আবিষ্কারের আলোয় উদ্ভাসিত করেন। "মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়" কথাটি সন্দেহ নেই অক্ষত সার্থকতা হবে এটা। মানুষ জীবনানন্দকে আমার চেয়েও অনেকেই আরও অনেক বেশি কাছের মানুষ করে তুলতে পেরেছিলেন। যদিও আত্মীয়স্বজনের বাইরে তার সংখ্যা নিশ্চয় অনেক কম। দু হাতের কর্ণাঙ্গুলি সংখ্যা। একদিন হঠাৎ দুপুর কবিতার আকস্মিকেই আমি প্রথম তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রত্যেক কবিই তো প্রথমে মানুষ তারপরে কবি। ঐ যে কটি বছর তাঁকে কাছ থেকে দেখেছিলাম, মনে হতো মানুষ নিয়ে এক বিশাল জগৎ বাড়ের সামনে বসে আছি, যতটুকু প্রত্যক্ষতার চেয়ে অনেকটাই বেশি নিরব ও আত্মগোপনতা। যে অনিশ্চয়তা তাঁর অন্যমনস্কতার জন্ম দিয়েছিল, যে অন্যমনস্কতা তাঁর জীবনকে অকালে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে দিল সেই অনিশ্চয়তা, বেদনা, সমস্ত সৃজনশীল মানুষেরই এক অনিবার্য নিয়তি। তবু রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতার প্রধানতম কবি জীবনানন্দ আমাদের যেখানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন, আগামী একশো বছরেও কি আরেকজন তুলনীয় কবি আমাদের হবে আসবেন? কবির প্রতিভা দিয়ে লেখা শেষ করতে হয় না, তাই শতবর্ষে কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবার্ষিকীর উৎসব এই বাংলায়। একমাত্র কবিতা কমাই তো পুনর্জন্ম ঘটানো যায়।

জীবনানন্দ : বন্ধুমণ্ডলী

প্রভাতকুমার দাস

'জীবনানন্দর চরিত্রে এক' দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিলো—যে মহিমান্বিত আত্মগুপ্ততা তাঁর কবিতা, তা-ই যেন অনুবাদিতেও দিয়ে থাকতো সব সময়—তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি, অন্তরঙ্গ অন্য কোন পরিস্থিতিতেও না। এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন; তিন বা চার বছর আগে সন্ধ্যাবেলা লেকের দিকে তাঁকে বেড়াতে দেখতাম—আমি হয়তো পিছনে চলেছি, এগিয়ে গিয়ে কথা বললে তিনি খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন, আলাপ জমতো না; তাই আবার দেখতে পেলে আমি ইচ্ছে করে পিছিয়েও পড়েছি কখনো কখনো, তাঁর নির্জনতা ভাঙতে চাইনি।' —জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে, তাঁর সম্বন্ধে এরকম অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন তাঁর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু। বলা যায়, প্রায় কুড়ি-সাতাশ বছরের পরিচয় তাঁদের, ঢাকার উজ্জ্বল হাতে হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা যখন মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন বন্ধু অজিতকুমার দত্তর সঙ্গে, তখন থেকে। পাঁচ বছর আগেই সম্ভবত জীবন শেষ হতে সম্ভাবনা শুরু করেছেন, দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও, তখন এই যুবক ছাত্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'প্রগতি'তে লিখেছেন একটির পর একটি কবিতা। বছর তিনেক পরে, ঢাকার রামমোহন লাইব্রেরিতে জীবনানন্দ-র বিবাহ-বাসরে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এই যুবক কবি বন্ধু। 'প্রগতি'র পরে যখন 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশিত হল, তখনও বুদ্ধদেব-এর কাছে জীবনানন্দই প্রধানতম কবি। বাংলা পত্র-পত্রিকার জগতে তাঁর কবিতাগুলির প্রথম পর্বের আনুপূর্বিক বর্ণনার সময় তিনি একটি পত্রে প্রাবন্ধিক লেখককে জানিয়েছিলেন 'বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' এল নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে প্রগতি ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা বেশ বেশি আদর নিয়ে উপনীত হয়েছিল। সে কবিতাগুলোর হয়তো বুদ্ধদেবের ততো আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়.....আমার কবিতার জন্য বেশ বড় স্থান দিয়েছিলেন তিনি প্রগতিতে এবং পরে কবিতায় প্রথম দিক দিয়ে।' সেই বুদ্ধদেব-এর সঙ্গে বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ হওয়ার কোনও সুযোগ ঘটেনি। পারস্পরিক অনুরাগের প্রকাশ পরিলক্ষিত হলেও উভয়ের মধ্যে নিবিড় সখ্যের সম্পর্ক তৈরি হয়নি কোনও দিন। আসলে বন্ধু হিসাবে একটা নিজস্ব ধারণা ছিল জীবনানন্দর, যখন-তখন যে কোনও মানুষের সান্নিধ্য সহজভাবে গ্রহণ করতে পারতেন না।

জীবনানন্দ-র প্রয়াণের পর তাঁর নির্জনতার প্রসঙ্গ তুলে এক স্মৃতিচারণায় অশোকানন্দ দাশ লিখেছিলেন 'তিনি নির্জনতাপ্রিয়, লোকের সঙ্গে মিশতে চান না, এ-রকম একটা কথা মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল। সন্দেহ নেই, তিনি লাজুক স্বভাবের ছিলেন। কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে, তিনি সব সময় নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন। বহু লোকের কাছ থেকে বহু আঘাত পেয়েছিলেন, অনেক জ্ঞানপাপী তাঁকে যথার্থ মূল্য দিতে নারাজ, এমন একটা ধারণাও বোধহয় তাঁর ছিল। সুতরাং অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সকলেই তাঁর কাছে 'suspect' হয়ে থাকত। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের কপাট বন্ধ করে যদি কেউ একবার ঢুকে নিতে পারত, সেই সুজনকে সকলের তিনি আপনই পেতেন। সকল দিক বদলে নিয়েছেই তাকে আত্মীয় করে নিতে পারতেন।' আলোচনা প্রসঙ্গেই অশোকানন্দ, বুদ্ধদেব বসুকে লেখা জীবনানন্দর একটি পত্রের বা নিবন্ধের উদ্ধৃত করেন, যেটি তাঁর কবি-স্বভাবের একটি অভ্যাসের দিককে স্পষ্ট করে তুলতে পারে। প্রকৃত বাস্তববোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তিনি মনে করেছিলেন 'কলকাতার জটিলতা মানুষের চাহিদার বহরে বাড়ে বটে, কিন্তু কলকাতার দৈনন্দিন জীবনে একটা প্রাত্যহিক

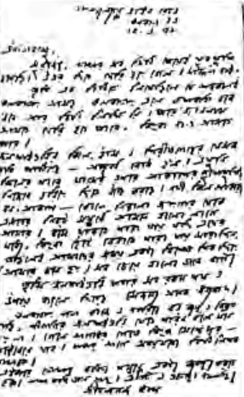

[illegible]

যাতে বৃত্তি পাওয়া যায়; এখন যখন জীবনে কর্মব্যস্ততার যেন প্রয়োজন, কলকাতার এই স্বাস্থ্য পটভূমির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হয়ে না যায়।'

'কল্লোল' পত্রিকায় তৃতীয় বর্ষ একাদশ সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩৩২) 'নীলিমা' কবিতাটি প্রকাশের মুহূর্তে তিনি আধুনিকপন্থীদের দলভুক্ত হয়ে গেছিলেন অচিন্ত্যদের মতো। কবিতাটি পাঠ করে অতিআধুনিকদের অন্যতম পথিকৃৎ অচিন্ত্যকুমার তাঁকে একটি চিঠি দিয়ে অভিনন্দিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, 'এক টুকরো নীল আকাশের সারল্যের মত', 'নীলিমা' কবিতাটি পাঠ করে অচিন্ত্যকুমারের মন যে অপরিচিত খুশিতে ভরে উঠেছিল, তার প্রত্যক্ষ-প্রমাণে অচেনা এই লেখককে [illegible] বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাসায় গিয়ে সংবর্ধনা জানিয়ে এসেছিলেন। অনেকটা 'কল্লোল'র প্রতিনিধির মত সেই দেখা-সাক্ষাৎ। অচিন্ত্যকুমার বুঝতে পেরেছিলেন, 'বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ নতুন স্বাদ নিয়ে এসেছে; নতুন চেতনা। নতুন ছন্দ, নতুন চিন্তা, কোনোটিই কারো থেকে ধার করা চলতি মাটি নয়, সে একটি নতুন নিঃসঙ্গ নদী।' এ প্রেম অচিন্ত্যকুমার-প্রেরিত পত্র পাঠ করে সেদিনই জীবনানন্দ তাঁকে লিখেছেন: 'আমার কবিতাটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া নয়, একজন যথার্থ সৌন্দর্য পূজারীর সাথে পরিচিত হইবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাইয়াছি বলিয়া।' অন্য দিকে, 'কল্লোল'-এর একই সংখ্যায় অচিন্ত্যকুমারের 'বাসরবাত্রি' কবিতাটি জীবনানন্দকে অভিভূত করেছিল, চিঠিতে তাঁর 'রচনায় অতুল সৌন্দর্যে মুগ্ধ', এ কথা জানাতে গেলে তিনি আনন্দ বোধ করলেন: 'ফাল্গুন মাসের কল্লোলে আপনার 'বাসরবাত্রি' কবিতাটি কি যে মনোমুগ্ধকর হইয়াছে এতদিন কথা আপনাকে জানাইবার তরসা এতদিন আমার ছিল না। আজ আমাকে সে অধিকার কাড়িয়াছে বলিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি।'

বরিশাল থেকে ফিরে, জীবনানন্দের পরবর্তী ঠিকানা হয় হ্যারিসন রোডের প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ 'কল্লোল'-এর নাগালের মধ্যে। অচিন্ত্যকুমার 'কল্লোল'-এর অফিসের আড্ডায় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে, মধ্যে মধ্যে জীবনানন্দের 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য' 'অনুবাদ শীর্ষক' উপলক্ষে কথার জন্য আসতেন। জোর করে দু-একদিন 'কল্লোল' অফিসে টেনে নিয়ে গেছেন অচিন্ত্য, কিন্তু জীবনানন্দ তাতে একটুও অভ্যস্ত হননি, 'সুর মেলাতে পারেননি সম্পূর্ণ।' যেমন তিনি তাঁর মানু থেকে চলিতে পরিণত হয় দুটি পত্র থেকে, যেমন তিনি সম্বোধন ও প্রথম পত্রের 'সবিনয় নিবেদন' থেকে দ্বিতীয় পত্রে সুপ্রিয়বাবু তৃতীয়তে 'প্রিয় বন্ধু' হয়ে আর কিছু পরে 'ভাই অচিন্ত্য'-তে পরিণত হয়েছিল। এমনকি হয়তো নিবিড় বন্ধুত্বের সূত্রে আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসতেও বেশি সময় লাগেনি উভয়ের। তা ছাড়া, অচিন্ত্যর বন্ধুত্বের উষ্ণ মনে জায়গা দেখা দিয়েছিল, কলকাতায় তাঁর প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে ধীরে। জীবনানন্দ তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে এই সংযোগ স্বাদ পেয়েছিলেন বলেই হয়তো সহজে মনে তা না হারিয়ে যায়, তার জন্য বরিশাল থেকে লেখা একটি তারিখবিহীন পত্রে নিজেকে বঞ্চিত বোধ করেছেন: 'সারা দিন পাখি আমার এই টিনটিনে বুকি জীবনটি দপ্ করেই নিয়ে যাচ্ছে; অন্তত—আসছেন কিসের? আপনাদের নব-নব সৃষ্টির জোগানের ভেতর আলো ফুটে পর তো—আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে সমতার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব না তো। সেই তো সবচে। আমার হৃদয় যে বাঁশী বেজে যাচ্ছে, —তোমার, বন্ধুর বুকে তা সানাই থেকে বাজছে—আমার যেখানেই বাঁশি নিয়ে গেল, বন্ধুর অনির্বাণ প্রদীপে পথ দেখে চলছি—এর চেয়ে তৃপ্তির জিনিস আর কি থাকতে পারে।' একটি পত্রে তিনি আরও লিখলেন, 'চারিদিকেই বে-দরদীর ভিড়। আমরা যে কটি সমানধর্মা আছি, একটি নিরেট সংযোগ মিলন-সূত্র দিয়ে আমাদের গ্রথিত করে রাখতে চাই। আমাদের যেমন পয়সা কড়ি নেই বলে জীবনে

'creature comforts' জিনিসটা হয়তো কিছুটাই আমাদের এড়িয়ে যাবে। কিন্তু এক সঙ্গে দেনার অভাব থেকে আমরা যেন বঞ্চিত না হই—সে সব বড়ো শব্দহীন, আত্মশক্তিই কারাভার যেন না থেকে।'

অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব কতটা নিবিড় ছিল, তা বোঝা যায় তাঁকে লেখা চিঠিপত্রে নিজেকে অকপটে মেলে ধরার চেষ্টা দেখলে। তিরিশ তারিখবিহীন একটি পত্রে তাঁর আবেগ ধরা পড়েছিল এক আবেগময় ভাষায়, জীবনানন্দ লিখেছিলেন : 'আমার এসে ফিরে যাচ্ছে কিন্তু বর্ষার কোন লক্ষণই দেখছিনে। মাঝে মাঝে নিতান্ত 'নীলোৎপল আছিদ্রিত ক্ষুদ্র প্রাচুর্যহীন-সজ্জিতঃ' মেঘমালা দূর দিগন্তে ভেসে যেতে চোখের চাতককে দু দণ্ডের তৃপ্তি দিয়ে যাচ্ছে। তারপরই আবার অনন্ত 'cerulean vacancy' তারকাখচিত চিৎকার, পাতৃচিত্র—পাখিদের পাখার ঝটপট, যৌবনহীন গুঞ্জন—উদাস বাতাস বিরাজ দুপুরটাকে আরো নিবিড়ভাবে জমিয়ে তুলেছে।' লিখেছেন : 'চারিদিকে সবুজ বনশ্রী, মাথার উপর মেঘের সারি, বাতাসবিধ ঝড় আর কান্না। মনে হচ্ছে যেন মরুভূমির সর্বকিছুর ভেতর বসে আছি, দূরে-দূরে আলোর দ্যুতি হচ্ছে। আমার তুখানি চিঠিকে কখন যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।.....এবং কোথেকে কত কি প্রাণ এসে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় একেবারে কোনখানে নিরুদ্দিষ্ট চিত্তে। সারাটি দিন,—অনেকখানি রাত— কোথাকারটির মানুষ।' এই চিঠিটি লেখার সময় জীবনানন্দ সিটি কলেজের তরুণ অধ্যাপক, আর অচিন্ত্যকুমার ইংরেজি সাহিত্যে এম এ-র জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

অচিন্ত্যকুমারকে অত্যন্ত কাছের মানুষ ভাবতে পেরেছিলেন, যে জন্য তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিলেন জীবনানন্দ। সাহিত্য-জীবনের শুরুতেই এই সংযোগ তাঁর কাছে 'বিধাতার কৃপা' বলে ঠেকেছিল তিনি। যৌবনে বন্ধুত্বের তীব্র আকর্ষণে অচিন্ত্যকুমারকে লেখা পত্রে তিনি ঘোষণা করেছিলেন : 'বেদনাতুর দেশে জন্মেও আমাকে স্বপ্ন দেখা তো দূরের কথা, হাসার ভেতরই আমি কান্নাকে ফুটিয়ে তুলতে চাই।' অথচ বাইশ-তেইশ বছরের এই ঘনিষ্ঠতায় হয়তো সামান্য ফাটল ধরে থাকবে কোনও কারণে, কেন না অনেকদিন পরে আবার পত্র জীবনানন্দ একটি পত্রে, অচিন্ত্যকুমারের কাছে নিজের মনন-হৃদয়ের একটা চিত্র স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন। নিজেরই অভিমানের কথায় সে পত্রের সূচনা করেছিলেন : 'আমি ভেবেছিলুম তুমি দূর হয়ে যাচ্ছ। এখন মনে হচ্ছে তুমি তোমার ঠিক জায়গাতেই আছ। তোমাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া কত গভীর তা-তুমিই জান; মাঝে মাঝে আমরা দুজনে সেটা একটু আধটু ঘুমিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু অন্তঃশীল অমলতা ঠিকই আছে। স্বভাবতই মন তোমার দিকে আমাকে টানে—দূরে থাকলে বেশি টানে। কাছে এসে পড়লে তোমার জিজ্ঞাসা ও যৌবনারোহ জোর—মাঝে মাঝে সেটা বড়ও বটে—সেই জোর দেখে টের পাই সাংসারিক সফলতা ও গদ্য জগতের ব্যাসমণ্ডলায়

[illegible]

তুমি সত্যিই বেশ দুর্বার, আজকাল বন্ধুর মত সার্থক। কিন্তু আত্মবিজয়া ও রিক্ততার কাছে চেয়েই কম নও। তোমার কাছে গেলে তোমাকে আমি সব সময় ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারি না, (সেটা আমারই দোষ)—কিন্তু দূরে থেকে তোমার মন খাঁটি সোনার মত এসে দেখা দেয় আমার কাছে; বুঝতে পারি এই অপূর্ব অভিজ্ঞা হলেও এইটেই ঠিক স্বরূপ। খুব ভালো হত কাছেও যদি তোমাকে ঠিক এরকম ভাবে পেতে পারতাম। তাহলে আজকের সাহিত্যিকদের ভেতর শুধু তোমার মতো দু-একটা বন্ধুকে নিয়ে জীবনের বহিরাশ্রমের ভূমিতে খুব কৃতিত্বার্থতা পাওয়া যেত।' প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, এই পত্র লেখার সময় অচিন্ত্যকুমার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁর সুখ্যাত 'কল্লোল যুগ' শীর্ষক স্মৃতিকথা লিখছিলেন। এই রচনাটিতে মুলত কল্লোল যুগের লেখকদের যৌবন বয়সের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী আকর্ষণীয় প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছিল। সেই রচনাটির প্রসঙ্গ তুলে, জীবনানন্দ হয়তো তাঁর বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে অচিন্ত্যকুমারকে পরোক্ষভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই স্মৃতিকথায় যেন তাঁরও একটা অংশ স্বীকার করা হয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর এক স্মৃতিকথায় জীবনানন্দের নিঃসঙ্গচারিতার প্রসঙ্গ তুলে জানিয়েছিলেন 'পাঁচ মিনিট দূরে থেকেও 'কল্লোল' আপিসে তিনি আসতেন না, কিংবা কদাচ আসতেন, অন্তত আমি তাঁকে কখনো সেখানে দেখিনি।' অচিন্ত্যকুমারকে স্বয়ং জীবনানন্দই পুরাতন প্রসঙ্গ তুলে পূর্বোক্ত পত্রে লিখেছেন : 'কল্লোলের সেই কাটায় আমি দু-একবার নয়, দুপোরার তো গিয়েছি ঠিকই; তুমি বিকেলের দিকে আসতে—আমি সকালের দিকে যেতাম। দীনেশরঞ্জনকে সব সময়ই দেখতাম, মাঝে মাঝে নৃপেন থাকতো। তুমি Presidency Boarding-এ প্রায়ই আসতে বেড়াতে বেড়াতাম রাস্তায় যৌবনটি দিকে প্রায়ই। অনেক কথা মনে

পড়ছে—অন্তহীন অনবদ্যহীন দিন আর মুহূর্ত।' এই প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এর রোয়াক কিংবা ছাদে বসে অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর একদার আড্ডায় অংশ নিয়েছিলেন। এই বোর্ডিং-এই বাড়ির সম্ভবত সামনে দেখা গেছে—জীবনানন্দের প্রতিবেশী পরিমলচন্দ্র ঘোষ নিয়োগী মেডিক্যালকে; কাজের কোটি পরে বলায় কষ্টের কাটিয়ে তিনি আসতেন তাঁর সঙ্গে আত্মালোচনার সময় কাটানোর জন্য।

'মনোলোকে যা আছে তা আছে বাইরের পৃথিবীতে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বে নিবিড় হয়ে পৌঁছে যেতে পারতাম যদি এক-আধটা নারী (আমাদের দোষ) জিনিসটাকে কিছু কিছু খণ্ডিত করে না ফেলত।' স্বভাবতই এই মনোজ্ঞ প্রকাশের সূত্রে এই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, একটি পত্রে জীবনানন্দের এই বাহুল্য দোষ স্বীকার করার কী কারণ ছিল, কিংবা উত্তরের হয়ে কী এমন সূত্র তৈরি হয়েছিল যাতে পরবর্তীকালে তাঁকে অনুশোচনা করতে হচ্ছে। তখনও 'কল্লোল যুগ' প্রকাশিত হয়নি, অচিন্ত্য সাহেব দু-বছর পূর্বে একটি চিঠিতে 'কল্লোল'-এর প্রসঙ্গ তুলে জীবনানন্দ সেই যৌবনের দিনগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন : 'কল্লোলের দিনগুলি মনে পড়ে কবিতা। আমি তখন প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ থাকতাম—তুমি প্রায় রোজই আমার কাছে আসতে। আমরা বেড়াতে বেরোতাম প্রায়ই, গাছের তোলাতে বেড়াম, মাঠে মাঠে এসপ্লানেড-এর দিকে। সে সব দিন কোথায় গেল?' এই চিঠি প্রসঙ্গ হয়তো অচিন্ত্যকে মনে পড়েছিল 'দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছি চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে গড়ের মাঠের দিকে, মাঝে ইডেন-বাগানে চা-টা কাটলেট খেয়ে নিয়েছি, জীবনানন্দই খাইয়েছে।' এই চিঠিতেই অচিন্ত্যর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মুহূর্তে, নিজের স্বভাবের একটি দিক সম্পর্কে নিজেই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন : 'কল্লোলের দিনে কোন কোন কারণে মাঝে মাঝে তোমার উপর খুব চটে যেতাম মনে মনে, অথচ আমার সম্পর্কে রাগ-অভিমানের প্রশ্ন ছিল না—তাদের আকর্ষণ আমি বিশেষ জোর করিনি মনে। কিন্তু তুমি নিজেকে আমার নিকটে আনতে পেরেছিলে। এইটেই তোমার বিশেষ গুণ। আমার দোষ আমি সহজে কাটিয়ে বলা দিতে পারি না, কিন্তু তোমার প্রতিভার সুগভীর সরলতা ছিল আলাদা জিনিস। এই শক্তিমত্তা ও তেজ আজকের পৃথিবীতে সব দিকেই সব বিভাগেই বিরল। সাহিত্যে হয়তো আছে, কিন্তু যে মানুষ তা সৃষ্টি করে সে অধিকাংশ প্রায়ই মানুষ নয়। তোমাকে আমি বড় সাহিত্যিক (বিশেষতঃ তোমার বড় উপন্যাসগুলি পড়বার পর) এবং আজকের দিনে যাদের প্রায়ই দেখিই না সেই বর্ণচ্ছটা, কাজের মানুষ বলে মনে করি।'

পরবর্তীকালে এরকম কাজের মানুষ মনে করেছেন, 'পূর্বাশা'র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে। শুধু সাহিত্যিক বন্ধু নয়, যেন পারিবারিক প্রয়োজনেও তাঁর প্রতি নির্ভর করার ভরসা পেতেন 'বেশি ঠেকে পড়েছি, যে জন্য বিরক্ত করছে হল আপনাকে। এর্পুণ এখন পাঁচশো টাকা দরকার; দয়া করে ব্যবস্থা করুন।' কবিতা দিয়ে বা লেখা অথবা প্রভৃতি সম্পাদকের কাছে প্রতিদিন না হলে হতে পারে, সে জন্য জানিয়েছিলেন সঙ্গত হলে প্রবন্ধ লিখবেন, গল্প না হলে উপন্যাসও লিখবেন। এমনকি কার্তিক কিংবা অগ্রহায়ণ মাস থেকে ধারাবাহিক জীবনস্মৃতি লিখবেন 'পূর্বাশা'য়। এবং একবার জানালেন উপন্যাস লিখছেন, 'নিরুদ্দেশ বাড়ে নয়—হয়তো।' এই সব প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয় নি বটে, কিন্তু টাকা এগুলি হাতে চাই। তার সঞ্জয় ভট্টাচার্য কত কবি এ সম্পাদকের সঙ্গে এই প্রাপ্য দাবি নিয়ে উৎসাহিত উত্তরে কারণ হিসেবে জানালেন : 'আমাদের দেশে দু চারজন বিশ্বস্ত সাহিত্যিককে এরকম দাবি প্রাপ্য করবার মতো বিচার বিবেচনা অনেক দিন থেকে আপনারা দেখিয়ে আসছেন—সে জন্য জানাচ্ছি।'

জীবনানন্দের সঙ্গে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রথম আলাপের সূত্রপাত ঘটেছিল, 'নিরুক্ত' পত্রিকায় 'জীবনানন্দ দাশ' শীর্ষক একটি নিবন্ধের সূত্রে, সঞ্জয় লিখিত সেই রচনাটির মাধ্যমে 'বরিশাল ও কলকাতার মধ্যে সেতু' রচিত হয়েছিল। জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রথম 'হাতে কলমে' সাক্ষাৎকার অভিজ্ঞতার কথায় তিনি জানিয়েছিলেন; সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম সাক্ষাতে অবশ্য বেশি সময় আলাপ হয়নি। কিন্তু আমার পরে ওঁদের মনে হয়েছিল, যে জীবনানন্দ বাংলার কবিতা তাঁরা পড়েছেন, 'ইনি সেই জীবনানন্দ দাশ হতেই পারেন না'। প্রেমেন্দ্র মিত্র অবশ্য এই অভিজ্ঞতার কথা শুনে বলেছিলেন, 'ওই জীবনানন্দ, কবিতা লেখার সময় ওর চেহারা আদ্যন্ত বদল হয়ে যায়'।

জীবনানন্দ তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছর নানা দুশ্চিন্তায় বিপর্যস্ত ছিলেন, নিশ্চিত কোনও কাজের সন্ধানে, নিরুপায় বাসস্থানের অনুসন্ধান নিয়ে বিভ্রান্তকর পরিস্থিতির মধ্যে পারিবারিক অসুস্থতা। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপর তখন অনেক নির্ভর করতেন তিনি। নিজের নানা সংকটের কথা জানিয়ে প্রকাশের মাস তিন-চার পূর্বে 'পূর্বাশা'র সম্পাদককে লিখেছেন : আপনারা কি কবির সাহেবকে আমার কথা বলেছিলেন? বাড়ি নিয়েও বড় দুশ্চিন্তায় আছি। তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করব? এসব বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আলোচনা করতে পারি, কিংবা আপনি চিঠি লিখেই জানাতে পারেন। খুব জরুরি। 'কবির সাহেব' বা 'তারাশঙ্করবাবু'র বিষয়ে অন্যান্য উৎকণ্ঠার আগ্রহ অনেকের কাছে মনে হতে পারে আকস্মিক পুরস্কারের বিষয়ে প্রভাবিত করবার প্রচেষ্টা, কিন্তু সঞ্জয় এই প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে পুরোপুরি স্মৃতিচারণে লিখেছেন; 'এ চিঠি থেকে যে-জীবনানন্দ উঠে আসছেন, তিনি আকাশপথি প্রাইজের উমেদার নন। তিনি নিঃসম্বল না—শুধু সন্ধানী। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বন্ধুর পথে চলতে, তেমন বন্ধু কেউ নেই। চিঠি পাওয়ার দিনে জীবিত জীবনানন্দের এই ছবিই আমার মনে জেগে উঠেছিল'।

১১

আবাল্য থেকেই জীবনানন্দ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ছিলেন এমন বলা যায় না, কেননা সর্বানন্দ ভবনের বৌথ পরিবারের মধ্যে কাটিয়ে তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে প্রাণের বন্ধুদের সাহচর্যে। বাড়িতে তাঁর মা, জীবনানন্দর কাপিসে সহপাঠী বন্ধুদের ডেকে এনে খাওয়াতেন, বাড়ির সামনে একটি আনন্দিত পরিমণ্ডল গড়ে উঠত। খেলাধুলোর প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল, বাড়ির সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে খেলার মাঠ তৈরি করেছিলেন। তবে সহপাঠী বন্ধুদের চেয়ে নিজের ছোটভাই অশোকানন্দর সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি। অশোকানন্দ তাঁদের শৈশবে জীবনানন্দর মনোভঙ্গির কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন 'আমাদের বাড়ীতে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ছিল। বরিশালে বৃষ্টির অভাব হয় না। মাটি থেকে রস গ্রহণ করে সারা বৎসর কি গ্রীষ্মে, কি শীতে সেই নরম সবুজ ঘাস সতেজ থাকতো, একটু বড় হলে বাতাসে আন্দোলিত হোত। এমন সবুজ সুন্দর ঘাস বনে হয় আর কোথাও দেখিনি; মায়ের কোলের মতো নরম ছিল। দাদা সেখানে বসে আমাদের আলোচনা করতে ভালবাসতেন; বিশেষ করে নিজের প্রিয়জন, অথবা প্রিয় বন্ধু কেউ যদি থাকত।' অশোকানন্দই জানিয়েছেন, অনেক বয়স পর্যন্ত ঘাস খেলার প্রতি তাঁর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে সে খেলায় নিজেকে সহজে খুলে ধরতেন যেন।

বেশি বয়সে, পড়াশোনার পাট চুকিয়ে যখন সাহিত্যচর্চাকেই অন্যতম অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন তখন, কল্লোল যুগের অনেকের সঙ্গেই তাঁর নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, যদিও একমাত্র অচিন্ত্যকুমারের কাছে নিজেকে স্বচ্ছন্দে মেলে দিতে পারতেন। অচিন্ত্যর বন্ধুত্বের রস-রসিকতাকেও তিনি অত্যন্ত সহজেই গ্রহণ করতে পারতেন। অচিন্ত্যর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে দু-একটি মজার কাহিনীও আছে। অচিন্ত্যকুমার তখন খুলনার মুন্সেফ। সেখানে সূত্রে আমুল কাকার শামসুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে, যিনি জীবনানন্দর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। একবার শামসুদ্দিনের আতিথ্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে বরিশালে উপস্থিত হয়েছিলেন অচিন্ত্য। স্টিমারঘাটে পৌঁছেই জীবনানন্দর খোঁজ নিলেন অবশেষ এখন কাছে, তাঁর উপর অচিন্ত্যকে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়েছিল। অবশেষ রিক্সায় করে তাঁকে সর্বানন্দ ভবনের সামনে নিয়ে গেলে, রিক্সা থেকে হাত বাড়িয়ে নেমে 'জীবন, জীবন' বলে ডাকতে ডাকতে বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করলেন অচিন্ত্য। খালি গায়ে বেরিয়ে এলেন জীবনানন্দ। অচিন্ত্যকে দেখে অনেকটা চমকিয়ে গেছেন তিনি, কিছুটা অপ্রস্তুতও। অচিন্ত্য সেই অবস্থাতেই তাঁর সঙ্গী হতে বললেন, জীবনানন্দ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কোনও

[illegible]

রকম সামলে একটা জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে অচিন্ত্যর সঙ্গে রিক্সায় উঠলেন, অবশেষ আর একটা রিক্সা নিয়ে তাঁদের পেছনে পেছনে অনুসরণ করলেন।

যথারীতি আপ্যায়িত হওয়ার পর, শামসুদ্দিনের বাবা এক প্যাকেট সিগারেট এগিয়ে দিয়ে জীবনানন্দকে বললেন 'বাও সিগারেট খাও।' অচিন্ত্য ঘাড় নেড়ে জানালেন তিনি এখন সিগারেট খাচ্ছেন না, ছেড়ে দিয়েছেন। জীবনানন্দ যেন আকাশ থেকে পড়লেন অচিন্ত্যর স্বীকারোক্তি শুনে—'সিগারেট পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন, অচিন্ত্য?' তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে, কিছুক্ষণ বাদে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'সিগারেট ছেড়ে দিয়েছ?' 'সব কিছু ছেড়ে দিয়েছ?' অচিন্ত্য কয়েকবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আপনমনে একটা ডাইন ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন। তারপর উপস্থিত সকলকে অবাক করে দিয়ে প্যাকেট থেকে নিজেই একটা সিগারেট বের করে মুখে দিলেন জীবনানন্দ। 'তাহলে আমিই একটা খাই'—অনভ্যস্ত হাতে কোনও রকমে দেশলাই কাঠি জ্বেলে সিগারেট ধরালেন অথবা কেউ ধরিয়ে দিলেন। বোঝাই যায় সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত; নাকের ডগায় জ্বলছে সিগারেট—আর এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করে নিজেই যেন কিছুটা অপ্রস্তুত, অচিন্ত্যর দিকে তাকিয়ে সেই একই প্রশ্ন করতে করতে তাঁর সেই বহু পরিচিত শব্দের হাসি হেসে, কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে, অবশেষে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

দীর্ঘকাল মফঃস্বলবাসী হলেও, সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত যে কোনও বয়সের পাঠকের সঙ্গে সংযোগে তিনি বিশেষভাবে উৎসাহিত বোধ করতেন। সমকালীন সুখ্যাত সাহিত্যিক কিংবা সমালোচকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব মধুর ছিল বলা যায়

না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর প্রমুখ গুণীর মতো কবি ও সমালোচকরা তাঁর রচনার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি বলা যায়। যদিও তাঁর লেখার প্রতি বিষ্ণু বিশেষ মনোযোগ পোষণ করতেন। কিন্তু যে রচনা তাঁর লেখা 'পরিচয়' এ কিংবা পরবর্তীকালে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংঘের উদ্যোগে প্রকাশিত 'কেন লিখি' পুস্তিকার জন্য সংগ্রহ করেছিলেন।

অথচ জীবনের শেষ সময়, তাঁর তরুণ পাঠকদের কাছে কীভাবে গৃহীত হচ্ছেন সে বিষয়ে জানার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল পোষণ করতেন। কোথাও কোনও তরুণ আগ্রহের লেখায় জানতে পারলে নিজেকে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করতেন। তাঁর যে সাময়িক পত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে যে তিনটি চিঠি সম্পূর্ণ অচেনা এক যুবককে লিখেছিলেন, তিনি তখন সেন। সদ্য অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কিন্তু কবিতার বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত ধারণা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। নিজের কবিতা বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে এমন কোনও অচেনা পাঠকের মনোযোগ জানতে পেরে তাঁকে, অর্থাৎ সেই যুবককে পত্রে লিখে জানিয়েছিলেন : 'আপনার চিঠির জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার চিঠি পড়ে বুঝতে পারা যায় যে সাহিত্যের বিষয়ে এই বয়সেই আপনার রুচিবোধ ঘটেছে। প্রকাশ অবশ্য অবস্থা যেন গড়ে উঠেছে। লেখা ছাপিয়েছেন কোথাও? যুব কাজি—সব পত্রিকা বা লেখকদের নাম আমার চোখে পড়ে না। আমি আপনাকে নানা রকম ছাপা বিশদভাবে লিখে জানাতে অনুরোধ করছি। আমার কবিতার বই আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি বিস্তৃত সমালোচনার জন্য; অবশ্য এই বইগুলোতে আমার লেখার নিজের প্রায় কোনও কবিতাই নেই। 'মহৎ সংক্রান্তির রাতে' প্রভৃতি অনেক কবিতা পরবর্তী বইয়ে গেছে।......আমার কথা আলোচনা করে আপনাকে জানাতে অনুরোধ করা যদিও আত্মরতি এক রকম, তবুও সাহিত্যের—বিশেষত আমার কবিতা—সম্পর্কে এমন একজন শিক্ষাব্রতী, সুস্পষ্ট বিশেষজ্ঞকে চুপ করে থাকতে দেখলে দুঃখ বোধ করি।' প্রত্যুত্তরের পত্র পাঠ করে তিনি এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে, তাঁকে লিখে জানিয়েছিলেন : 'আপনার চিঠি লেখার ধরনটি সুন্দর ও পরিপাটি। আমরা যখন সবে এম এ পাশ করে বেরিয়েছিলাম এরকম লিখতে পারতাম কিনা সন্দেহ।' পরের পত্রে তাঁকে আরও আন্তরিকভাবে নিজের মনোভাব জানিয়ে অনুপ্রেরণা দিয়ে লিখলেন : 'আমার কবিতা সম্পর্কে আলোচনা আপনি সহজবোধেই শুরু করুন। আপনার সহজবোধ তো অস্বচ্ছ নয়, লিখতে লিখতেই জিনিসটা আপনার দৃষ্টিকোণকে ক্রমশ করে খুলে দেবে। পাণ্ডিত্য নয়, তার চেয়ে বড় জিনিস প্রজ্ঞা আপনাকে সাহায্য করবে। বই পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রজ্ঞা শেষ পর্যন্ত গুণুর একেবারে বিদ্যানিরপেক্ষ নয়। অন্য রকম জিনিস; প্রবীণ লেখকরাই বিবরণ করতে চায় বেশি। আপনি নবীন, কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার সহজবোধের বেশ সার্থকতা রয়েছে যা এখন বোঝা গেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ছোটো কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। এর একটি কবিতা বড় বিতর্কিত বিশ্লেষণযোগ্য নয় নয়। সেই আপনার ভালো লাগে লিখেছেন। এমন বিষয়ে নিজের আত্মবিকাশের পথে চলেই চেতনা জেগে ওঠে, সেটাকে আলোড়ন কাটিয়ে কথা ও ভাষা নির্ভরভাবে কোনদিন হবে ওঠবার সুযোগ পায়। আমি বিচারক পাঠক একজন অন্যদিকে।' বয়সের দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও এভাবে চিঠি লিখেছিলেন, প্রাণের মতো উত্তাপ সম্মান দেখিয়েছিলেন তাকে।

স্মরণ করা যেতে পারে, অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ কিংবা অশোক মিত্র র মতো অনুরাগী যুবকদের কাছে নিজের কবিতার আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়ে দিতে নিজের বাসস্থানে তাঁদের সামনে অকপটে কবিতা পাঠ করে দিয়েছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। 'ময়ূখ' পত্রিকার যুবক কবি-লেখকদের সাহচর্যও নিজের অন্তর্নিহিত আড়ষ্টতা সরিয়ে রেখে তাদের মাঝেই আন্তরিক হয়ে উঠেছেন। সে দলের অন্যতম কবি ভূমেন্দ্র গুহর কাছে নিজের সদ্য প্রকাশিত কবিতার মুগ্ধ হয়ে বিস্ময়াতুর কণ্ঠে নিজের খুশি প্রকাশ করেছেন।

তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছর খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—জলপাইগুড়ির এক তরুণ ছাত্র কবি সুরজিৎ দাশগুপ্তের সঙ্গে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত পত্রাবলীর মধ্যেই সুরজিৎকেই সর্বাধিক পত্র লিখেছিলেন তিনি। কী গভীর মমতায় তিনি এই তরুণ কবিকে গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর চিঠিগুলি দেখলেই বোঝা যায়। জলপাইগুড়ি যাবার আমন্ত্রণের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন: 'জলপাইগুড়ি যেতে লিখেছ। একবার গিয়ে ঘুরে আসতে ইচ্ছা করে। সভা-সমিতি ইত্যাদি সব কিছুর হাত সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে তোমাদের দু-একজনের সাহায্যে হিমালয়, চা-বাগান ইত্যাদি দেখে আসবার লোভ জেগেছে মনে।' পরের পত্রে জলপাইগুড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশের অনেকটি আলোকচিত্র দেখে অভিভূত হয়ে নিজের আনন্দের কথা জানিয়েছিলেন বিশদে: 'জলপাইগুড়ির বিল, হাঁস ও নিসর্গপটের যে-সব ছবি পাঠিয়েছ—অপূর্ব বোধ হল। এগুলি বিলের পাড়ে ঘাসের ওপরে আকাশের মুখোমুখি নিজেকে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। নদী, বিল, পাহাড়, বন, আকাশ—কোনো নিরালা জায়গা থেকে এসবের নিবিড় সম্পর্কে আসতে ভালো লাগে আমার। বসে থাকতে পারা যায় যদি এদের মধ্যে, কিংবা হেঁটে বেড়াতে পারা যায় সারাদিন, তা হলেই আমাদের সময় একটা বিশেষ দিক দিয়ে (আমার মনে হয়) সবচেয়ে ভালোভাবে কাটে।'

চল্লিশের দশকের প্রথম থেকেই যুবকদের সমুহ মতো তাঁর কবিতার ভক্ত পাঠক, বন্ধু, তাঁর কবিতার উচ্ছ্বাস সেভাবে সমর্থন জানাতে পারেননি। তিনি প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন

মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ বলে। সে সময় নিজের সর্বশক্তি দিয়ে সজনি কান্ত লেগেছিলেন সজনী চট্টোপাধ্যায়—তাঁর কবিতার যে দুর্বোধ্যতার প্রমাণ নানা সমালোচকের চোখে নিন্দিত হয়েছিল, সজনী তার বিরুদ্ধে নিজের জোরালো বক্তব্য জানাতে দ্বিধা করেননি। শতাব্দীর দশকের শুরু থেকেই তাঁকে নিয়ে একটা চক্রমণ্ডলী গড়ে উঠেছিল, যাতে তরুণতরদেরই প্রাধান্য। বরং প্রবীণদের মধ্যে অনেকেই সোচ্চার, তাঁর কবিতায় ভুল ব্যাখ্যায় যখন প্রথম নিন্দামুখর, তখন তাঁর প্রতি অনুরক্ত তরুণরা তা প্রতিরোধ করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেই সৈন্যদলে বুদ্ধদেব কিংবা সুরজিৎ দাশগুপ্তের তিনি নিয়ত মনে রেখেছেন। বুঝিয়েছেন, ওদের কাছে কিছু চান না বলে।

নানা-কাগজের কবিতার প্রতিষ্ঠা শেষ কর্মজীবনের সূত্রে যে সব বন্ধুদের সাহচর্য পেয়েছেন, সে ক্ষেত্রে গোপালচন্দ্র রায় এবং অচিন্ত্যকুমার সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোপালচন্দ্র-র মাধ্যমেই হাওড়া গার্লস কলেজে তিনি অধ্যাপনার চাকরিটি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, আর সেই কলেজের কর্তৃপক্ষের অন্যতম অচিন্ত্যকুমার মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও একটি বাড়ি নৈকট্য আসতে পেরেছিলেন। কলেজ থেকে ফেরার সময়, কিংবা নৈমিত্তিক সাক্ষাৎকারের সময় প্রায়ই সঙ্গী হতেন অচিন্ত্যকুমার। একবার কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন দেখার জন্য তাঁকে সঙ্গী করেছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে এমন একটা নিবিড় সখ্য গড়ে উঠেছিল, অনেক সময় প্রাণ খুলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। বলতেন: 'সাহিত্যই আমার জীবনের বড় কথা। শুধু বড় কথা নয়, একমাত্র কথা।' তাঁদের 'কবিতা-চক্র' নামে একটা বিচিত্র আলোচনাসভা হত, তাতে জীবনানন্দ কিছু বলার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে ব্যবহারিক ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বলেননি। কথায় কথায় কথাপ্রসঙ্গে একবার অচিন্ত্যকুমারকে বলেছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য-বৃত্তির মধ্যে একটা পার্থক্য রাখা দরকার। কোনও কোনও সময় ভগবান ও আত্মা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ দেখা যেত তাঁর আলোচনার জিজ্ঞাসায়, পূর্বজন্মের প্রসঙ্গে কথা বলতেন হিতকামদের সঙ্গে, হয়তো বিশ্বাস করতেন না কৌতূহল ছিল বলেই বলতেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'বলতে পারেন মৃত্যুর পর কি আছে? কে বলে জানবাবের মানসিক নয়?' তখনও অচিন্ত্যকুমার বলেছেন: 'মৃত্যুর আগে কম পুঁথিটি নিজের উক্তিটি কেমন? যদি তুমি থাকো, তাহলে যে ভগবান আমার আত্মার রক্ষক হোক, যদি আদৌ আত্মা থাকে।'

শেষ ক'বছর তাঁর সান্ধ্যভ্রমণের নিত্যসঙ্গী ছিলেন সুবোধ রায়, পরিচালক, বন্ধ ও বয়সনিকতার অকালপক্বতিরে তাঁদের পরস্পরিকতা প্রায়ই মুখর হয়ে উঠত। পাঁচ-সাত মাইল রোজ হাঁটতেন তাঁরা। ল্যান্সডাউন দিয়ে রাসবিহারী এভেনিউর কিছুটা পশ্চিমে, তারপর ডান দিকে ঘুরে সাদার্ন এভেনিউ দিয়ে লেক অবধি পার্ক। চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করতেন ঢাকুরিয়া লেক থেকে ছোটো লেক, একেবারে টালিগঞ্জের ব্রিজ পর্যন্ত।

সুবোধবাবু বলেছেন: 'রাত্রি থেকে সেখোয়ার সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। কেউ যেন দেখতে না পায়। ঘাসের বুকে অন্ধকারে বসতেন। নির্জনতা আর অন্ধকারকে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন কবি। পরিচিত কাউকে দেখলেই আড়ালে গিয়ে আড়াল করতেন নিজেকে। আমার উপর কড়া নির্দেশ ছিল—পরিচিত কারো সঙ্গে কখনও পরিচয় করিয়ে দেবেন না। যদি বা কোনো দিন অজান্তে করেছি দিয়েছি, উদ্বিগ্নভাবে বিড়ম্বনায় পড়তেন। শুধু আড়াল, নির্জনতা, নিজেকে লুকিয়ে রাখা।' প্রায় অভিযোগের সুরে সুবোধবাবু বলতেন: 'আপনার মতো এমন অদ্ভুত অসামাজিক লোক আমি আর দেখিনি। কতো বড় বড় কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপকের ভিড় আপনার কাছে দেখেছি। কতো অসংখ্য বন্ধু আপনার। অথচ কোথাও যাওয়া-আসা নেই, মেলামেশা নেই—কী যে আপনার স্বভাব।' সুবোধবাবু তাঁর মতের সমর্থনে জানাতেন, লেখক-গুরু, আলাপ-আলোচনায় অন্তত একটা লেখার যোগাযোগ আসে। জীবনানন্দের উত্তরে বলতেন: 'কি দরকার? বইতো আছে লেখা। কতো বই পৃথিবীতে। ভালো বই পেলে আর-কিছুর, কাউকে দরকার হয় না।' অবশ্য একথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন—একেবারে শৈশব বয়স থেকেই বই-এর প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ। আজীবন, সারাক্ষণ ডুবে থেকেছেন বই-এর জগতে, হয়ত বই-ই ছিল তাঁর কাছে প্রকৃত বন্ধু।

জীবনানন্দকে 'নির্জন' নিঃসঙ্গ কিংবা 'মৃদুভাষী চিন্তিত অবসর'—প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করার চেষ্টা হয়েছে নিয়মিত হবে। তাঁর প্রকৃতি-স্বভাব সম্পর্কে বলতে গেলে অনেকেই বলে থাকেন: 'জীবনানন্দ মিশুক নয়, ঠোঁটে আঁকা মৃদু হাসির বাইরে সে হাসতে জানে না, খা মেলে আড্ডা দিতে জানে না, তাছাড়া পরিচিত লোক দেখলেই পাশ কাটিয়ে সরে পড়ে।' অচিন্ত্যকুমার, 'অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ'র ছবি আঁকতে গিয়ে সাধারণে প্রচলিত এই সব বক্তব্যের পাশে নিজের অভিজ্ঞতার আলোয় তাঁর সঠিক চেহারাটি তুলে ধরে দিয়েছিলেন: 'একজন লেখককে বলতে শুনেছি জীবনানন্দ জীবন থেকে পালিয়েছে, অনেক জন বন্ধুদের মুখের কথা, মানুষ থেকে যেন দূরত্বজন্মা বাকির মতো ঘাটে জলশূন্য নৌকা বাঁধা। অর্থাৎ সূর্যের আলো আলোর কাছে এসে সে দাঁড়াতে চায়নি, কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসা, দুঃখের কথা, কিন্তু জেনেও দাঁড়াতে পারেনি গলা বাড়িয়ে। এবং বড় জীবনের জনৌই যার বড় দরকার তা সে খুঁজতে জানেনি কোনো দল কাটা ঘাটে। কিন্তু তাই বলে সে মনের অক্ষের ধারণা থেকেই বাদ পড়ে গেছে এমন নয়। এমন নয় সে যে সাংসারিক অনুপাতেই সহজ-উজ্জ্বল ছিল না, এমন নয় যে সে ছিল না প্রবলপ্রাণ বন্ধু, সুদূর থেকে জীবনের অগ্নি-শাহিতো সর্বকর্মে যুক্ত।' আসলে মনের মানুষ, মনের মতন মানুষকেই খুঁজে ফিরেছেন, তবে কিংবা অন্য যে কোনো ব্যবধান অতিক্রম করে, সে রকম কারো সন্ধান পেলে নিজেকে বন্দী করে মেলে ধরতে পারতেন।

আমাদের রক্তের অসুখ ও জীবনানন্দ

সৈয়দ হাসমত জালাল

কৈশোর পেরোনোর সেই বয়সটিতে যখন জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে, তখন কি বুঝতাম জীবনানন্দের কবিতা? না, অনেকটাই বুঝতাম না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারতাম কোথাও যেন একটা ভালো লাগা, একটা নিবিড় ভালো লাগা অনুভূত হচ্ছে। তার আগে গল্প-কবিতা-গান এসব বলতে রবীন্দ্রনাথকেই বুঝতাম। কিছুটা নজরুলও। কিন্তু সেই ষোলো/সতেরো বছর বয়সে জীবনানন্দের কবিতা আমার ভেতরে এক সুগোপন অভিঘাত তৈরি তুলেছিলো। 'চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দুবেলা/ নির্জন মাছের চোখে; পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে/ পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে'— আবহমান এই ছবিগুলিকে এক মায়াবী রহস্যময়তা ও সংবেদনায় নতুন করে জীবনানন্দ আমাকে চিনিয়ে দিলেন তাঁর কবিতায়।

আমার জন্ম মুর্শিদাবাদের একটি গ্রামে। একদিকে খোলামেলা প্রকৃতির জল-হাওয়া-আকাশ-প্রান্তর, অন্যদিকে পরিবারের মধ্যে সাহিত্য শিল্পের মুক্ত পরিবেশ—এর মধ্যে কেটেছিল আমার শৈশব কৈশোর। তখন আমার জীবনেও 'প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ', অথচ ভেতরে ভেতরে কী যেন একটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল নিঃশব্দে। তবে কি তখন থেকেই আক্রান্ত হচ্ছিলাম সেই জীবনানন্দীয় 'বোধ' এ!

তবু সম্পূর্ণ কোনও উপলব্ধি তখন আমার হবার কথা না। তবু এমন অজস্র পংক্তি আমার প্রিয় হয়ে উঠেছিল:

১। 'তোমার আকাশে তুমি উষ্ণ হয়ে আছো—তবু—/ বাহিরের আকাশের শীতে নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়/নক্ষত্রের মতন হৃদয়/পড়িতেছে ঝরে—/ ক্লান্ত হয়ে—শিশিরের মতো শব্দ ক'রে।

২। 'হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন,/পথের পাতার মতো তুমিও তখন/ আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে?

৩। 'যেখানে গাছের শাখা নড়ে/শীত রাতে—মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন—/ যেইখানে বন/আদিম রাত্রির ঘ্রাণ/বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান/ তুমি সেইখানে।'

৪। 'কড়ির মতন শাদা মুখ তার/দুই হাত তার হিম/ চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম/চিতা জ্বলে; দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়/সে-আগুনে হায়।'...ইত্যাদি।

তাঁর প্রেম সম্পর্কিত অজস্র পংক্তি আমায় মর্মমূলে গেঁথে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। যেমন:

১। 'আজ এই বিদেশের রাতে/অনেকের প্রেমের শয্যা জাগিয়াছে;/তাহাদের হৃদয়ের বোন/ বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে/জোছনায়—'

২। 'আমার হৃদয়—এক পুরুষ হরিণ/পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে/চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে/তোমাকে কি চায় নাই ধরা দিতে?'

৩। 'বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

৪। 'প্রেম ও বিরহ ছাড়া অন্য এক স্থির আলোচনা/ তার মনে; —আমরা অনেক ধূম ফেলে বেশি মানুষের মনে/রোগ ভুল শোক আছে যেমন শাখিতে থাকে—বিষ আলেয়ার পাতা/ হাওয়া হাতড়ায়/ চুলের ওপরে ঝির ঝিরে পড়ে—' ইত্যাদি।

*

তখনকার প্রিয় এরকম অজস্র পংক্তি আজও বলে যেতে পারি। তবে দেখতে পাই কিন্তু সে কোনও অংশে

বরিশালে ব্রজমোহন বিদ্যালয়: এই স্কুলে কবি পড়তেন

হয়নি এবং অনেক ক্ষেত্রে তা যেয়েছে। পরবর্তী বছরগুলোর জীবনের বিবিধ বৈচিত্র্যের ভেতর সময় এবং অভিজ্ঞতা পাঠক আগুনে কালকে পুড়িয়ে জীবনানন্দের কবিতা আমার কাছে গভীরতর অর্থে ধরা দিয়েছে। সে সময় 'বেলা অবেলা কালবেলা'র কবিতা আমার তেমন ভাল লাগত না। বুঝতাম না বলেই। এবং না-বোঝাটাই ওই বয়সে স্বাভাবিক ছিল। পরে মনে হয়েছে, জীবনানন্দের ওই কবিতাগুলি না বুঝলে তাঁকে তথাকথিত 'নির্জনতার', 'বিষণ্ণতার' কবি বলার ভ্রান্তি ঘটবে। ঘটেছেও, জীবনানন্দের বহু সমালোচকের ক্ষেত্রে।

জীবনানন্দের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বিমলচন্দ্র ঘোষ 'বাঙো জন' (হৈমন্তী দুগ সংখ্যা, ১৯৫৪) পত্রিকায় 'কবি জীবনানন্দের স্বপ্নের জীবন-দর্শন' নামে একটি প্রবন্ধে এরকম কিছু কথা লিখেছিলেন:

'দুঃখের বিষয় মানবসভ্যতার এই বৌদ্ধময় যন্ত্রযুগে জন্মগ্রহণ করেও জীবনানন্দ ক্রমাগত মৃত্যু কামনা করে গেছেন তাঁর অগণিত বিষণ্ণ মধুর কাব্যের মাধ্যমে। এ এক প্রকার মানসিক ব্যাধি।... কবিতাই কবি-মানসের দর্পণ— এ কথা যদি সত্যি হয় তবে জীবনানন্দের কবিতা তাঁর মানববিদ্বেষী চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি বলে মেনে নিতেই হবে।..... পাঠকের রসপিপাসু মনকে বিষণ্ণ করে তোলা ছাড়া জীবনানন্দের সমস্ত জীবন দর্শনের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। এই নৈরাশ্যবাদী নির্বেদ, এই অর্থহীন নিসর্গ-পরিক্রমার অবগাহীর অবসাদ, এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার সর্বনাশা আত্মপ্রবঞ্চনা পৃথিবীর বহু শক্তিশালী কবিকেই বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে।'

না, জীবনানন্দ দাশ আমাদের বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত হননি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য সঠিকভাবেই ঘোষণা করেছিলেন, 'জীবনানন্দ আমাদের যুগের মনোজগতের প্রথম কবি।'

যে কোনও মহৎ কবিতা তার অর্থবহতার গুণে ও ব্যঞ্জনায় যুগে যুগে মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থেরও ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে। সমসময়ের ক্রূর অসহযোগে একজন কবি তাঁর জীবদ্দশায় সঠিক স্বীকৃতি অনেক সময়ই পান না। জীবনানন্দও পাননি। তবে এটা আমাদেরই সৌভাগ্য যে জীবনানন্দকে বুঝতে আমাদের খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি।

*

জীবনানন্দ তাঁর কাব্য প্রতিভার উন্মোচন মুহূর্ত থেকেই পশ্চিমের শিল্পজগতের বিভিন্ন আন্দোলনের একধরনের প্রভাব। জীবনানন্দ ও তাঁর সমসাময়িক কবি লেখকরা এই প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট হলেন। জীবনানন্দ তাঁর 'কবিতার কথা'য় লিখেছেন: 'এ যুগ অনেক লেখকের—একজনের নয়—কয়েক জন কবির যুগ।' রবীন্দ্রনাথ আর তৃপ্ত করতে পারল না ওইসব তরুণ কবিদের। 'রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্ময় সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে কাব্যার্থে যা পথ ভাবলেন, বদলেয়ার ও ইয়েটস্ ও এলিয়ট-এর সমর্থক বা নঞর্থক মানববিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।'

একদিকে পশ্চিমের অভিব্যক্তিবাদ, পরাবাস্তববাদ ইত্যাদি নতুন শিল্প আন্দোলনগুলির সঙ্গে যেমন পরিচয় ঘটেছে এই তরুণ কবিদের, তেমনি অন্যদিকে এ দেশের জাতীয় জীবনেও দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন সংকট। ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রাম, রুশ বিপ্লবের পরবর্তী মানসিক উদ্দীপনা, বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থিক সংকট,

নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা ও হতাশা— এ দুটো অবক্ষয়ের মধ্যে এসে মিশে জীবনের অনিশ্চয়তা ও অনিবার্যভাবে অস্থিরতা। জীবনানন্দও স্বাভাবিকভাবেই সংক্রামিত হয়েছিলেন এই অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা ও অসুস্থতার যন্ত্রণায়। এই যন্ত্রণার মধ্যে তিনি 'সুস্থির নিবিড় মনোবল' খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস, অস্থিরতা নিরন্তর বহন করিতে বাধ্য হতে পারে। জীবনানন্দ নিজের মধ্যে 'শান্তি'র আড়ালে সৌন্দর্য ও বিবেকের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশি।

মন্বন্তর ও মহাযুদ্ধোত্তর বাংলার ব্যক্তির কাছে জীবন প্রথম বড় ও স্বাধীনতাহীনতার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক দুর্নীতি আর ধর্মীয় উৎপীড়ন সমাজকে অনুর্বর করে তুলেছিল, নারী ও প্রেমকে করে তুলেছিল শরীর সর্বস্ব পণ্যসামগ্রী, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সংবেদনশীল হৃদয়কে করে তুলেছিল নিঃস্ব। অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাবে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে স্বীকার করে যখন মানব-অস্তিত্বের সার্থকতার প্রশ্নটিকে বড় করে তুলে ধরল, তখন তাদের মনে জড় নিল নানা ভয়, হতাশা ও মৃত্যু ভাবনা। অস্তিত্ববাদে প্রভাবিত জীবনানন্দের কবিতাতেও তাই ফুটে উঠল তাঁর মৃত্যু চেতনা— 'সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত এসে জাগে/ ধূসর মৃত্যুর মুখ' অথবা 'কোথাও পাবে না কিছু/মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে/অন্তহীন অন্ধকারে আছে।'

একদিকে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সংকট, অন্যদিকে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের সংকট—এর মধ্যে থেকে জীবনানন্দ যখন দেখেন 'এ যুগে কোথাও কোনও আলো—কোনো কান্তিময় আলো/চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের...' যখন দেখেন 'মানুষের ভালোবাসা শেষ নেই/ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে কোনোদিন শুধু ক্ষণ/ অন্ধের সংকেত ছাড়া শূন্য/অগণের দুগ প্রাণ করে দেবতা হয়ে স্থিরতার/নেই', যখন দেখেন 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি-কোটি শুয়োরের আর্তনাদে/উৎসব শুরু করেছে' অথবা 'শান্তি রয়েছে, তবু মরে গেছে আমাদের মন', তখন এই অজস্র আত্মিক মৃত্যুর চেয়ে দৈহিক মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে হয়। জীবনানন্দের কবিতা পড়লে এখানেই যে তিনি নৈরাশ্য বা নিঃসহায়তার মুহূর্ত থেকে উত্তরণের জন্যে সহজ কোনো সমাধানের পথ আমাদের দেখাতে জানেন। কী অসাধারণ সততায় উচ্চারণ করেছেন তিনি— 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি।' অসহায়তার কী নিদারুণ আর্তি—'বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো আমরা সবাই'!

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে যেতে থাকে অনুসন্ধান। তা যেমন প্রতি মুহূর্তের প্রবল আশাবাদে উদ্দীপ্ত নয়, তেমনি নয় প্রতি মুহূর্তের ভয়ংকর নৈরাশ্যের অন্ধকারে পূর্ণ। এই আশা ও নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব জীবনানন্দের কবিতায় আমরা দেখি। শতাব্দীর এমন এক সন্ধিক্ষণে জীবনানন্দ জন্মেছিলেন যখন পৃথিবী জুড়ে এক 'অদ্ভুত আঁধার'। এই 'অদ্ভুত আঁধার' তাঁর কবিতাগুলোর বাহ্যিক অন্ধকার নয়, এই শতাব্দীর গভীরতর অন্ধকার।

সংক্ষেপেই জীবনানন্দের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরেছি, তাতে তাঁর প্রেম ও মৃত্যুচেতনা মিশে আছে একই সঙ্গে। তাঁর জীবনবোধ ও মৃত্যুচেতনার সমন্বিতরূপ একাকার। কিন্তু যে কোনো বড় শিল্পীর মতোই জীবনানন্দের ও পক্ষপাতিত্ব ছিল জীবনেরই প্রতি, প্রেমের প্রতি। তাঁর যন্ত্রণা শুধু এক দৈহিক উত্তরণের পথ খোঁজার যন্ত্রণা।

মৃত্যুই যদি শেষ কথা হতো, 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন' জেনেও তিনি কি বলতে পারতেন, 'মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে'? বলতে কি পারতেন— 'আমরা জঙ্গম মৃত্যু পেয়ে গেছি—প্রেমে/পৃথিবীর প্রত্যেক ভাবনার ভরা কোলাহল/কোথায় গেল উঁচিয়ে দুই মৃত কবিতা ভাবিয়া রক্ত থেকে/সময়ের সমুদ্রকে তার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে বলে'? নৈরাশ্যই তাঁর জীবনবোধের শেষ কথা নয়, তিনি তো বলে গেছেন—'হৃদয়ে প্রেমের দিন কখনো শেষ হবে না, অশ্রুহীন/মানুষের পৃথিবী হয়তো বা শান্তি পাইবে'। অন্ধকারই যদি তাঁর জীবনবোধের শেষ অন্ধকার হতো, তবে কি বলতেন—'আমরা তো তিমিরবিনাশী/হতে চাই/আমরা তো তিমিরবিনাশী'? অথবা 'অবশেষে তিনি যদি মৃত্যুর শেষ কথা হয়,/আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি সময়ের,/তবুও আমার কোটি সূর্যের নির্দিষ্ট মনোবলে/ স্বপ্নে এই মানুষের আত্মার পৃথিবীর মনে'?

মৃত্যুর অন্ধকার নিঃস্বত্বকে অতিক্রম করে আমাদের হৃদয়ে যে এক চমৎকার আলো জেগে থাকে তা তো প্রেম। এই প্রেমেই কি তিনি বলেননি— 'আমার বুকের থেকে তবুও কি পড়িয়াছে খসে/কোনো এক মানুষীর তরে/ সেই প্রেম আমাদেরই পুরোহিত হয়ে তার বুকের উপরে/আমি সেই পুরোহিত—সেই পুরোহিত?' অথবা সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেন নি কি— 'মানুষ মাটির পরে আমরা খুঁজিনা তার ভালোবাসা হায়/ প্রেম তার পিপাসার গান/আমরা গাহিতে পারি?'

তখন বড় হয়ে ওঠার অমোঘ পরিণতি গ্রহণ করে কিছু হারাতে হয় আমাদের। আমাদের অনেক আপনজন হয় আর অনুভূতিও শূন্য হয়ে ওঠে যখন দেখি 'তবুও সমুদ্র নীল, ঝিনুকের গায়ে আলপনা/ একটি পাখির গান কী রকম ভালো।' তখন সামান্য সুখ-দুঃখ, পাওয়া না-পাওয়ার পরিধি ছাড়িয়ে জীবনের গভীরতর বোধ থেকে 'পাখির নীড়ের মত চোখ' এসে আমাদের শীর্ণ বুকে জন্ম নেয় হবে, সুখ করে দিয়ে যায় আমাদের বক্ষের অসুখ। জীবনানন্দ পড়েই তো উপলব্ধি করেছি এসব।

কলকাতার ট্রাম ও কবির মৃত্যু

বিমলকুমার পাল

ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে প্রথম শব্দ তোলে রাতের ঘুম থেকে কলকাতাকে জাগিয়ে তোলে ট্রাম, কলকাতার নাগরিক-জীবনের প্রিয় পরিবহণ। প্রিয় বললেই বোধ হয় এই শহরের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সব প্রান্তে এর সঙ্গে ব্যক্তির অনুরাগ করা যায়। দিনের কোলাহল, কর্মব্যস্ততা, আর রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে ঘর্ঘর আওয়াজে রাজপথ মুখরিত করে পথ চলা আর কার পক্ষেই বা সম্ভব। বহু মানুষ যাত্রীকে নিত্য পথ বহন করে সে, তাই নাগরিক-জীবনে তার অবস্থান অনস্বীকার্য—অতীত, বর্তমান পার হয়ে ভবিষ্যতের দিকেও চলেছে। সুদীর্ঘ ট্রাম লাইন যেন কলকাতার বুকের পাঁজর। ট্রামের অস্তিত্বের সাক্ষ্য শুধু রাজপথেই সীমাবদ্ধ নয়, বাংলার উপরে প্রসারিত সাহিত্যের আসরেও এর মহিমা অঙ্কিত হয়েছে। জনপ্রিয় এই পরিবহণটি এখনো সজীব থেকে কলকাতাকে সেবা করে আসছে। ট্রামের শতবর্ষ পূর্ণ হল গত ১লা নভেম্বর, ১৯৮০ তারিখে। এই উপলক্ষে স্মরণ করে কলকাতাবাসী আজ গর্বিত, আনন্দিত।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র কলকাতা। কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয় বাংলা সাহিত্যের নামজাদা লেখকদের সাহিত্যকর্ম। গ্রামবাংলার সুদূর কেন্দ্র থেকে লেখক-সাহিত্যিকদের কলকাতায় আসতে হয় প্রতিষ্ঠালাভের জন্য। এর ব্যতিক্রম নেই বললেই চলে। কলকাতার সাহিত্য সারা দেশের সাহিত্যের মান নির্ধারণ করে। আর এটা ঠিক—পরিবেশ প্রভাবিত করে লেখককে। কলকাতার নাগরিক জীবনের প্রিয় পরিবহণ ট্রামও তাই প্রভাবিত করে থাকে লেখকদের, তা তিনি কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক যাই হন না কেন। ট্রাম লাইন না মাড়িয়ে এই শহরে পথ চলতে পারে কে। কে পারে ট্রাম না দেখে, ট্রামের কথা না ভেবে এই শহরে টিকে থাকতে? তাই দেখা যায় কলকাতার নাগরিক জীবনকে বিশ্লেষণ করার সময় তাঁরা গল্প, উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের মনোজগৎ বিশ্লেষণ করার সময় প্রাসঙ্গিকভাবে ট্রামের উপস্থিতি। এইভাবে বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত ছুঁয়ে গেছে ট্রাম। গ্রামবাংলা থেকে সদ্য আসা লেখক সাহিত্যিকরা অল্পদিনেই ট্রামের প্রেমে পড়ে যান, এমনও দেখা যায়। কলকাতার নগর জীবনে বাইরে থেকে আসা যে কোনও ব্যক্তিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে ট্রাম। ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে আর কোন শহরে ট্রাম না থাকাও তার একটি কারণ।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন সেকেলে কলকাতায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। কলকাতায় তখন ট্রাম ছিল না, ছিল না বাস, মোটরগাড়ি প্রভৃতিও। এখনকার মত আলোর চোখ-ঝলসানি তখন ছিল না; ছিল ভাঁটির যুগ বলে। অফিসে যাঁরা যেতেন তাঁরা আহার সেরে, পান চিবোতে চিবোতে পালকি বা জুড়ি গাড়ি চাপতেন। ধীরে-সুস্থে কাজ চলত। কলকাতার রাস্তায় পেয়াদার ডাক শোনা যেত তখন। সন্ধ্যার কলকাতা এখনকার মতো সজাগ ছিল না। সন্ধ্যার জল খাওয়া হত। এসব কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ছেলেবেলা' বইতে। কলকাতায় প্রথম যখন ট্রাম চলতে আরম্ভ করে তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স উনিশ—যে ট্রাম কিন্তু টানা হত ঘোড়ার সাহায্যে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর শিয়ালদহ বৌবাজার লাইনে প্রথম ট্রাম চলে। তখন ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে ট্রাম চালানো হয়। শহরের আবহাওয়া সহ্য না হওয়াতে বহু ঘোড়া মারা যেতে থাকায় এরকম ব্যবস্থা হল। মাত্র এগারো মাসের অনিয়মিত চলাচলের পর বাষ্পীয় শক্তি চালিত ট্রাম শহর থেকে বিদায় নিল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে এল বিদ্যুৎচালিত ট্রাম এবং বছর দুই-চারের মধ্যেই সারা শহরে

নিজের পরিবারে জীবনানন্দ

জাঁকিয়ে বসল। ট্রামের শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনেই ঘটেছে। তাই দেখা যায় তাঁর সাহিত্যকর্মে ট্রামের প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। রবীন্দ্রনাথ কি কোনোদিন ট্রামে চেপেছিলেন? আমরা জানি না। তাঁর অজস্র চিঠির মধ্যে বা তাঁকে নিয়ে লেখা অসংখ্য স্মৃতিকথার মধ্যে কোথাও ট্রামে চাপেননি, এটা ভাবাই কি ঠিক হবে? তাঁর ট্রামে চাপা কল্পনা করতে ইচ্ছে হয়।

রবীন্দ্র পরবর্তী কবি, কথাসাহিত্যিকরাও ট্রামের কথা ভোলেননি। পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসুর গল্পে ট্রামের উল্লেখ আছে তার নাম 'চিকিৎসা সঙ্কট'। খুঁজলে এরকম উদাহরণ অন্যদের লেখায় আরও মিলবে।

বাঙালি কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ নানা কারণেই বিশিষ্ট। রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্য-প্রবাহে জীবনানন্দ একটি যুগ। সুদূর বরিশাল (পূর্ববঙ্গ) থেকে গুটি গুটি পায়ে কলকাতায় এসেছেন তিনি। একসময় এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাও হয়ে যান। কলকাতার নাগরিক-জীবনের সঙ্গী ট্রামকে তিনি ভালোবেসেছেন। কতদিন ট্রাম লাইন অতিক্রম করে এই শহরে তিনি পথ চলেছেন। ট্রামে চেপে স্থান থেকে স্থানান্তরে গেছেন। তাঁর জীবনের সঙ্গে ট্রামের অস্তিত্ব জড়িয়ে ছিল। কাছে থেকে নিজের মতো করে তিনি ট্রামকে দেখেছেন। তাঁর জীবনের সমাপ্তির সঙ্গেও ট্রামের যোগ।

'রূপসী বাংলার' রূপকার হিসেবে জীবনানন্দের কবিখ্যাতি। কিন্তু তিনি কি কেবল রূপসী বাংলার-ই কবি? কলকাতা শহরে তাঁর কবি জীবনের সমৃদ্ধতর অধ্যায় কেটেছে। এখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম কবিতার বই। এছাড়া একের পর এক কাব্যগ্রন্থ বের করেছেন কলকাতার প্রকাশকেরাই। কলকাতা তাঁকে দুঃখ দিয়েছে, প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। কলকাতাকে নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন। কলকাতা তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার শহর। রূপসী বাংলার ধ্যান করার সময় কলকাতাও সেই ধ্যানে অংশ নেয়। "কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে"—কবিতার সুদীর্ঘ উৎস থেকে বেরিয়ে আসা এই অবিস্মরণীয় লাইনের মধ্যে কলকাতা সম্পর্কে তাঁর প্রীতির পরিচয় পাই। কল্লোলিনী কলকাতার সঙ্গে রূপসী বাংলাকে মিলিয়েছেন তিনি। কলকাতার ব্যবহারিক জীবনে প্রাকৃতের মতো মুক্তি খুঁজতে চাইতো তাই তাঁর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার নয়।

কলকাতা। শহর নামের বুঝি একটিই শব্দ, জানতেন তিনি! কলকাতার স্থান-নাম, গলি বস্তির নাম, নায়ক-নায়িকার নাম দর্পণের প্রতিবিম্বের মতো তাঁর লেখায় নানা সময় ফুটে ওঠে। কলকাতা তাঁর কিছু কবিতার প্রাণ-স্পন্দন। এই প্রাণ-স্পন্দন কোথাও অনেক জায়গায় এসেছে ট্রাম-প্রসঙ্গ। কবি তিনি। কাব্যের মধ্যে আপনি ডুবে থাকাতেই তাঁর আনন্দ। কাব্যজগতের বিচরণ করতে করতে তিনি এ-পথে, ও-প্রান্তে কলকাতার পথ-ঘাট হেঁটেছেন। এ সময় মাঝে মাঝে তাৎক্ষণিক উপস্থিতিতে তাঁকে বা চমকে দিয়েছেন:

"অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো
এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের
বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব ক'রে হাঁটছি আমি।
গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে,—কেমন ঠাণ্ডা বাতাস;
কোন দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা
মনে পড়ে আমার,—
তারা কোথায়?
তারা কি হারিয়ে গেছে?
পায়ের তলে লিকলিকে ট্রামের লাইন—মাথার ওপরে
অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।
গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে,' কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস,
এই ঠাণ্ডা বাতাসের মুখে এই কলকাতার শহরে
এই গভীর রাতে
কোনো নীল শিরার বাসাকে কাঁপাতে দেখবে না তুমি;
জলপাইয়ের পল্লবে ঘুম ভেঙে গেল ব'লে
কোনো ঘুঘু তার
কোমল নীলাভ ভাঙা ঘুমের আস্বাদ তোমাকে
জানাতে আসবে না।"
(ফুটপাথে: 'মহাপৃথিবী')

জীবনানন্দের প্রিয় বন্ধু ট্রেন। কলকাতা ট্রেনের বাইরে তাই তাঁর প্রিয়। 'একটি নক্ষত্র আসে' কবিতায় ট্রেনের ঢংঢংয়ের সঙ্গে কলকাতার বাড়ির ছাদের লোকজনের অনেক রাতে শেষ ট্রামের ফেরার কথা এসেছে:

"একটি নক্ষত্র আসে; তারপর একা পায়ে চ'লে
ঝাউয়ের কিনার ঘেঁষে হেমন্তের তারাভরা রাতে
সে আসবে মনে হয়;—আমার দুয়ার অন্ধকারে
কখন খুলেছে তার সপ্রতিভ হাতে।
হঠাৎ কখন সন্ধ্যা মেয়েটির হাতের আঘাতে
সকল সমুদ্র সূর্য সত্বর তারকে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রি হ'তে পারে
সে এসে দেখিয়ে দেয়; শিয়রে আকাশ দূর দিকে
উজ্জ্বল ও নিভন্ত নক্ষত্র গ্রহের আলোড়নে
অঘ্রানের রাত্রি হয়;
এ-রকম হিরণ্ময় রাত্রি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু
রেখেছে কি মনে?
শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন
জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ;
চারদিকে ঘর বাড়ি পোড়ো-সাঁকো সমাধির ভিড়;
সে অনেক ক্লান্তি ক্ষয় অবিনশ্বর পথে ফিরে
যেন ঢের মহাসাগরের থেকে এসেছে নারীর
পুরোনো হৃদয় নব নিবিড় শরীরে।"

(একটি নক্ষত্র আসে)

নির্জনতা বড় প্রিয় তাঁর। একা একা নির্জন পথ চলিবার অনির্বাণ তাগিদ মনের মধ্যে থেকে যায়। ট্রাম-বাস ঠিকঠাক চলছে; এ বড় জামার মতো মানসিক অবস্থাও তখন দূর হয় না।

"কি এক ইশারা যেন মনে রেখে একা-একা শহরের
পথ-থেকে পথে
অনেক হেঁটেছি আমি; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস
সব ঠিক চলে;
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হ'য়ে চ'লে যায় তাহাদের
ঘুমের জগতে:
সারারাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো ক'রে জ্বলে।
কেউ ভুল করেনাকো—ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা
কপাট ছাদ সব
চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।
একা একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি
হৃদয়ে করেছি অনুভব;
তখন অনেক রাত—তখন অনেক তারা মনুমেন্ট
মিনারের মাথা
নির্জনে ঘিরেছে এসে; মনে হয় কোনোদিন
এর চেয়ে সহজ সম্ভব
আর কিছু দেখেছি কি: একরাশ তারা-আর-
মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা?

চোখ নিচে নেমে যায়—চুরুট নীরবে জ্বলে—
বাতাসে অনেক ধুলো খড়।
চোখ বুজে এক পাশে স'রে যাই—গাছ থেকে
অনেক বাদামী জীর্ণ পাতা
উড়ে গেছে; বেবিলনে একা-একা এমনই
হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন; আজো আমি জানিনাক হাজার-হাজার
ব্যস্ত বছরের পর।"

(পথ হাঁটা: 'বনলতা সেন')

জীবনানন্দ জানতেন 'বড় বড় নগরীর বুক ভরা ব্যথা'। তিনি লিখেছেন "মহানগরীর মৃগনাভি ভালবাসি"। এ ভালবাসার অন্তরালে পড়ে মহানগরীর প্রাণ এবং কলকাতার সেই সব মানুষেরা যারা জীবনযাপন কাটিয়ে যেতেছে শ্রমিক, আরো আইবুড়ো ভিখিরী, বিভিন্ন যুবক, ইহুদী রমণী, বণিক, দুঃস্থলোক, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, ফুটপাতবাসী।

"অনেক শ্রমিক আছে এইখানে।
আরো ঢের লোক আছে
সঠিক শ্রমিক নয় তারা।
স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত
শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝরে
এরা তবু মৃত নয়; অন্তর্বিহীন কাল মৃতবৎ জেগে।
নাক-ওলো কুষ্ঠী নয়, পৃথিবীর চেনা-জানা নাম এই সব।
আমরা অনেক দিন এ-সব মানুষের সাথে পরিচিত; তবু,
দূর নীড় নির্দেশ সকলি হারায়ে ফেলে এরা
জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের
মতন নির্দিষ্ট কোনো প্রভেদ বিধান পাওয়া যাবে;
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিম্ফনীর আছে।
পেনিটেন্ট কালোয়ারের বেলাগাছিয়ার
ক্যান্সারের ঢের কাঁচড়াপাড়ার ঢের পথ
ঘিরে কতগুলো পথ?
ওরা নয়—সহসা এদের হ'তে আমি
কাউকে ওখানে কোনো ঠিকমত জবাব পাইনি।
ঢের আছে, বেশি নেই—সকলের প্রয়োজন নেই।
আদের আত্মার ঘর উত্তিরণ নেই
হাসপাতালের ঢের হয়তো তাদের তরে নয়।
বউবাজারে দুলিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো—
আরো ঢের দীর্ঘ অন্ধকারে
যারা ফুটপাত থেকে অথবা ট্রামের লাইন থাকিয়ে চলবে

অন্তর আকাশ কোন দিকে?
চেয়ে প'ড়ে থেকে হায় কিছুক্ষণ আলাপীর
কিছু চায়—কিছু খোঁজে;
এ ছাড়া আকাশ আর নেই।

অন্তিম শয়ানে কবি-মাতা কুসুমকুমারী দাশ

তাদের আকাশ
সর্বদাই ছুটিপাতে;
মাঝে মাঝে এম্বুলেন্স্ গাড়ির ভিতরে
রণক্লান্ত নাবিকেরা ঘরে
ফিরে আসে
যেন এক অসীম আকাশে।
এ রকম ভাবে চ'লে দিন যদি রাত হয়,
রাত যদি হয়ে যায় দিন,
পদচিহ্নময় পথ হয় যদি দিকচিহ্নহীন,
কেবলি পাথুরেঘাটা নিমতলা চিৎপুর—
খালের এপার-ওপার রাজাবাজারের অস্পষ্ট নির্দেশে
হাওয়ায় হাতড়েদের তরে
অনেক বেডের প্রয়োজন;
বিশ্রামের প্রয়োজন আছে;
বিচিত্র মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।
হাসপাতালের জন্যে যাহাদের অমূল্য দান,
কিংবা যারা মরণের আগে মৃতদের
জাতিধর্মনির্বিচারে সকলকে—সব দুঃস্থদের আর্তকেও
শরীরের সান্ত্বনা এনে দিতে চায়,
কিংবা যারা এই সব মৃত্যু রোধ ক'রে এক সাহসী পৃথিবী
পূর্বাভাস সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে—
তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সংকল্পকে ধন্যবাদ দিয়ে
মানুষের অনিঃশেষ কাজ চিন্তা কথা
রক্তের নদীর মতো ভেসে গেলে, তারপর, তবু,
এক অমূল্য মুক্তো
হৃদিকার ক'রে নিয়ে ক্রমেই নির্মল হ'তে পারে।"

[এই সব দিনরাত্রি]

কবি জীবনানন্দ গদ্যও লিখেছেন। 'মাল্যবান', 'গ্রাম ও শহরের গল্প' 'বিলাস' প্রভৃতি গদ্যগুলির কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তাঁর গদ্য তিনটিতে 'বিষাদময় কবিপ্রাণের অভ্রান্ত স্বাক্ষর আছে। এর মধ্যে 'গ্রাম ও শহরের গল্প' পড়তে পড়তে একটা অনুচ্ছেদে এসে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়; নায়িকার অনুভব গভীরতায় খানিকটা বা ডুবে যেতে হয়। এখানে গদ্যের ভাষা কবিতার ভাবধারাকে নীরবে-নির্জনে ছুঁয়ে যায়। কোন বাঁকে কলকাতা হারাবার নিয়ত গভীর পথে পা বাড়ায়; শহর ও গ্রাম যুগপৎ সচিত্র হয়। এখানেও ট্রামের কথা এসেছে:

"বড় রাস্তার দিকের জানালাটার পাশে এসে বাড়ের কলকাতার দিকে একবার তাকাল সে—ট্রাম লাইনগুলো খালি প'ড়ে আছে—রাস্তায় সেই বিরাট হাঙরদের এখন ঘুমোবার সময়; আওয়াজ তাই নেই কম; বাতিও অনেক নিভে গেছে—রাস্তার ওপর অন্ধকার, এই বেলা খানিকটা জমে এসেছে; নক্ষত্রগুলোর মনে আছে এখন।....হঠাৎ পাড়াগাঁর কুয়াশা, ধানের ক্ষেত, শালবন, ফণি, বীট, গাজর, শিউলি, ঘেঁটু বেতুয়া ঘাস, গুঁয়োপোকা, প্রজাপতি, কাঁচপোকা, জোনাকী—আট দশ বছর আগের কত-কী মনে প'ড়ে যাচ্ছে; পাড়াগাঁর রাত এমন নিস্তব্ধ হ'য়ে যায় যে সুপুরির মুচি খসার শব্দ অবধি শোনা যায়; আমের মুকুলও আওয়াজ ক'রে ঝরে—টুপ্-টাপ্' টুপ্-টাপ—টুপ্-টাপ্।"

মৃত্যু। মৃত্যুতে জীবনের প্রশান্তি। সংসার-জীবনের দুঃখ-কষ্ট-গ্লানি সব কিছুকেই ভুলিয়ে দিতে পারার আশ্চর্য ক্ষমতা এর। তাই মৃত্যু এত প্রিয়। কিন্তু জীবনানন্দ কি মৃত্যুকে চেয়েছিলেন? জীবনানন্দ জানতেন "কিছু মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।" শান্তি তিনি কিছুটা পেয়েছিলেন বটে। সারাটা জীবন তাঁর কেটেছে অশান্তি এবং অর্থ অভাবের টানাপোড়েনে। কিছুদিন পর পরই বেকার হয়ে পড়ার প্রতিকূল অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের নিত্যদিনের সঙ্গী। সহকর্মীদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই বনিবনা না হওয়ার খবরও অজানা নয়। অন্যের সঙ্গে মন খুলে মিশতে না পারার সংকোচ ছিল তাঁর। নিঃসঙ্গ, একাকী; আপন মনের একান্তে নিজের কাছাকাছি থাকাতেই তাঁর তৃপ্তি। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সুদীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে দুর্লভতর শান্তি মিলেছিল হাওড়া গার্লস কলেজে। এখানে তিনি নিজেকে মুক্ত পেয়েছিলেন যেন। সহকর্মীমহলে এবং ছাত্রমহলে তিনি সমান জনপ্রিয়। জীবনানন্দ চিরদিনই লাজুক, মুখচোরা। কিন্তু এই মানুষটি এখানে পরিবেশে যেন অনায়াসে মিশে যেতে পেরেছিলেন। পারিবারিক অশান্তির জন্য এর আগে প্রাণে শান্তির ঠাঁই দূর ছিল; এখানে এসে তা যেন পেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পরিণত পাণ্ডিত্য, পড়াশোনার গভীরতা, অমায়িক ব্যবহার দিয়ে সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন। দুর্লভতর শান্তি কি নয়? কিন্তু কলকাতায় জীবনানন্দ তখন 'একটুখানি বাসা'র জন্য দুশ্চিন্তায় কাল কাটাচ্ছেন। কলকাতায় বাসা খোঁজে হয়রান হয়েছিলেন। জীবনানন্দের জীবনীর সঙ্গে পরিচিত হলে এসব সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে। তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল তাও জানা সম্ভব হবে। কবি কার্যকারণে নিজেকে অসহায় মনে করতেন। বন্ধু-বান্ধব, চেনা-পরিচিত যে কোনও লোকের কাছেই তাঁর সকাতর আবেদন 'একটুখানি বাসা'। এ যেন নিরাপদ আশা। কিন্তু আশা করলেই তো পাওয়া যেত না। জীবনানন্দ নতুন কোন বাসা পাননি। এভাবে হয়রান হওয়ার ব্যাপার তো স্বাভাবিক। প্রাত্যহিক জীবনে মনের অস্থিরতা বাড়ল কেবল। অন্যমনস্কভাবে পায়ে হেঁটে কোথায় যেতেন কখন যেতে যেতে থাকতেন। পার্ক, জনপথ, ট্রাম-রাস্তা ছাড়িয়ে রাস্তার অন্যমনস্কভাবে পাড়িয়ে পাড়িয়ে কোথা এগোতে পারতেন না তিনি। নির্জনে, একাকী পার্কের কোনো একটা বেঞ্চিতে বসে হয়তো তিনি চিন্তামগ্ন। চিন্তা তাঁর কাল হল। অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রক্তচাপজনিত রোগ তাঁকে ক্রমশ দুর্বলতার পথে ঠেলে নিয়ে চলল।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর সেদিন। অসুস্থ শরীরে স্ত্রীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একা একা ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ির কাছেই লেক মার্কেট থেকে দুটো ডাব কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন।

জীবনানন্দ রাসবিহারীর দক্ষিণ দিকের ফুটপাথে রাস্তা পেরিয়ে ট্রাম লাইনের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন একটা ট্রাম আসছে। ভাবলেন, হয়ত ট্রামটা সামনের স্টপে এসে থামবে। ততক্ষণে তিনি ট্রাম লাইন পেরিয়ে যেতে পারবেন। তিনি অন্যমনস্ক অবস্থায় কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রাস্তা পেরোতে লাগলেন। কিন্তু তারপর? তারপর একটা বিকট শব্দ। বালীগঞ্জ-মুখো সেই ট্রাম অসতর্ক যাত্রীকে রাস্তা পেরোনোর কোনো সুযোগই দিল না। বিকট শব্দ করে ট্রামের থেমে যাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি—সে এক দুঃসহ অবস্থা। সবাই ছুটে এলেন। দেখলেন ট্রামের ক্যাচারে সম্মুখ ভাগের সঙ্গে পিষ্ট, দলিত, মথিত, একটি ক্লান্ত প্রাণ পড়ে আছে। রক্তাক্ত, বিকৃত শরীর। দুর্ঘটনা অন্ধকারের সাথে সাথে অনন্ত মৃত্যুর দুয়ার খুলে তাঁকে আহ্বান করছে। যে ট্রাম কবির কাব্যে বারবার চিত্রিত হয়েছে, সেই প্রিয় ট্রাম তার শবদেহে আশ্রয় দিল কবিকে।

তারপর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল। অস্থির, যন্ত্রণাকাতর মুহূর্তগুলির একের এক পেরিয়ে যাওয়া। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অনুরাগী, কৌতূহলী সবার সামনেই তিনি আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছেন। হাসপাতালের বদ্ধ ঘরের পরিবেশ থেকে খোলামেলা পরিবেশে মুক্তি খুঁজতে চাইলেন। কিন্তু মুক্তি কোথায়? মৃত্যুই তার শেষ পরিণতি। অবশেষে এই যন্ত্রণার অবসান ঘটল কয়েকদিন পর ২২ অক্টোবর রাত্রিতে। রাত তখন এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। মৃত্যুর হাত এড়িয়ে তিনি যাত্রা করলেন অজানালোকে, চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে অন্য এক জগতে। তারাভরা আকাশ দেখতে দেখতে হেমন্তের পথ পেরিয়ে তাঁর যাত্রা। হেমন্ত ছিল তাঁর বড় প্রিয় ঋতু। কলকাতার জনপথে শেষ ট্রাম ঘুরে গেছে, সঙ্গী মৃত্যু। তখন জীবনের, কলকাতার প্রকৃতির অস্থির নির্মাণ। অনেক ক্লান্তি, ক্ষয়, জটিলতা পার হয়ে খোঁজাখুঁজি করে একটি নক্ষত্রলোকে চলে গেল।

ট্রামকে ভালবেসেছিলেন কবি। ট্রাম তাই প্রিয় কবিকে মৃত্যুর হাতছানি দিয়ে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিল।

উল্লেখপঞ্জী :

১। ট্রামের একশ বছর—সৌমিত্রনারায়ণ পৌদ্দার। 'কবিতী'
প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮০।
২। কবিতা, কলকাতা, জীবনানন্দ। শুদ্ধসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায়।
'সমতট' পূজা সংখ্যা ১৯৮৩।
৩। সমুদ্র-সংকেত। প্রভাতকুমার দাস। "জীবনানন্দ দাশ"—
সম্পাদক : বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা, ১৯৮৪।
৪। "জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা।" ভারবি সংস্করণ।
কলকাতা, ১৯৭২।
৫। "জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ—১ম খণ্ড"। দেবেশ।
[illegible]। কলকাতা, ১৯৮১।
৬। "জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ—২য় খণ্ড। দেবেশ
[illegible]। কলিকাতা, ১৯৮১।
৭। "জীবনানন্দ প্রতিভা"। রবীন্দ্রনাথ সামন্ত।
৮। কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর শতবর্ষ। প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত "পুরশ্রী" তৃতীয়
বর্ষ: শ্রদ্ধাঞ্জলি সংকলন (নভেম্বর, ১৯৮০)।
পুরশ্রী ডিসেম্বর, ১৯৮৮

জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাস

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

যে পাঠক অদ্যাবধি জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়তেই অভ্যস্ত ছিলেন, হঠাৎই অভাবিত সংখ্যায় গল্প ও উপন্যাসের সম্ভার তাঁর সামনে হাজির হওয়ায় তিনি প্রথমে বিস্মিত, পরে পুলকিত, সব শেষে নানা প্রশ্নে আন্দোলিত। প্রশ্নের কারণ অনেকগুলিই। গল্প ও উপন্যাসগুলি হাতে নিয়ে পাঠ করার পর পাঠক কিংবা সমালোচক এ ভাবনায় আলোড়িত যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত না হলেও কবি হিসেবে যে খ্যাতি-লাভ তাঁর বরাতে জুটেছিল, তাতে তাঁর এই গল্প-উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল তা নয়। তা সত্ত্বেও কেন এগুলি লেখা হয়ে রইল লোকচক্ষুর অন্তরালে, পাঠকের অগোচরে, আর যা প্রকাশিত হতে সময় লাগল মৃত্যুর পরেও দীর্ঘ তিরিশ-বত্রিশ বছর!

গবেষকদের নানা যুক্তি প্রকাশিত হয়েছে একে একে। কেউ বলেছেন, লেখক নিজেই সন্দিহান ছিলেন তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসগুলি তাঁর কবিতার মতো যথেষ্ট রসোত্তীর্ণ হল কিনা। কেউ শঙ্কা প্রকাশ করেছেন, লেখাগুলি তখনকার সম্পাদকদের সমর্থন পায়নি। কেউ বা বলেছেন, কবি আরও অপেক্ষা করছিলেন সঠিক সময়ের জন্য। হয়তো আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে লেখাগুলি প্রকাশ করতেন একে একে। কিন্তু প্রকাশ করার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। কেউ বা বলেছেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল না লেখাগুলি প্রকাশিত হোক। কেন তা অবশ্য খোলসা করে ব্যক্ত করেননি তাঁরা।

প্রতিটি যুক্তিই এমন এমন পাঠক বা সমালোচকের কলম থেকে বেরিয়েছে যে, সেগুলি হেলায় উড়িয়ে দেওয়া যাবে তা নয়। কিন্তু এগুলির মধ্যে আসল কারণ যে কোনটি তা হয়তো কোনও দিনই জানা যাবে না। কারণ, যিনি কারণগুলি জানতেন সেই জীবনানন্দই আর বেঁচে নেই। সে কারণেই একটা রহস্য থাকবে আরও বহুকাল। যতদিন জীবিত থাকবে তাঁর রচনাবলী। ইতিমধ্যে আরও নতুন নতুন যুক্তি প্রকাশিত হতে থাকবে, তার পক্ষে ও বিপক্ষে চলবে বাদানুবাদ বিতর্ক, আর এই সব বিতর্ক অন্তহীনভাবে চলতে থাকবে, গল্প-উপন্যাসগুলির লেখক জীবনানন্দ দাশ যিনি তর্কাতীতভাবে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম কবি।

কিন্তু শতাব্দীর সেরা কবি যে সেরা লেখক হয়ে উঠবেন সে বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। তা জানতে হলে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে অপেক্ষা করতে হবে আরও বহুকাল। যে কবির মৃত্যু হয়েছিল পঞ্চাশের দশকের গোড়ায়, তাঁকে শীর্ষ কবি হয়ে উঠতে অপেক্ষা করতে হল মৃত্যুর পরেও দু-তিন দশক। অথচ তাঁর গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে সবে, কোনওটা দশ বা কুড়ি বছর আগে, কোনওটি বড় জোর পঁচিশ। আর মহাকালের হিসেবে দশ বা কুড়ি বছর কোনও সময়ই নয় সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে। অতএব অপেক্ষা ছাড়া গত্যন্তর কী!

তার আগে অবশ্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন হবে তাঁর এই নব-প্রকাশিত কথাসাহিত্যের। একটু বেশিই হবে আলোচনা, কেননা তাঁর কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আর কোনও দ্বিধা নেই, তাঁর কথাসাহিত্য অবশ্যই ধাপে ধাপে ব্যবচ্ছেদ হবে, বিশ্লেষিত হবে তুলনায়। পাঠক ও সমালোচক তন্ন তন্ন খুঁজে দেখবেন যে আশ্চর্য জাদু লুকিয়ে আছে তাঁর কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে, তা কথাসাহিত্যেও কতটা বিস্তৃত ও কোন উচ্চতায়।

ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি (১৯৫০-১৯৫৪)। [illegible]

দুই

যে উপন্যাসগুলি গত বিশ-পঁচিশ বছরে প্রকাশিত হয়েছে একে একে, তা লেখা হয়েছিল মোটামুটি দুটি পর্বে। প্রথম গুচ্ছ তিরিশের দশকের প্রথমে, দ্বিতীয় গুচ্ছ চল্লিশের দশকের শেষদিকে। অর্থাৎ প্রায় পনেরো থেকে সতেরো বছরের ব্যবধান দুটি পর্বের মধ্যে মাঝখানের সময়টুকু জীবনানন্দ সৃষ্টিহীন ছিলেন তা অবশ্য নয়। তাঁর জীবনের প্রধানতম ক্ষাপন কবিতা রচনায় নিয়োজিত ছিলেন অধিকাংশ সময়, কচিৎ-কদাচিৎ লিখেছেন এক-আধটা গল্প। কিন্তু এত গদ্য রচনা কেন এভাবে দুটি ভিন্ন পর্বে রচিত হল, কেনই বা মাঝখানের সময় শুধু কবিতাই লিখলেন, গদ্য রচনায় আগ্রহী হলেন না তার নানান ব্যাখ্যা দিয়েছেন সমালোচকেরা। তা নিয়ে আলোচনা করার কিছু নেই আলোচ্য প্রবন্ধে। বরং তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসগুলি ঠিক কোন সময়ে রচিত হয়েছিল তা প্রথমে দেখা যাক। পরে বিশ্লেষণ করা যাবে লেখাগুলির উৎকর্ষ সম্পর্কে।

জীবনানন্দের উপন্যাস বা উপন্যাসোপম গদ্য লেখাগুলি যা এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তা কালানুক্রমে লেখা হয়েছিল এভাবে:

পূর্ণিমা
কল্যাণী
কারুবাসনা
বিভূতির জানালা (?)
জীবনপ্রণালী
প্রেতিনীর রূপকথা
বিভা
মাল্যবান
বাসমতীর উপাখ্যান
জলপাইহাটি
সুতীর্থ

জীবনানন্দের গল্পের সংখ্যাও কম নয়। গল্পগুলি, এই দুই পর্বের সমসময়ে অথবা সামান্য আগে পরে লেখা। এই কালক্রমানুসারী থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে জীবনানন্দ তাঁর ধারাবাহিক কবিতা রচনার মধ্যে বিশেষ দুটি পর্বে স্থির করেছিলেন কবিতার পাশাপাশি গদ্যরচনা করাও তাঁর দরকার। তাই এক-একটা বিশেষ সময়ে গদ্যরচনার প্রাচুর্যে ডুবিয়ে রেখেছেন নিজেকে। গদ্য, শুধু গদ্যই লিখে গিয়েছেন অবিশ্রান্তভাবে। না হলে ১৯৩৩ এই পাঁচ-পাঁচটি বড় লেখা লিখে ফেললেন, তারপর কী হল দীর্ঘকাল আর উপন্যাস রচনার কথা ভাবলেনই না! আবার দীর্ঘ পনেরো-ষোল বছর পরে মনের ভেতর হঠাৎ উথাল তো আবার একচোটে তিন তিনখানা উপন্যাস যার প্রত্যেকটিই মোটামুটি বড় মাপের। এমন হঠাৎ-হঠাৎ গদ্যের সৃষ্টি প্রাচুর্য দেখে যা মনে হয় তা হল জীবনানন্দের ভেতর গদ্য রচনার তাগিদ তেমন প্রবলভাবে কখনও ছিল না। হয় অর্থের কারণে অথবা কবিতা লিখে তেমন খ্যাতি হচ্ছে না ভেবে গদ্য লিখে খ্যাতি হতে পারে এই কারণে এক এক পর্বে এতগুলি গল্প-উপন্যাস।

এখন, এই যে হঠাৎ ইচ্ছে হল তো এত গল্প-উপন্যাসের জন্ম সেগুলি কতখানি জীবনানন্দের কবি খ্যাতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে সক্ষম বা এক আসনে বসার যোগ্য তা অবশ্যই তুলনা করে দেখবেন পাঠক। উপন্যাসগুলি পাঠের পর যে-যে অভিজ্ঞতা প্রথমেই নাড়া দিয়ে যাবে পাঠককে তা হল:

উপন্যাসগুলি প্রায় সবই মূলত আত্মজৈবনিক।
কোনও উপন্যাসই প্রচলিত সমকালীন উপন্যাসগুলির ছাঁচে বাঁধা নয়।
উপন্যাসগুলি আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন, ভ্রমপূর্ণ, পারম্পর্যবিহীন, কখনও আত্মকথনের ভঙ্গিতে লেখা।

৪. সব উপন্যাসগুলির নায়ক প্রায় একজনই, তাদের জীবনযাপন, দৃষ্টিভঙ্গি সবই প্রায় এক ধরনের।
কখনও মনে হয় এগুলি সবই আসলে একটিই উপন্যাস। ভিন্ন ভিন্ন মলাটে দিয়ে লেখা। 'রূপসী বাংলা'র সব কবিতা মিলিয়ে যেমন একটি দীর্ঘ কবিতা, তেমনই।
কবিতার মতো উপন্যাসেও অসংখ্য তাল তাল চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন জীবনানন্দ।
প্রকৃতিও বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে তাঁর সব গদ্য-উপন্যাসে। কখনও তাঁর গদ্য উত্তীর্ণ হয় কবিতায়।
গদ্য-উপন্যাসে লেখকের মনোবিশ্লেষণ অনেক তীক্ষ্ণ। তাঁর গদ্যে নারী-পুরুষের উপস্থিতি কবিতার মতো অত বায়বীয় নয়।
কবিতা লিখতে গিয়ে যেমন বারবার পরিমার্জনা করা পছন্দ করতেন কবি, গদ্য রচনায় ততখানি পরিমার্জনা করেননি, বা করার সময় পাননি।

লেখাগুলি আরও বিস্তৃতভাবে পাঠ করলে একাধারে জীবনানন্দের গদ্য রচনায় আরও বহু বিশ্লেষণ সম্ভব। কিন্তু যা এখানে জরুরী তা হল জীবনানন্দের গদ্য-উপন্যাস কতটা উচ্চতায় পৌঁছতে পেরেছে বা বিশ্বসাহিত্য ও বিশেষ বাংলাসাহিত্যের নিরিখে তা প্রকৃত মৌলিক হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা।

দুই

আগেই বলা হয়েছে, জীবনানন্দের গদ্য-উপন্যাস রচনাকালের স্পষ্ট দুটি ভাগ, তাতে তাদের রচনা-রীতি ও বিষয়ও দেখা দিয়েছে দু'রকমভাবে। তিরিশের দশকের প্রথমার্ধে লেখা গদ্য-উপন্যাসগুলির চরিত্র যে রকম, চল্লিশের দশকের শেষার্ধে লেখা গদ্য-উপন্যাসগুলির চরিত্র তার চেয়ে ভিন্ন প্রকার। পরবর্তী পর্যায়ে যে গদ্য-উপন্যাসগুলি লিখেছেন, তা অবশ্যই অনেক পরিণত ও জীবনানন্দের সাহিত্যিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যদিও পাঠক আগ্রহ হারাতে পারেন প্রথম পর্বের উপন্যাস পড়ে যেখানে প্রায় প্রতিটি উপন্যাসের নায়কেরা উপনীত মধ্য-যৌবনে, তারা জাগতিক প্রত্যাশায় নিজের গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে বাসা বাঁধে কিন্তু চাকরি না পেয়ে জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়েছে। নায়কেরা সবাই বিবাহিত ও সন্তানের জনক, ফলে বেকারত্বের জ্বালা হতাশার চূড়ায় পৌঁছে দেয় তাদের। 'কারুবাসনা'র নায়ক হেম, বা 'নিরুপম যাত্রা'র প্রভাত, 'জীবনপ্রণালী'র শচীন বা 'প্রেতিনীর রূপকথা'র নায়ক—সবারই জীবনযাপন থেকে জীবনদর্শন সবই প্রায় একই তারে বাঁধা—সবটাই লেখক জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের আদলে তৈরি। লেখকের নিজের ছাঁচে নায়ক হলে তাতে আপত্তির কিছু থাকে না। কারণ পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই আত্মজৈবনিক। কিন্তু যা লক্ষ করার বিষয় তা হল, একজন লেখক একই বক্তব্য বলার জন্য এতগুলি উপন্যাস কেন লিখবেন। প্রধানত সংলাপ প্রকৃতির বর্ণনা কিংবা আঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের জন্য একটি উপন্যাস আরও কম দিয়ে লেখাই যথেষ্ট ছিল। এ-কথা অবশ্য বলাই যায় যে, এতগুলি উপন্যাস নিয়ে আসলে একটি অখণ্ড উপন্যাস। তবু উপন্যাসের ধর্ম নিয়েও আলোচনার অবকাশ থেকে যায়। এই পর্বের প্রায় সব উপন্যাসই অসম্পূর্ণ। প্রচলিত উপন্যাসের বিরোধী ও প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রধান যৌথ প্রকৃতি-বর্ণনা ও সংলাপ বাহুল্য। হয়তো এটাই জীবনানন্দের ধর্ম এমন ভাবা যেতে পারে, তবু শেষ পর্যন্ত এই পর্বের উপন্যাসগুলি সাহিত্যে কি কোথাও নিয়ে যায় পাঠককে।

কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ের উপন্যাসে জীবনানন্দ যেমন পরিণত তেমনই অনেকখানি প্রগলভ। সবচেয়ে বড় দুটি উপন্যাস 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' একেবারেই সময়-চেতনার লেখা। প্রথমটির পটভূমি অবিভক্ত বাংলার গ্রামের এক বড়জন পরিবারে, কিন্তু দ্বিতীয়টির ঘটনা সেই গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে গিয়েছে। 'মাল্যবান' তুলনায় ছোট উপন্যাস। 'সুতীর্থ'ও। মাল্যবান-এর নায়ক মাল্যবান ও তার স্ত্রী উৎপলার মধ্যে প্রেম অবহেলা কিংবা 'সুতীর্থ'-র অবদমিত যৌনতা সব কিছুই জীবনানন্দ প্রকাশ করেন নানান প্রতীক ব্যবহার করে। বাসমতীর উপাখ্যান বাদে শেষ পর্বের তিনটি উপন্যাসের একটিই কেন্দ্রবিন্দু—অর্থহীন বা অর্থে অসফল মানুষ এমন নায়ক যারা আত্মহত্যা প্রবণ হয়েছে বাধা অর্থাৎ যান্ত্রিক আধুনিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

এই পর্বের উপন্যাসেও কিন্তু জীবনানন্দ প্রকাশরীতির প্রথাবদ্ধ গণ্ডীর ধার ধারেননি। তিনি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-রীতির যিনি কড়া সমালোচনা করেন, তাঁর পক্ষে এমন রাস্তাই তো স্বাভাবিক। যদি তাঁর কবিতাকে বলা হয় পূর্বসূরিদের অনুসারী, উপন্যাসগুলিও হয়তো তাই। তবে উপন্যাসগুলির যে জটিলতা পাঠককে মুগ্ধ করে রাখে তা হল পংক্তিতে পংক্তিতে প্রতীকের প্রচুর ব্যবহার। জীবনানন্দ ও প্রতীক প্রায় সমার্থবাচক শব্দ।

তবে জীবনানন্দের উপন্যাস বিষয়ে একমত হয়ে কথা বলার অবকাশ ঘটেনি, কেন না তাঁর উপন্যাস নিয়ে আরও বহু আলোচনার অপেক্ষা রইবে। বিশ্লেষিত হবে আরও নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। এখনও এ-কথা বলার সময় আসেনি তিনি তাঁর সমকালের উপন্যাসিকদের থেকে কতটা পিছিয়ে কিংবা এগিয়ে। যে-কথা এই মুহূর্তে বলা যায়, তার বাস্তব অর্থ, প্রতীকের ব্যবহার তার সমসাময়িকদের মতো নয়, কিংবা তাঁর চেতনার ব্যাপ্তি অন্য অনেক শক্তিমান উপন্যাসিকদের চেয়ে অনেক বেশি হলেও তাঁর জটিলতার ব্যাপ্তি, জীবনযাপনের নানা দিক উন্মোচন কিংবা মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য বিষয়ে তাঁর দেখা খোলা ঝাপসা নয়। নিজেকে নিয়েই একজন লেখক একাধিক উপন্যাস লিখতে পারেন ঠিকই, কিন্তু মানুষের জীবনের স্বাদ তো দু-এক রকম নয়, তাতে বিভিন্ন বয়সে জীবনকে দেখা যায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যার একান্তই অভাব জীবনানন্দে।

আলো ও অন্ধকারের সেতু

প্রত্যূষপ্রসূন ঘোষ

জীবনানন্দ দাশ নাম, তাঁর অধিকাংশ কবিতায় আনন্দের যেমন কম কাজ করে গেছে যেমন বিষণ্ণতার আবহে ঘনিয়েছে। রৌদ্র, আলো, সূর্যের প্রতি তাঁর আর্তি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু অন্ধকার, ছায়া, দুঃস্বপ্ন, অসুখ, রোগ ও মৃত্যুর গভীর ছায়া তাঁর সমগ্র কাব্যচেতনার উপর হালকা পোঁচে এক আস্তরণ ছড়িয়ে দিয়েছে। যেন শুভ্র পরিচ্ছন্ন পটের উপর পড়েছে রঙের আবরণ আলোর পূর্ণ বিস্তারকে কিছুটা স্তিমিত করে দিয়েছে। পাঠকের মনে এর একটা প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া আছে। মেঘবেলা দিনের শুরুতে আকাশে মেঘ জমে থাকলে এক ধরনের শিথিলতা মনের উৎফুল্ল ভাবকে তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য থেকে ম্রিয়মাণ করে দেয়। আবার এই ক্রিয়ার একটা উল্টো দিকও রয়েছে। খুব বেশি উজ্জ্বল আলোর তাপ, মানুষকে—বিশেষ করে শহর দুবলা মানুষকে একটা বড় ধাক্কা দেয়। সেই অসহনীয় উজ্জ্বলতা ও উত্তাপ তার চোখের স্নিগ্ধতাকে ক্ষুণ্ণ করে, তার শারীরিক আরামকে বিঘ্নিত করে তোলে। জীবনানন্দের কবিতা আমাদের অনিবার্য স্নিগ্ধ মনে ছায়াঘেরা শান্তি দেয়, অন্তত ক্লান্ত ও বিষণ্ণতায় ঢেকে দেয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের কোন বিশেষ মুহূর্তে তাঁর কবিতা চিত্তপ্রশান্তি এনে দেয়। অথবা বিষণ্ণ মুহূর্তে মনকে বিদ্ধ করে। এই ভূমিকা জীবনানন্দের কবিতার সহজ এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার আভাস দেবার জন্য।

কিন্তু কবিতা নিবিষ্টচিত্তে পড়তে পড়তে ক্রমশ আমাদের নিয়ে যায় অনুভূতির অন্তর্লোক অতলান্ত আকর্ষণে। সেই গভীরে ডুবতে যেতে তৈরি হওয়া, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। প্রকৃত কবিতা পাঠককে অনিবার্য পরিণামে সেইখানে নিয়ে যেতে চায়। প্রাথমিক আলোচনাসূত্রে জীবনানন্দের কবিতা পুনর্বার পাঠে আগ্রহী করে তুলবে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রথম কবিতা 'নির্জন স্বাক্ষর' যখন পড়ি, তখন কী ধরনের বেদনায় আমরা জড়িয়ে পড়তে থাকি তা একবার দেখা যাক।

যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে,
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে!
অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার!
তোমার এ জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল।
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশির জল,
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই
শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে!
আমি ঝরে যাব; তবু জীবন অগাধ।
তোমারে রাখিবে ধরে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে—

এখানে কি কবি মৃত্যুর কথা দিয়ে অমরত্বের কথা বলেছেন? তিনি মৃত্যুর গভীর পথে নিয়েছেন, যা কি জীবনে না পাননি, যে সব সাধ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে পূর্ণ হয়নি, তা হয়তো মৃত্যুর পর পূর্ণ হবে এই তাঁর বিশ্বাস। এমন হতে পারে, যে দুটি-ই সত্য: হেমন্তের ঝড়ে পাতাগুলো বৃক্ষের আশ্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তারা ডালপালা থেকে পড়ে, পথের উপরে ঝরে পড়ে অসহায় পাতা। সেই মৃত পাতাগুলি স্বাভাবিক বাসনায় যুক্ত, জীবনসম্পৃক্ত থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু কবির তীব্র বাসনা, তাঁর মনের প্রেমিকা নারী বুকের 'পরে

[illegible] বিয়েতে উপস্থিত কবি

শুয়ে থাকবেন। অনতিদীর্ঘ কৃত্রিম ঘুমে তিনি থাকবেন কবির সত্তা ও অস্তিত্ব জুড়ে। এ যেন মৃত্যু ও জীবনের গভীর প্রণয় ও প্রেমের মেলামেশি। মৃত্যুর অমোঘ অতিচিহ্ন মেনে নিয়ে জীবন চলতে থাকে অথচ অনুপম ধারাবাহিকতায়। মৃত্যু জীবনের ওপর শেষ যবনিকা টেনে দিতে চাইলেও তার স্রোত চিরতরে বন্ধ করে দিতে চাইলেও জীবন সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। মাটির তলা থেকে বীজের দুটো ঠোঁট নড়ে জীবনের নব অঙ্কুর উদ্গত হয়। মৃত্যুর দুর্মরতা নেতানোকে অনায়াসে অতিক্রম করে যায় জীবন। যেমন বাতাস সর্বত্র বজ্রপাত থেকে সমস্ত শূন্যতাকে ভরাট করে দেয়। আর্কিম চেতনা এবং সীমাহীন কালের প্রেক্ষিতে মৃত্যু ও জীবনের ধারণা আপেক্ষিক মাত্র। যথার্থ কবির কল্পনা কোন অসাড় অবিন্যস্ত অসংগঠিত ভাবনাকে প্রশ্রয় দেয় না। সম্ভবত সে কারণেই জীবনানন্দ কল্পনামনীষা বা কল্পনাপ্রতিভার উল্লেখ করেছেন। কল্পনার অন্তর্গত এই মনীষা অথবা প্রতিভাই সার্থক সৃষ্টির জন্ম দিতে পারে। সৃষ্টিকে কবে তুলতে পারে এক সম্পন্ন ও স্বচ্ছ শিল্প, যা স্রষ্টা ও পাঠক। আলোচ্য কবিতাটির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সেই রাতে তাঁর বুকে জমা শিশিরের জল, তাই কি নাস্তির পক্ষে চিরন্তন প্রেমিকের কাছে যথেষ্ট? কবির বেঁচে থাকার চেয়েও সাধ! এ রকম সংশয় মহৎ কবিতার লক্ষণ বলে মনে হয়। আমি চলে যাব, তবু জীবন অগাধ / তোমারে রাখিবে ধরে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে— / আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!

কবির অস্তিত্ব যেন ধেনু ধেনু হয়ে প্রকৃতিতে মিশে যায়— মানুষের নতুন, আকাশের অধিকে নক্ষত্রের পুনরায় নীড়ে। ওঁর মৃ-শাওয়া অজস্র বাক্য এবং মাধুর্য রয়েছে এই কবিতায়— রাতে রাতে হেঁটে নক্ষত্রের সঙ্গে তারে আমি পাই নাই; কোনো এক মানুষীর মনে কোনো এক মানুষের তরে / যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে। প্রেমের জন্য আত্মিক আকর্ষণ তৃষ্ণা, ভালোবাসা পাওয়ার অনিঃশেষ আকাঙ্ক্ষা এখানে এক অনন্য কবিত্বময় বাঙ্ময়। কোন এক নারীর মনে কোন এক পুরুষের জন্য যে অফুরন্ত প্রেম, হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত এবং নিস্তব্ধ স্পন্দমান। সেই আবেগ, সেই অধিকার স্পন্দন কবিতাটির নিশ্চল সংকটের ধর্মে জনক পৃথের মতো থেকে যাচ্ছে চিরদিন—অনন্তি-অনুধ্যানকে স্পর্শ করে।

কবিতাটির সমগ্র পরিসরে সহ অনিশ্চয়তার অবকাশ-এর ইঙ্গিত রয়েছে। আছে তুলনায় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রতীক বা বহুমাত্রিক। বহু বাক্যে ও অর্থবোধের বহন করে আছে পংক্তির পর পংক্তি—যে নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত / লাগিতেছে আমার শরীরে। একদিন যে সব বাংলা কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে, সে সবে এ ধরনের ভাবকল্পনা আমরা পাইনি। নক্ষত্রের মৃত্যু সে কেমন, নক্ষত্র কিভাবে মরে যায়। তার বুকে কি মৃত্যুর শীত, তা কিভাবেই বা কবির শরীরে লাগতে পারে? একথা ঠিক, কোন কবিতার আক্ষরিক বা সাধারণ অর্থগত ব্যাখ্যা এভাবে করা যায় না, সঙ্গতও নয়। তবে পাঠকের একথা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না, যে বাংলা কবিতায় এ জিনিস অনাস্বাদিত—সেই তারা জেগে আছে তার দিকে ফিরে / তুমি আছো জেগে— / যে আকাশ জ্বলিতেছে তার মতো মনের আবেগে / জেগে আছো— / জানিয়াছ তুমি এক নিশ্চয়তা—হয়েছ নিশ্চয়! / হয়ে যায় আকাশের তলে কত আলো—কত আগুনের ক্ষয়...জীবনের গান গেয়ে জেগে আছো—তবুও মৃত্যুর বাধা দিয়ে / পার তুমি; / তোমার আকাশে তুমি উষ্ণ হয়ে আছো, তবু— / বাহিরের আকাশের শীতে / নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়, / নক্ষত্রের মতন হৃদয় / পড়িতেছে ঝরে।

এই কবিতার পটভূমি তাঁর ভাষায় মহাপৃথিবী। আমাদের কাছে সমগ্র সৌরমণ্ডল, পৃথিবী, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, মানুষ, তার জীবনের সম্ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষার চিরন্তনতা, তার প্রেম অপ্রেম, ভালোবাসার বেদনাময় অন্তর্নিহিততা, মৃত্যু এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করে জীবনের মহাকল্লোল, তার চেতনার অনন্ত প্রবাহ, এই সব কিছু spatial, temporal এবং transcendental-কে নিয়ে গড়ে উঠেছে। পুনরাবৃত্ত পাঠে বুঝতে পারা যায়—নক্ষত্র জগতেও অনন্ত জন্ম-মৃত্যু ঘটে চলেছে। কিছু নক্ষত্র নিভে যাচ্ছে, কিছু নতুন নক্ষত্র জ্বলে উঠছে, তাদের সংঘাত-বিন্দু বাষ্পের বলয়ে যাচ্ছে—পারস্পরিক দূরত্ব এবং অবস্থান ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, ধ্বংস ও নির্মাণের খেলা চলেছে সৌরজগতের অন্তহীন

[illegible]

নিঃসীম ব্রহ্মাণ্ডে। মানুষের জীবনে নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তা, দুঃখ-জাগরণ, ক্ষয়-বৃদ্ধি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস সমানে আবর্তিত হচ্ছে, স্থান পরিবর্তন করছে। স্মরণ করা যেতে পারে—হয়ে যায় আকাশের তলে কত আলো কত আগুনের ক্ষয়; / কতবার বর্তমান হয়ে গেছে ব্যথিত অতীত— / তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত / যে নক্ষত্র ঝরে যায় তার! / যে পৃথিবী জেগে আছে, তার ঘাস-আকাশ তোমার!

এখানে paradox বা কূটাভাস গুরুত্ব দিয়ে বুঝে নিতে হবে। কবির শরীরে মৃতনক্ষত্রের বুকের শীত এসে লাগছে—তিনি অনুভব করছেন। কিন্তু অন্যজন—নারী, প্রেমিক বা অন্য কেউ—এই মৃত্যুর হিমস্পর্শ অনুভব করছে না। এর ব্যাপের অনুষঙ্গে—একবার কথা ক'য়ে দেশ আর দিকের দেবতা / বোবা হয়ে পড়ে থাকে—ভুলে যায় কথা! / যে আগুন উঠেছিল তাদের চোখের তলে খ'সে / নিভে যায়—ডুবে যায়—তারা যায় স্খ'লে! / নতুন আকাঙ্ক্ষা আসে—চলে আসে নতুন সময় / পুরানো সে নক্ষত্রের দিন শেষ হয়, / নতুনেরা আসিতেছে ব'লে! / আমার বুকের থেকে তবুও কি পড়িয়াছে স্খ'লে / কোন এক মানুষীর তরে / যেই প্রেম জ্বালায়েছি পুরোহিত হয়ে তার বুকের উপরে!

প্রসঙ্গত মন্তব্য করা যায়, কবি জীবনানন্দের কবিতায় মৃত্যুর প্রতি যেমন ভালবাসা স্পষ্ট হয়েছে, জীবনের প্রতি, বেঁচে থাকার দিকে তাঁর ভালবাসাও সমান তীব্রতায় উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর 'জীবন' কবিতা থেকে একটি স্তবক উদ্ধার করলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে—

চারিদিকে থেকে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর—
নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান!
ফসল উঠিছে ফলে—রসে রসে ভরিছে শিকড়;
লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ!
সে কোন্ প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিল যে সন্তান
অঙ্কুরের মতো আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে!
আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ—
সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে!
পৃথিবী রয়েছে জেগে চক্ষু মেলে—তার সাথে সেও আছে জেগে!

'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতার শেষ তিনটি লাইন—

আমি চলে যাব—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধরে সেই দিন পৃথিবীর পরে;—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে।

ধ্রুবপদের মতো এই লাইন একাধিক বার কবিতায় ঘুরে ঘুরে এসেছে—তার context পালটেছে, canvas পালটেছে। কিন্তু অস্তিত্ব পরিণামী বক্তব্য মূল বক্তব্যের মতো একই জায়গায় ফিরে এসেছে। কবি তাঁর স্থির প্রত্যয়ে মগ্ন। তিনি থাকবেন না, সৌরমণ্ডলে ক্ষয় ও নির্মাণ অবিরত চলতে থাকবে। আগুন নিভে যাবে—নতুন আলো জ্বলে উঠবে, জেগে উঠবে—পুরনো সময় শেষ হয়ে যাবে, নতুন সময় আসবে। কিন্তু কবি নিজে তাঁর অস্তিত্ব, বিশ্বাস, বিস্ময় নিয়ে মৃত্যুর অতল গভীরে নিদ্রিত থেকেও জানবেন—সে বেঁচে থাকবে, সে আছে, সে তাঁরই জন্য বেঁচে থাকবে। আর তাঁর সকল গান গীত হয়ে উঠবে তাকেই লক্ষ্য করে। তাঁর নশ্বর অস্তিত্ব পেরিয়ে সেই গান অনুরণন তুলবে পৃথিবীর ও আমাদের হৃদয়ে—চিরদিন, চিরকাল।

জীবনানন্দের কবিতার ভাষান্তর

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

অনুবাদ এমন জিনিস যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সর্বদা করা হয়, অথচ একদিক থেকে দেখতে গেলে করা প্রায় অসম্ভব। কবিতা অনুবাদ তার মধ্যেও সবচেয়ে কঠিন। যেমন শব্দ যেখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, সেখানে তাদের শৈলীর সংকেত রূপরেখা বাদ দিয়ে কেবল বিষয়বস্তু, বক্তব্যটুকু কতখানি সত্য বা আকর্ষণীয় হতে পারে। সব ধরনের রচনাতেই আঙ্গিক ও বক্তব্য, অবয়ব ও অন্তর্নিহিত বিষয় পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। কবিতার ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য। অনুবাদ তাই আরও বেশি কঠিন।

সাধারণভাবে কবিতা অনুবাদকেই যদি গ্রহণও ভিন্নতর দেখা যায়। তবে জীবনানন্দের কবিতার বিষয় কি বলা যাবে। জীবনানন্দ একেবারেই বাঙালি কবি বা বাংলার কবি। বাংলার মুখ দেখেছিলেন বলে তিনি আর বাকী পৃথিবীর মুখ দেখার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। এ কথা হয়তো আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। তবে তাঁর অনেক কবিতায় যা এসেছে তা বিশেষভাবে বাংলার, আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলের রূপ। অথচ তিনি দেশকে মাতৃরূপে বা দেবীরূপে কল্পনা করেননি। যদিও সে যুগে এটা খুবই প্রচলিত রীতি ছিল। সে সব বরং অনুবাদের মাধ্যমে ধরা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় এসেছে বাংলার প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ বর্ণনা। সেই সঙ্গে প্রাচীন মিথ, কিংবদন্তী, লোকগাথার নানা অনুষঙ্গ আসে। এখানেই কাব্যের প্রাণ নিহিত, আবার এখানেই অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রধান প্রশ্ন। কিভাবে ভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত করা যাবে ধানসিঁড়ি বা নাটোরকে। অন্য সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে তুলে ধরা যাবে চাঁদ সদাগর বা মনসার কাহিনীকে, বেহুলাকে বেহুলার ভেলাকে, ঘোড়ার পিঠে রায় বাঘিনীর ছুটে চলা বৃদ্ধিকে। ছিন্ন বাক্যের ভিতর কতখানি তাৎপর্য বহন করা যাবে তা বোঝানোও শক্ত হবে।

অবশ্য বলা যেতে পারে, বিপরীত প্রক্রিয়া কি ঘটে না। ইউরোপীয় কবিতা মিথ, প্রতীক, উক্তি ইত্যাদি সম্বলিত হয়ে নানা ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এতে কি কোন বাংলা কবিতার কিছু যে প্রভাব নিয়ে এসেছেন তেমনি ভাবাত্মকে। এর উত্তরে বলা যায়, সাহেবদের আনুগত্যে ইউরোপীয় মিথ এশিয়াতে যতখানি পরিচিত, উল্টোটা তা নয়। অবশ্য এলিয়ট বা অ্যাপোলিনেয়ারের মতো কবি ভারতীয় মিথ বা ধর্ম বিশ্বাসকেও কবিতার প্রেরণা বা বিষয় করেছেন।

এ সব বাধা সত্ত্বেও জীবনানন্দের কবিতা ভাষান্তরিত হয়েছে ও হচ্ছে। এমন কি এক জাপানি অধ্যাপক বিশেষজ্ঞ, বাংলা বিশেষজ্ঞ জাপানি ছাত্রও রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ি নিয়ে গবেষণা করার পাশাপাশি জীবনানন্দের কিছু কবিতা অনুবাদ করেছেন। যত দূর জানা যায়, এই অনূদিত কাব্য সংগ্রহ জাপানে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। সম্প্রতি একযোগে সংস্থা ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ও স্প্যানিশ ভাষায় জীবনানন্দের কিছু বাছাই করা কবিতা অনুবাদ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। অতীত ও বর্তমানের আরও কিছু প্রচেষ্টার কথা বলা হবে। এ সবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আকাদেমির প্রকাশিত জীবনানন্দ কবিতার এক সংকলন। সম্পাদক, সুকান্ত চৌধুরী। শিশিরকুমার দাশ ভূমিকা লিখেছেন। সুমিতা চক্রবর্তী যোগ করেছেন নোট বা ব্যাখ্যা।

বেছে নেওয়া কবিতাগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার পাশে স্থান পেয়েছে অতখানি বিখ্যাত নয়, এমন কবিতা। রোমান্টিক কবিতার পাশাপাশি থাকে কখনও শ্লেষাত্মক বা তিক্ত বাস্তবতার কথা যায়। রূপসী বাংলার

মনটিপুরে আধুনিক সাহিত্য জীবনের কলকাতা বোবাইয়ের আলো-আঁধারি ছবি। 'বাস', 'আর তিন', 'বনলতা সেন', 'নব বিজন হাত', 'সুদর্শন', 'সারথী', 'সুবিনয় মুস্তাফি', 'অনুপম ত্রিবেদী', 'সুখ', '১৯৪৬-৪৭', 'সিন্ধু সারস' প্রভৃতি কবিতার অনুবাদ এই সংকলনের অন্তর্গত।

অনুবাদকদের মধ্যে আছেন উৎপলকুমার বসু, শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী, ভারতী চক্রবর্তী, সুকান্ত ও সুচিত্রা চৌধুরী ও অন্যান্যরা। কিছু পরিমাণে এই প্রজেক্টকে যৌথ উদ্যোগ বলে অভিহিত করলে ভুল হবে না। ভূমিকায় যেমন জীবনানন্দের কবিতার প্রত্যেকটি দিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে, তেমনি আছে অনুবাদের রীতি ও পদ্ধতি সংক্রান্ত কিছু কথা। অনুবাদকদের পরিচিতি, জীবনানন্দ সম্বন্ধে ও অনুবাদ সম্বন্ধে তাদের চিন্তা-ভাবনা, এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

তবে অনুবাদের রীতিনীতি নতুন করে ভাবতে হল, জীবনানন্দের কবিতার প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখতে। প্রথমে চেষ্টা হয়েছিল মূল কবিতার আকার (verse form) এবং মিলের ছক (rhyme-scheme) কিছুটা অপরিবর্তিত রাখার। কিন্তু শীঘ্রই অধিকাংশে মিল বাদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার এক বড় কারণ, জায়গার নাম, (place names) অন্যান্য পরিচয়সূচক নাম (proper names) উদ্ভিদ, ফল, ফুল, পাখির নামের মতো 'টেকনিক্যাল' টার্ম ইত্যাদির ছড়াছড়ি। এক হিসাবে বলতে গেলে এগুলি অপরিবর্তনীয় অংশ। (non-negotiable items) অর্থাৎ এদের তুলে ধরা (paraphrase) সম্ভব ছিল না। তাছাড়া শব্দক্রম (word-order) বা বাক্য গঠনও খুব বেশি বদলানো যেত [illegible] এমন কি এর ক্ষেত্রে এ জাতীয় কথা খুব বেশি ছিল না, সেক্ষেত্রেও মূল কবিতার বিশিষ্ট পরিপ্রকৃতি জোর করে দিলেও হয়ত বজায় রাখতে পেরে থাকতে হত।

আমাদের মনে হয়েছিল, মূল কবিতার ভাব ও প্রভাব (impact) যত দূর সম্ভব বজায় রাখা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি দরকার হয়, তার জন্য মিলের ছকও বাদ পড়তে পারে। অনুবাদে যেখানে পূর্ণ বা আংশিক মিল রয়েছে, সেখানে মূল কবিতাতেও অনুরূপ মিল চোখে পড়বে। কিন্তু অনুবাদে কোথাও মিলের অভাব দেখে ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে মূল বাংলাতেও মিল নেই। ব্যাপারটা আপস রফা (compromise) ছাড়া কিছু নয়। বিশেষত মূল রচনা যেখানে একটি প্রতিষ্ঠিত কাব্যের ছক (established verse form) অনুসরণ করেছে। (যেমন, ''রূপসী বাংলা''র সব কবিতাই সনেট।) কিন্তু আক্ষিকের হুবহু অনুকরণ করা অনুবাদের আবশ্যিক শর্ত নয়। আমরা আশা করি, আমরা মূল রচনার গুণ যতখানি বজায় রেখেছি, তার মাধ্যমে জীবনানন্দের সৃষ্ট বিচিত্র জগতের হয়ত একটু মিলবে। একাধিক অর্থ বহনকারী (ambiguous) সৃষ্টির রূপরেখা ও অবয়ব (frame and texture) বুঝতে পারা যাবে।

(অনুবাদ বেশিকার)

যেখানে মাসের বাংলা নামের কোনো বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, সেখানে সে নামই বজায় রাখা হয়েছে। অন্যত্র বসানো হয়েছে সাধারণভাবে ঋতুর নাম 'monsoon', 'winter'। বাংলা আর ইংরেজি বা ইউরোপীয় ঋতু যে ঠিক এক অর্থ, এক ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে না, একথা বলাই বাহুল্য। যেমন, ইংল্যান্ডে শীত মানে পাতা। প্রকৃতির আপাত মৃত্যু ও নতুন জীবনের জন্য প্রস্তুতি। এখানে শীত মানে একটি আরামদায়ক আমেজ। পিকনিকের সময়, ফুল ফোটার মরশুম। ইংল্যান্ডের নবান্ন সঙ্গে এ দেশের ঔপনিবেশ পাড়া, জাগিয়ে দেওয়া কুঁড়ি তুলনীয় নয়। আবার মিলও নেই তা নয়। যেমন জীবনানন্দের কবিতায় বার বার এসেছে। বৈষ্ণব কবি ও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বসন্ত ও বর্ষার ক্ষেত্রেও হয়তো এই ঋতুর উপস্থিতি জীবনানন্দের মানস জগতে অধিক অন্বয়ীয়। বাংলা হেমন্ত ও ইংরেজি 'অটাম' ঠিক সমার্থক না হলেও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতিতে 'অটামে'র তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা বহুমুখী। এই ঋতু পাতা ঝরার সময়, কুয়াশার সময়, আবার নানা ফলের পরিপক্কতার সময়। বোদলেয়ার বলেছেন, 'হেমন্তের পাতা ঝরানো নিঃশ্বাস, 'বিষণ্ণ বাতাসে'র কথা। অন্যদিকে কীটস তাঁর বিখ্যাত 'ওডে' 'অটাম'কে বর্ণনা করেছেন Season of mist and mellow fruitfulness রূপে।

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় এর সংশয়িতের আছে। অথচ এমনি ব্যঞ্জনা বা তাৎপর্য আছে যা ইংরেজি 'ফাউন্ড' বলা অসম্ভব। তবু এই অনিবার্য বাধা অতিক্রম করেই অনুবাদের পথে অগ্রসর হতে হবে—যতটা সম্ভব।

সংকলনের সব কবিতার অনুবাদ তুলে ধরা সম্ভব নয়। কয়েকটি উদাহরণ থেকে আমরা ব্যাপারটা আংশিকভাবে কিছুটা বুঝতে পারব। ভূমিকায় বলা হয়েছে, মূল বাংলার যে শিল্পগুণ তিনি তাহার ফুটিয়ে তোলা যেত না, অথবা যেমন যেটা বলতে গেলে কবিতার মূল বিষয়বস্তু ব্যাহত করতে হত। যেমন বৈশিষ্ট্যগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি ছিল, 'বনলতা সেন' সম্ভবত কবির সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবিতা। সুজাত চৌধুরী তার অনুবাদ করেছেন এইভাবে:

Her hair the dark night long ago in Vidisa,
Her face a Sravasti carving beyond the farthest seas
As when a sailor, helm broken, his bearings lost,
A grassy green plain set in a camamon island seas,
I saw her through the darkness. She asked, 'Where were you so long?'
Raising her eyes like bird's nests, Banalata Sen of Natore

দুটোর মধ্যে তুলনা করলেই পার্থক্য বোঝা যাবে, যে পার্থক্য না এনে উপায় ছিল না। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' অর্ধ-মাত্রা-এর ছন্দোগতি, ব্যঞ্জনার দীর্ঘতা এক বিশেষ অতিন্দ্রিয় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে, যা অনুবাদের ক্ষেত্রে কোনো ভাবেই আনা সম্ভব নয়। পরবর্তী পংক্তিতে 'এতদিন কোথায় ছিলেন' এর পরে 'বনলতা সেন' বিস্ময়সূচক এটাও ইংরেজিতে প্রতিফলিত করা কঠিন। যদি বা করা যায়, তার গঠন তাকে এমনভাবে বাঁকা রেখা করতে হবে যে মূল বাংলার রস হারিয়ে যাবে। 'ছিলেন' সম্বোধনে অনির্দিষ্ট হলেও যে সামান্য দূরত্ব, অপরিচয়ের ভাব, তাও ইংরেজিতে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। ইংরেজিতে 'তুমি', 'আপনি'র তফাৎ নেই। অন্য কোনো কোনো ইউরোপীয় ভাষায় অবশ্য আছে। অন্যদিকে place, name, ভূমিকার কথা অনুসারে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বিদিশা, শ্রাবস্তী ইত্যাদি প্রাচীন ভারতের স্মৃতি বা সুর বহন করে আনে। Camamom Island। দারুচিনি দ্বীপের আক্ষরিক অনুবাদ। দুটি কথার যেন সুগন্ধ হারালো। অনুবাদের ভাষাও তথা সম্ভব, জীবনানন্দের ভাষার আক্ষরিক বাধা হয়েছে। পরিবর্তন ও মূলানুগতা, কিসের ওপরই ভাষান্তরের সফলতা নির্ভরশীল।

তিন শব্দ দিয়ে কথার মধু বজায় রেখে কবিতার রূপ তুলে ধরা যায় এক দুইটা, 'আট বছর আগের একদিন।' মূল বাংলার বিস্ময়সূচক পংক্তিগুলি এই রকম।

থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে বলেনি কি: বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?

চমৎকার!—
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার।'

অনুবাদে আমরা পাই,

The decrepit blind owl,
Did it not come to say:
'So the hag-moon's been washed away on the flood-tide?
Splendid!
Let's catch a few mice now!

মিল এখানে নেই। বাংলার ছোঁয়াও করা হয়নি। কিন্তু hag-moon 'বুড়ি চাঁদের' তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলেন সম্পূর্ণ সঠিকভাবে। 'বুড়ি' কথাটি নানাভাবে অনুবাদ করা যেত। তবে এ ক্ষেত্রে যে বিশেষ ব্যঞ্জনা, বার্ধক্যের প্রশান্তি নয়, বীভৎস, এক কালো কিছু, তা ইংরেজি hag কথার মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে। 'আকাশলীনা' কবিতার প্রথম কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ,

Suranjana don't go there,
Don't talk to that young Man
Come back, Suranja,
O this night of silvery star fire

মূলে 'ওই যুবকের সাথে'র পরে 'নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে' বিস্ময়সূচক। দিন বদল দিয়েও কবিতার আকুলতা, বিশেষ অনুভূতি, যে চলে গেছে তাকে ফিরে ডাকার আকুতি, ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

জীবনানন্দের কবিতায় চিত্র, চিত্রকল্প, লোককথার ব্যবহার সুবিদিত। সংকলন তালিকাতেও এ সবের জন্য স্থান রেখেছে। আশা দেওয়া হয়েছে বইয়ের শেষে সংযোজনে। যারা এ জাতীয় বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত নয়, তারাও প্রাথমিকভাবে পাঠ রস গ্রহণ করতে পারে। পরে নোটস পড়লে আরও গভীরভাবে বুঝতে সক্ষম হবে, এমন সম্ভাবনাও আছে। এক সংস্কৃতি থেকে আর এক সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতিতে নিয়ে যাওয়ার পথ যথাযথ সচেতন উদ্যোগ করা হয়েছে।

অনুবাদ সতী ও সুন্দরী দুই-ই এক সঙ্গে হতে পারবে না, মূলের প্রতি আনুগত্য অথবা নিজস্ব সৌন্দর্য, সাবলীলতা, দুটোর একটি বেছে নিতে হবে। একথা আমরা অনেকবার শুনেছি। জীবনানন্দ অনুবাদ, যা অনুবাদের পক্ষেও বিশেষভাবে কঠিন, উভয় লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করেছে। এই সামঞ্জস্য শেষ নয়, শুরু। যে কবি একান্তভাবে বাংলার বাঙালি একান্তভাবে নিজের, তাঁর পরিচয় আরও ব্যাপক করার অপেক্ষায় আমরা রইলাম।

মাথার ভিতরে বোধ, রক্তে বিপন্ন বিস্ময়

উৎপল চক্রবর্তী

সব প্রাণ নিঃসঙ্গ—একজন কবির কাছে এই সত্যই প্রধান, কেননা একজন কবিই যেমন পারেন নিঃসঙ্গতাকে অক্ষয় করে তুলতে, তেমনই অনন্ত কোলাহলে বিজন হয়ে ওঠার যোগ্যতার কৌশলও তার হাতের মুঠোয়—বোদলেয়ারের এই বিখ্যাত উক্তিটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি বুদ্ধদেব বসু। কথাগুলো কবি জীবনানন্দ সম্পর্কে খাটে বটে, মানুষ জীবনানন্দ সম্পর্কেও বোধহয় ঠিক ততটাই। তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বড় ধাঁধা ছিল যে, তিনি সহজভাবে কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারতেন না বা যাকে আমরা সচরাচর বলি 'আড্ডা', সে জাতীয় কোনও পর্বে বোধহয় তার অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে যাকে বলা হয় আত্মনিমগ্ন, তিনি ছিলেন সেরকমই এক অন্তর্মুখী মানুষ; নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতেই যার কেটে গেছে শেষ দিনটিও। ট্রামের ধাক্কাতে, অসাবধানতায় তাঁর ইঙ্গিত মেঠো ইঁদুরের মতো তাঁকে তুলে নিয়েছে এক অমোঘ গাড়িটি।

কিন্তু তার মানে কি এই যে, বাইরের জগতের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক ছিল না তাঁর? মনে প্রশ্নই জাগে যে, মানুষের সঙ্গে সহজ-স্বাভাবিক মেলামেশায় যার ছিল না কোনও আগ্রহ, তিনি কীভাবে লিখলেন মানুষের জন্য কবিতা! কিন্তু এমনও তো বিশ্বাস ছিল না তাঁর যেমন ভেবেছিলেন আর্চিবল্ড ম্যাকলিশ যে, 'A Poem should not mean but be' অর্থাৎ 'কবিতা বাংলে যেন না মানে, সে শুধু হয়ে উঠতে থাকবে।' আসলে জীবনানন্দ সেই জাতের কবি, যাকে সহজাত স্বভাব, তার কল্পনা বা প্রতিভার ঝড়ের মতো আগুনের স্রোতে ভেসে যাওয়া ছিন্ন মানুষের যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি করে তোলে না, বরং এমনই এক বিস্ময় জাগিয়ে তুলে কবিতা লিখেছেন তিনি, যেখানে বহির্জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে একটি পরিচ্ছন্ন কেবলমাত্র হাতে পৌঁছতে হয় যেখানে অন্তর্মুখীনতার দ্বারা আর অনুভবের প্রকৃত এক একটি শাশ্বত জন্ম। অর্থাৎ কবিতা যেন তাঁর নিজের সঙ্গে নিজেরই বোঝাপড়ার একটি প্রধান জায়গা, যেখানে অবান্তর আর অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যান তার পাঠক। আরও একটু গভীরভাবে তার কবিতায় প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, তিনি সমকালীনতা বা পরিপার্শ্বের সঙ্গে কোনও ভাবে খাপ খেতে নন, নন কোনও দ্বিধান্বিত, বরং আয়েশ আর সব কাজকর্ম থেকে নিয়ে গেছেন পরিণাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি অনুভব করেন যে, সহায়ে যেকোনও বয়সে প্রবীণ এক বোধের আশ্রয় মানুষই একমাত্র অসহায়, পরাঙ্মুখ তখনই জিহ্বের দিকে মুখ দিয়ে অন্তর্মুখীনতায় মগ্ন হতে চান তিনি। তার এখান থেকেই তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে প্রেম। কিন্তু সেই প্রেম আকাশে পরিপূর্ণ নয় কখনই। বিষাদ, ক্লান্তি, তাঁর কবিতায় কখনই যেন প্রত্যাখ্যাত এক প্রেমিক সত্তার হাহাকার, যার উৎস মানুষের মর্মবেদনায়। অথচ এই মর্মবেদনায়, ক্লান্তির অবসাদে মানুষ পারস্পরিক আর্তনাদে লাঞ্ছিত হয় না, তার থেকে মুক্তির জন্য প্রগাঢ় দুঃখ বা মৃত্যুর মধ্যে বেঁচে থাকার বাসনায় লিপ্ত হয়

হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমাতে চেয়েছি আমি
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো
মিশে থাকতে চেয়েছি।

তবে বলা যাক আত্মহননকারী সেই যুবকের কথা। কোনও নারীর প্রণয়ে বঞ্চিত হয়নি যে যুবক, বঞ্চিত হয়নি যে স্ত্রী-পুত্র-প্রেম আর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকেও, বিবাহিত জীবনের ভাল-মন্দের পথে মনের কোথাও কোনও ঘাটতি রেখে যায়নি, সেই যুবকই একদিন রাত্রে যোগ

আত্মহননে। কিন্তু কেন? এর উত্তরে কবি তাঁর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় বলেছেন যে, প্রেম-পরিণয়, শিশুর জন্মাদির প্রাপ্তি কিংবা পারিবারিক স্থিতিশীলতাই জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া নয়। আরও বলেছেন যে, অর্থ বা কীর্তি কিংবা স্বচ্ছলতাই জীবনের শেষ কথা হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে না কখনই। আরও যে এক বিপন্ন বিস্ময় খেলা করে চলেছে আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে, ক্লান্ত থেকে আরও ক্লান্ত করে তুলছে আমাদের সত্তাকে, সেই বিপন্ন বিস্ময়ই আন্দোলিত করছে আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতায়, যার তাড়নাতেই উন্মত্ত হয়েছিল এই যুবকটি আত্মহননের মাধ্যমে মুক্তির আস্বাদ পেতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি প্রশ্ন বা সংশয় জাগ্রত করে রেখে যায় না আমাদের যে, কি সেই বিপন্ন বিস্ময়, জীবন থেকে মুক্তি চেয়ে এই আকস্মিক আত্মহনন?

হয়তো এ প্রশ্নের উত্তর কিছিৎ পেতে পারি আমরা এই কবিতার মধ্য থেকেই, যখন কবি প্রশ্ন করেন 'ঘুম কেন ভেঙে গেল তার' এবং তার অব্যবহিত পরেই আবার ফিরে আসেন আত্মবিশ্লেষণে, 'অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।' আর এই যে আপাত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অবক্ষয়গামী মানসিক অস্তিত্বের সংকট উপলব্ধির এক সত্য উন্মোচন, এর সমর্থন আমরা পেয়ে যাই যুবকটির আত্মহননের মুহূর্ত বর্ণনায়। কোন সময়ে প্রবৃত্ত হয়েছিল সে আত্মহননে? ফাল্গুনের সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ যখন সময়, যখন যৌবনোচ্ছ্বাসনায় তাড়িত হবার কথা তার, সেই সময় রাত্রির কালো ফাল্গুনী-পঞ্চমীর অন্ধকারকেই বেছে নিল সে তার আত্মহননের প্রকৃষ্ট মুহূর্ত হিসাবে। এর থেকেও বুঝে নিতে পারি আমরা যে, তার প্রেম, তার আশা, তার জোৎস্নার সুখনিদ্রা, এ সবই কাল্পনিক! অন্তরে এক গভীর অতৃপ্তি, এক তীব্র হতাশা, যা অপরিমেয় যখন মূর্ত হয়ে শিকড় গেড়েছে তার অন্তরে বহুদিন থেকেই, তার পরিসমাপ্তি সে ঘটাতে চেয়েছে তার মৃত্যুর মাধ্যমে, লাশকাটা ঘরের টেবিলের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে।

যদিও ঘর প্রেমিকাকে ছেড়ে এই রূপে যারা মড়কের ইঁদুরের মতো অন্ধকারে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতেই নারাজ, গভীর বিভীষিকাময় এই মৃত্যু। তবু মুক্তি এখানেই। কেননা যুবকটি জেনেছিল গলিত বা জোৎস্নার মতো কেবলই ফিরে ফিরে প্রতিবাদ করে বেঁচে থাকার মধ্যেই পরিতৃপ্ত থাকতে পারা যায় না। গভীর উপলব্ধির অধিকারী বলেই জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যাবতীয় উপকরণ পেয়েও অতৃপ্ত, অসুখী আর নিঃসঙ্গতার শিকার হতে বাধ্য হয়েছিল সে। পেঁচার মতো চাঁদ ডুবে যাওয়া অন্ধকারে কেমন ইঁদুর জাতীয় শিকার ধরে জীবন ধারণ করে যাওয়ার মধ্যেই যে সব মানুষ সস্তা সুখ খুঁজে পায় তাদের থেকে আলাদা হবার কামনাই, পেঁচা তার মৃত্যুর সময়ে জীবনের জয়গান গেয়েও মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারেনি তাকে। শুধু মৃত্যুর পরেও সে এসে শুনিয়েছে আবার তার জীবনের গল্প, চাঁদ ডুবে যাওয়া অন্ধকারে আবার ইঁদুর ধরার মতো সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বেঁচে থাকার কথা।

যদিও এই আত্মহননকারী যুবকটিকে আমরা সকল যুবকের প্রতিভূ হিসাবে বিবেচনা করতে পারি না, কিন্তু জীবনানন্দের বিখ্যাত 'বোধ' কবিতার নায়কের সঙ্গে এক অদ্ভুত সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। সেই মানুষ, তার মাথার ভিতরে, হৃদয়ের ভিতরে স্বপ্ন, শান্তি কিংবা ভালোবাসা নয়, কেবলই এক বোধ জন্ম নেয়, এক বোধ ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। একে সে এড়িয়ে যেতে পারে না কিছুতেই, তুচ্ছ মনে হয় তার কাছে সমস্ত

কাজ, শান্ত স্নিগ্ধ ধান কাটা হয়, পূজা পার্বণে হাতে হাতে প্রার্থনার মতন সময়। অথচ অন্যান্য মানুষের মতো সংসারের হাল টেনেছে সেও, হাটে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কাছে হাতে হাতে, ঘুরে বেড়িয়েছে ছেলেদের মতো নদীর ঘাটে ঘাটে। তবু এই যেন চিন্তাশীল প্রাণী এরা এই বলে কবি, কোনও কি আলাদা বোধ তার, শান্তির সময় নেই কোনও, ঘুমাবে না কি সে কোনওদিনই? মানুষ মানুষী বা শিশুদের মুখ দেখে সে কি কোনওদিনই আত্মতৃপ্ত হবে না? শান্ত না হয়ে শুয়ে থাকবার কাল?

পার্থিব অনুভূতির বাস্তবীয় উপকরণ থেকে এই যে বিচ্ছিন্নতার আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রীতি-যশ-শান্তি সমস্ত কিছুর থেকে এই যে পলায়নবাদী মনোবৃত্তি জন্মলোকের এই নিঃসঙ্গতার চেতনার জন্যই এই নায়ক অবসাদিত হয়ে পড়ে সমাজ মানসে। যেহেতু পরিপূর্ণ নয় তার সত্তা, তাই সে তুষ্টি হয়, ফাঁদে হাত বাড়িয়ে। এ যেন মানুষ জীবনানন্দের আর এক প্রতিফলন। কবিতার প্রথম সময় থেকেই, অন্তরে টের পেয়েছেন—এ পৃথিবীর সংকীর্ণ ছায়া কখনই সহজ ওঠে না এই অন্তর্ভেদী পৃথিবী। সাম্প্রতিক এই 'বোধ' থেকে 'বিপন্ন বিস্ময়' অপরাজিত হয়েছে এই শূন্যতা বা নিঃসঙ্গতাই যেন হয়ে ওঠে যখন পারিপার্শ্বিক জীবন কিংবা আত্মহননের, তখন এই নায়ক জীবনবোধের উৎস সম্পর্কে আমরা অনায়াসেই জানতে পারি এই কথায় যে, মানুষ জানে না তার সত্তার সম্পূর্ণ পরিচয় কি, যে কারণে নিজের কাছেই সে হয়ে ওঠে অপরিচিত, পরিপার্শ্ব থেকে বিযুক্ত মনে করে নিজেকে। যদিও একান্তভাবেই সে পরিবেশ নির্ভর, তবু এক ধরনের মানসিক অনুভূতির সাহায্যেই সে মনে করতে পারে না নিজের সত্তাকে নিজেরই সাহায্যহীন হিসাবে। জানতে পারে না সে যে, সমাজের কোনও উত্থান বা পরিবর্তনে তার কোনও ভূমিকা আছে কিনা, আত্মবিশ্বাস আর আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে এই মানুষ তখন সামাজিক আদর্শ বা লক্ষ্য অভিমুখে না এগিয়ে, নিজেকে সম্পূর্ণ একা বলে ভাবতে বাধ্য হয়।

বস্তুত একজন অন্তর্দর্শীর দৃষ্টিতেই ফুটে ওঠে মানুষ জগতের অন্তরালে এক সমান্তরাল জগৎ, যে দৃষ্টির ভিতর দিয়ে জগতের চেতনাটিকে তার মনে হয় ভিন্ন, তার প্রমাণ মেলে আত্মহত্যায়। তিনি দেখে নিতে পারেন যে, বর্তমান সমাজে 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' নেই, গোষ্ঠীর ভিতরে ব্যক্তি নিমজ্জিত সম্পূর্ণভাবে। যেন মানুষ তার স্বাতন্ত্র্যকে হারাবার জন্য আত্মসমর্পণ করেছে নিজেকে গোষ্ঠী ও সমাজের কাছে, নানা রূপ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর দাস হয়ে গেছে সে। তাই সে তার মুক্তি ও তুষ্টির সাহায্যে গ্রাস করেছে, জীবনের অর্থ কি? কী সে তার Absolute freedom বা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা? কেননা মানুষ পৃথিবীতে এসেছে অধিকার করার জন্য। কেমন করে এসেছে, কেনই বা এসেছে, এ প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীতে ক্ষণিকের এই জীবনে সে তার স্বাধীন ইচ্ছা রেখেছে অক্ষুণ্ণ। অন্যদিকে সে বোধ করতে পেরেছে স্বাধীনতা। অথচ পূর্ণ স্বাধীনতাও মানুষের শান্তি আনে না, শান্তি আনে না কোনও কিছুতেই। একমাত্র মৃত্যুই হচ্ছে Absolute freedom বা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সাযুজ্য পরিপূরণের উপায়। তাই আত্মহননকে বেছে নিতে বাধ্য হয় সে এই উদ্ভট জগৎ থেকে পরিত্রাণলাভের উপায় হিসাবে।

জীবনানন্দের চিন্তার এই বোধ আর বিপন্ন বিস্ময় তাই করে তোলে তাঁকে এক অতিরিক্ত দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। যে দৃষ্টির ভিতর দিয়ে এক সময় অপরিচিত হয়ে ওঠে পরিচিত জগতের চেতনাটি, তার মধ্য দিয়ে তিনি টের পান জীবনের মধ্যেও মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার। স্বাভাবিক দৃষ্টির ভিতর দিয়ে যে নারীর শরীরকে তার মনে হয়েছিল ধানক্ষেতের মতো স্নিগ্ধ, কাছে গিয়ে তাকে ছুঁয়ে তার মুখ-বুক-স্তন, অতিরিক্ত সেই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তাকালো তার এক নিমেষেই তা হয়ে ওঠে যেন খড়ির মতো সাদা মুখ, বুকেতে হাত দিলে মনে হয় বাসি শব, একেবারে মেকী। যেমন মনে হতে থাকে জীবনের চতুর্দিকে দুনিয়াকে প্রেতের আনাগোনা। সমস্ত কিছুই প্রেতের মতো বিভ্রম, অনুভূত হতে থাকে জীবনের পরিপার্শ্বকে। এই বিষয়ে প্রেমার্থে শব্দ কিছুটা মিলিয়ে দেওয়া হয় যুদ্ধোত্তর জমানার এক্সপ্রেশনিস্টদের সাথে, কারণ এ জীবনের সাথে অস্বাভাবিক সম্পর্কের সূত্র ধরে তাদের রচনাগুলিতেও এসেছিল অস্বাভাবিকতা। অন্তর্মুখী কবি জীবনানন্দও তাঁর নিজের কালের হাতে প্রতিহত হতে হতে হয়ে উঠেছিলেন প্রতিবাদহীন নৈঃসঙ্গ্য চেতনার বিস্তারে। কিন্তু নিষ্ঠুরতর কোনই নয়। এক পার্থিব অনুভবের তার সৌন্দর্যের প্রেম-প্রীতি-যশ সবই তিক্তে বিস্বাদতর, অর্থহীন এবং মূল্যহীন।

এই অসুখ দৃষ্টিই হয়তো প্রমাণ করে যে, নিজের সত্তাকে তিনি কল্পনা করতে পারেননি সম্পূর্ণ পরিচিত হিসাবে। যে জগৎ তাঁর নিজের মানসিকতা দিয়ে গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল, তা যেন ঠিক পরিচিত নয়, কিংবা স্বল্প পরিচিত, অথবা যাকে দেখা যায়নি ও অস্পষ্ট এক জগৎ। সমাজ-মানসের সঙ্গে তাই শিথিল মনে হয়েছে তার সাযুজ্যবোধ বা সংযোগ পরিচয়ের সূত্র। একজন সমান্তরালবর্তী কবির মতোই তাঁকে তাই প্রমাণ করতে হয়েছে নিজের অন্তঃসারশূন্য এই চেতনাকে। কেননা এই অনুভূতি, এই অসুখ দৃষ্টির ভিতর দিয়ে জগৎকে এভাবে দেখার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই। উদ্ভিদ, পশু বা পাখি কারোরই নেই।

হয়তো এর থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি, এই যে 'বোধ' আর 'বিপন্ন বিস্ময়' দুয়ে মিলে আছে জীবনানন্দের একটি অধ্যায়কে, কেন যে তার দৃষ্টিশক্তি প্রকাশকেই বেছে নিতে হয় একজন কবিকে তাঁর ধর্ম হিসাবে, কেনই বা এ দুয়ের অনুভূতিপ্রবণ মানুষই আক্রান্ত এই বোধে, এই বিপন্ন বিস্ময়ে আর কেনই বা বলেছেন বুদ্ধদেব বসু, 'হয়তো না বললেও চলে, এই বিস্ময়ের নাম মন মানুষের সবচেয়ে ভিন্ন ও বিপজ্জনক সম্পত্তি।'

জেটিঘাট ও অসংখ্য স্টিমার

ব্রত চক্রবর্তী

জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' এক জেটিঘাট, অন্যদিকে তার দিকে ধাবমান অসংখ্য স্টিমার। যদি এইভাবে আমি বলি, খুব কি হৈ-চৈ হবে? কিন্তু যতবার আমি জীবনানন্দের এই কবিতা পড়ি, আমার এই কথাটাই মনে হয়। জেটিঘাট ও স্টিমারের কথা। এক নারীর কথা জীবনানন্দ বলেছেন এই কবিতায়। কেমন নারী? 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। হয়তো বলি এই নারীর কথা। কিন্তু তারপরই মনে পড়ে যায় এই কবিতার শুরুর লাইনটি। 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'। এই শুরুর লাইনটি পড়লেই আমি এই নারীর কথা ভুলে যাই। তখন মনে হয় বনলতা সেন এক আলোকিত শান্ত জীবনপ্রবাহের, যা এই জেটিঘাট। আর তার দিকে, ওই সমুদ্রের দিকে যেয়ে চলেছে আমরা অসংখ্য স্টিমার। বারেবারেই, ফিরে ফিরে পড়ি আমি জীবনানন্দ দাশের এই কবিতা 'বনলতা সেন'। অত প্রিয় কবিতার তালিকায় এটি অন্যতম একটি। যতবার পড়ি, তখনকার পাশাপাশি 'মাথার ভেতরে এক বোধ কাজ করে'। আর ওই জেটিঘাটমুখী এই জীবনপ্রবাহ বা স্টিমার পরিক্রমার কথা ভাবলেই মনে পড়ে জীবনানন্দের অন্য একটি কবিতার দুটি পংক্তি: 'অনেক নতুন দুঃখ অবিরল/শেফালিকার জ্যোৎস্নায় নিয়ে তোমার জন্য'। এ-ও এক জীবন পরিক্রমা। অনেক নতুন অবিরল ঘুরে ঘুরে কাঙ্ক্ষিত জলের খোঁজ। তারপর তার সন্ধান পাওয়া। কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে। মনে হয় এই দুই পংক্তির সঙ্গে বনলতা সেন কবিতার মূলভাবের। বনলতা সেন কবিতাটিতেও দেখি যখন পরিক্রমা শেষ, শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা নামছে বা ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলছে চিল, তখন কাঙ্ক্ষিত জলের দেখা পাওয়া। সব স্টিমার গিয়ে পৌঁছেছে জেটিঘাটে। তখন 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার নাটোরের বনলতা সেন'। হ্যাঁ, বেশ অনেক দিন আগে প্রথমবার যখন জীবনানন্দের এই কবিতা পড়ি, ভালোলাগা ছাড়া অন্য কিছু অর্জন হয়নি। তারপর ফিরে ফিরে পড়ি। 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক' আর 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন', কী আশ্চর্য দক্ষতায় কবি এই দুই অবস্থাকে পাশাপাশি রেখেছেন, চারিদিকে হাতছানি, কিন্তু ঘুরে ঘুরে স্টিমারগুলি ক্লান্ত। আর কতদূর সেই বন্দর? জেটিঘাট? যেখানে পৌঁছলে 'দুদণ্ড শান্তি'! জীবনানন্দের কবিতা যখন পড়ি, এই তৃষ্ণা টের পাই। এক তৃষ্ণা তার পানীয় খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ নাগরজীবন কোলাহলে, প্রকৃতি তার তার করে খুঁজে, এই তৃষ্ণা তার পানীয়ের কাছে পৌঁছতে চাইছে। স্টিমারগুলি জেটিঘাটে পৌঁছতে চাইছে। যখন 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার, নাটোরের বনলতা সেন'। এই জীবন, তার হাজার বাধা, লাঞ্ছনা, অপমান, বিপত্তি, দুঃখকষ্ট, কোলাহল, সবকিছুর ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আমরা এক নিশ্চিন্ততারই সন্ধান করে চলি। এক শান্তির খোঁজ। তারপর। তার নাম বনলতা সেন। পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে সেই শান্তি-স্বস্তি-আশ্রয় যেন জানতে চায়, এতদিন কোথায় ছিলেন! অনেক হঠাৎ জেগে ওঠে। ... অনেকের তৃষ্ণার শেষে স্টিমারগুলি জেটিঘাটে পৌঁছে যাবে, আর স্বস্তি! সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে পরিক্রমা শেষে ক্লান্ত স্টিমারগুলি যেন 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক'। তখন কোথাও, ... ঘুরে, সব অর্জন তুচ্ছ করে দিয়ে বিশ্রাম চেয়ে নেওয়া। 'অর্থ নয় কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয় আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে খেলা করে'—যে

জীবনানন্দের বিয়ের ঠিক পরে-পরেই তোলা। পারিবারিক বন্ধুমিলনের ছবি

বিশয় বিস্ময় ঘুচিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এতদিন, এবার তার ডানা মুড়ে বসা। কখনও মনে হয় এই কবিতায় জীবনানন্দ যে নারীর কথা বলেছেন, একদা সেই নারীও ফেরি নৌকা ছিল, পরে জেটিঘাট হয়ে গেছে। আগে সে কারুর দিকে ধাবিত হতো, এখন তার দিকেই সবাই ধাবিত হয়। আবার কখনও মনে হয় সাধারণভাবে যে কথাটা বলা হয়ে থাকে টুকরো টুকরোভাবে সব কবি একটিই কবিতা লেখেন, বনলতা সেন পড়ে তাই মনে হয়। অসংখ্য টুকরো কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ এই কবিতা, বনলতা সেনের কাছেই পৌঁছতে চেয়েছেন। টুকরো কবিতাগুলি যেন ফেরি নৌকা, একেকটি স্টিমার, যা ধরে সমস্ত পৌঁছনো। জেটিঘাটে। জীবনানন্দ পৌঁছেছিলেন সেই সিদ্ধিতে। সেই সিদ্ধির নাম বনলতা সেন। সব পাখির ডানা গুটিয়ে পালকের খবর নিতে নিতে, অন্ধকারের ভেতরকার পাখা অন্ধকার খুঁজতে খুঁজতে, জোনাকির মতো ঝিলমিল হতে হতে ওই জীবনানন্দ চলেছেন। এক স্টিমার। ওই দূরে তার গন্তব্য, জেটিঘাট। সব পাখির ঘরে ফেরার পালা এখন। সব নদীর। জীবনের সব লেনদেন মিটে গেছে। ওই একটা শতাব্দী শেষ হয়ে আর একটা শতাব্দী শুরু হতে যাচ্ছে। 'একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে/আরেকটি পৃথিবীর দাবী/স্থির করে নিতে হলে লাগে/সকালের আকাশের মতন বয়স'। ওই দেখতে পাচ্ছি একশ বছর পার করে, হাজার বছরের পরিক্রমা শেষ করে জীবনানন্দ পৌঁছে যাচ্ছেন তাঁর গন্তব্যে। তিনি পৌঁছেছেন তার নারীটির কাছে। স্টিমার, হা-ক্লান্ত এক স্টিমার পৌঁছেছে আলোকিত জেটিঘাটে। জল বাড়ছে জলের ধাক্কায়। এখন মুখোমুখি বসা যাক। কার মুখোমুখি? দু'দণ্ড শান্তির। দু'দণ্ড ওই শান্তির নাম বনলতা সেন।

জীবনানন্দ দাশ : জীবনীপঞ্জি

প্রভাতকুমার দাস

১৮৯৯

১৭ ফেব্রুয়ারি: (বঙ্গাব্দ ১৩০৫ ফাল্গুন ৬ মঙ্গলবার) বরিশাল জেলা শহরে (বর্তমান বাংলাদেশ) জন্ম।

পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার পদ্মাতীরবর্তী গাউপাড়া গ্রাম। পিতা সত্যানন্দ, ব্রাহ্ম, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক; 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, প্রবন্ধ লেখক। মাতা কুসুমকুমারী, কবি—"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে। কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে"—বহু বিশ্রুত 'আদর্শ ছেলে' কবিতার রচয়িত্রী। জীবনানন্দ জ্যেষ্ঠ সন্তান। ডাক নাম: মিলু।

১৯০১

১১ অক্টোবর: অনুজ অশোকানন্দর জন্ম। পরবর্তীকালে আয়কর বিভাগে কর্মে যুক্ত।

খুব ছোটবেলায় কঠিন অসুখ হয় জীবনানন্দর। প্রায় জীবন-মরণ সমস্যা। কুসুমকুমারী রুগ্ন সন্তানকে নিয়ে হাওয়া বদলে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন লখনৌ, আগ্রা, গিরিডিতে। সঙ্গে ছিলেন মাতামহ চন্দ্রনাথ।

১৯০৮

জানুয়ারি বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন।

বাবা অল্পবয়সে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার বিরোধী, তাই এই বিলম্ব। সমস্ত বাল্যশিক্ষাকাল অতিবাহিত হয়েছে মায়ের তত্ত্বাবধানে।

১৯০৯

বাবার অসুস্থতার জন্য মা-বাবার সঙ্গে গিরিডিতে বেড়াতে যান।

১৯১৫

১ এপ্রিল: একমাত্র বোন সুচরিতার জন্ম। উচ্চশিক্ষিতা, এম এ বি টি—অধুনালুপ্ত রাজকুমারী অমৃতকুমারী বালিকা বিদ্যালয়ের

প্রথম লিখেছিলি। বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস।

১৯১৭

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এ পাস।

১৯১৯

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স-সহ বি এ পাস। 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩২৬) 'বর্ষ-আবাহন' নামে প্রথম মুদ্রিত কবিতাটি নামহীনভাবে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটিতে লেখক শুধু 'শ্রী' উল্লেখিত হন, পরে চৈত্র সংখ্যার বার্ষিক সূচিপত্রে 'শ্রীজীবনানন্দ দাশ বি এ' হিসাবে ঘোষিত হয়।

১৯২১

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম এ পাস।
এম এ এবং ল' পড়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাসে থাকতেন। পরীক্ষার পূর্বে কিছুদিন 'ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি' রোগে অসুস্থ ছিলেন, তাই পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে পারেননি।

১৯২২

কলকাতার সিটি কলেজে ইংরেজি বিভাগে 'টিউটর' পদে অধ্যাপনা শুরু।

হ্যারিসন রোডে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ থাকতেন। আইন পড়া ছেড়ে দেন। পরবর্তী সময় ১৮/২/এ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ঘর ভাড়া নিয়ে ছিলেন, বরিশাল থেকে অশোকানন্দ এম এস সি পড়তে এলে তখন উভয়ে একত্রে থাকতেন।

১৯২৩

দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ।

১৯২৫

১৬ জুন: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণ। 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'দেশবন্ধু' শিরোনামে এই উপলক্ষে রচিত এবং 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৩২) 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটি সম্পর্কে কবি কালিদাস রায় বলেছিলেন, এই কবিতাটি পড়ে তাঁর মনে হয়েছে প্রতিষ্ঠিত কোনও প্রবীণ কবি ছদ্মনামে কবিতাটি লিখেছেন।
'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় পর পর তিন সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ-পৌষ; মাঘ-ফাল্গুন, চৈত্র ১৩৩২) 'স্বর্গীয় কালীমোহন দাশের শ্রাদ্ধবাসরে' শীর্ষক ধারাবাহিক রচিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, যেটিও এ পর্যন্ত প্রাপ্ত কবির মুদ্রিত গদ্য।

১৯২৬

'কল্লোল' পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ একাদশ সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩৩২) তাঁর 'নীলিমা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।
'কালি-কলম' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৩৩-এ, এই পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় জীবনানন্দ দাশগুপ্ত নামের অধীনে 'পতিতা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

১৯২৭

জুলাই ঢাকা ৪৭ পুরানা পল্টন থেকে বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকার প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ (আষাঢ় ১৩৩৪)। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৩৪) শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত নামে তাঁর 'খুশ-রোজী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষের পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও তাঁর পদবী 'গুপ্ত'-সহ উল্লেখিত হয়েছে।
'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ (১০ আশ্বিন ১৩৩৪)। 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থে কবির পদবির 'গুপ্ত' বর্জিত হলেও গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরও দু-একটি পত্রিকায় 'দাশগুপ্ত' পদবী ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯২৮

সিটি কলেজের চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। জীবনানন্দ সিটি কলেজের সর্বশেষ কনিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। নানা কারণে তখন ছাত্রসংখ্যা কমে গিয়েছিল কলেজে। রামমোহন রায় ছাত্রাবাসের একদল ছাত্রের সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে গোলযোগ দেখা দিলে ছাত্রসংখ্যা কমে যায়। বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়।

'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে সজনীকান্ত দাস অত্যন্ত অশালীন ভাষায় জীবনানন্দের এক একটি কবিতা উদ্ধৃত করে তীব্র আক্রমণ করতে শুরু করেন।

১৯২৯

খুলনা বাগেরহাট পি সি প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে মাত্র মাস তিনেকের জন্য অধ্যাপনা করেন। পরে কলকাতায় ফিরে এসে, প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ বাস করেন। অর্থ রোজগারের প্রয়োজনে গৃহশিক্ষকতা করতেন। চাকরির জন্য বিভিন্ন স্থানে আবেদন করেছেন—কিন্তু তেমন সুফল পাননি।
ডিসেম্বর দিল্লির রামযশ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে যোগদান। মাত্র মাস চারেক কাজ করেন।

দিল্লি থেকে এসে পারিবারিক উদ্যোগে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা হয়। পরে আর দিল্লিতে ফিরে যাননি। ফলে চাকরিটি যায়। পরবর্তী প্রায় পাঁচ বছর বেকার ছিলেন।

১৯৩০

৯ মে : (২৬ বৈশাখ, শুক্রবার ১৩৩৭ শুক্লা চতুর্দশী তিথি) খুলনা জেলার সেনহাটির রোহিণীকুমার গুপ্ত ও সরযূবালার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যর সঙ্গে বিবাহ। ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরিতে বিবাহ বাসরে বুদ্ধদেব বসু, অজিতকুমার দত্ত প্রমুখ কবি-বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। ৩ আষাঢ়, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে মাতামহী প্রসন্নকুমারীর মৃত্যু।

১৯৩১

ফেব্রুয়ারি (৩ ফাল্গুন, ১৩৩৭) কন্যা মঞ্জুশ্রীর জন্ম। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার প্রকাশ (শ্রাবণ, ১৩৩৮); 'পরিচয়'-এর প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (মাঘ, ১৩৩৮) তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতাটির প্রকাশ নিয়ে খুব বিতর্ক হয়, 'পরিচয়' গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে। কিন্তু সে কবিতাটি 'পরিচয়'-এ প্রকাশের জন্য জীবনানন্দের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। প্রকাশের পর অশ্লীলতার অপবাদ যুক্ত হয় তাঁর বিরুদ্ধে।
বর্তমান বর্ষে তিনি ছোটগল্প লেখায় মনোযোগী হন অত্যন্ত নিভৃতে।

১৯৩২

সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকার প্রকাশ (বৈশাখ, ১৩৩৯)।
মার্চ ও আগস্ট-সেপ্টেম্বরে 'প্রেতিনীর রূপকথা' ও 'নিরূপম যাত্রা' রচনা করেন, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

১৯৩৪

মার্চ 'রূপসী বাংলা'-র কবিতাগুলি লেখেন, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

১৯৩৫

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগদান।
বুদ্ধদেব বসু প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সমর সেন সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ (আশ্বিন, ১৩৪২), প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় তাঁর 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'কবিতা'-র প্রথম সংখ্যা পড়ে বুদ্ধদেব বসুকে যে চিঠি লেখেন (৩ অক্টোবর, ১৯৩৫) তাতে জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেন : 'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।'

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৪২) তাঁর বহু বিখ্যাত 'বনলতা সেন' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬

১৯ নভেম্বর : পুত্র সমরানন্দের জন্ম।
ডিসেম্বর, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৩৮

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলন প্রকাশ (মাঘ ১৩৪৪), 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মৃত্যুর আগে' আংশিক বর্জিত আকারে গৃহীত হয়।
হুমায়ুন কবির ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার প্রকাশ (আশ্বিন ১৩৪৫), প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় জীবনানন্দের '[illegible]' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

১৯৩৯

কবিতাভবন-এর উদ্যোগে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলন প্রকাশ (শ্রাবণ ১৩৪৬); জীবনানন্দের 'পাখিরা', 'শকুন', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতা চারটি গৃহীত হয়।

১৯৪০

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'নিরুক্ত' কবিতা পত্রিকার প্রকাশ (আশ্বিন ১৩৪৭), প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় জীবনানন্দের '[illegible]' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

১৯৪১

৭ আগস্ট : (বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২২ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু।

১৯৪২

২২ নভেম্বর : পিতা সত্যানন্দের মৃত্যু।
বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে কবিতাভবন থেকে 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৪৪

জানুয়ারি 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র পক্ষে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত হিরণকুমার সান্যাল ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'কেন লিখি' পুস্তিকায় অন্যান্য সমকালীন কবি ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁরও বক্তব্য প্রকাশিত হয়।
পূর্বাশা লিমিটেড কর্তৃক 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ (শ্রাবণ ১৩৫১)।

১৯৪৫

ডিসেম্বর সিগনেট প্রেস থেকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'মডার্ন বেঙ্গলি পোয়েমস' গ্রন্থের প্রকাশ, জীবনানন্দ কৃত অনুবাদগুলি গ্রহণ করা হয়নি— মার্টিন কার্কম্যান কবিতাগুলি অনুবাদ করেছিলেন। [illegible] তাঁর If I were (আমি যদি হতাম), O Kite (হায় চিল), Banalata Sen (বনলতা সেন) Meditation ([illegible]) কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়।

১৯৪৬

৫ জুলাই থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর: পাঁচ মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য [illegible] থাকেন।

১৯৪৭

দেশ বিভাগের কিছু পূর্বে সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। জুন-এ ব্রজমোহন কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। হুমায়ুন কবির প্রতিষ্ঠিত 'স্বরাজ' (২১ জানুয়ারি) পত্রিকার রবিবাসরীয় সম্পাদক হিসাবে যোগদান। সম্ভবত জুন-জুলাই মাসে এ কাজ ছেড়ে দেন।

১৯৪৮

মে-জুন মাসে 'মাল্যবান' ও 'সুতীর্থ' উপন্যাস রচনা, তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।
ডিসেম্বর 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের প্রকাশ (অগ্রহায়ণ ১৩৫৫)।
২৫ ডিসেম্বর [illegible] সম্ভবত ৭৩ বছর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ।

১৯৫০

২২ জানুয়ারি: কলকাতায় 'সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্র' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। কেন্দ্রের মুখপত্র হিসাবে নিরুপম চট্টোপাধ্যায় ও [illegible] সম্পাদিত (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৪) 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। নব পরিকল্পিত পত্রিকার সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য নিযুক্ত হন জীবনানন্দ দাশ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, হরপ্রসাদ মিত্র।

১৯৫১

ফেব্রুয়ারি খড়্গপুর কলেজের কাজ থেকে অব্যাহতি পান।
সে বছরে তাঁর ল্যান্সডাউনের একটি ঘর সাবলেট করেন এক বিধবা মহিলাকে। অল্প দিনের মধ্যে সেই মহিলার আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হন, আমৃত্যু বাড়ি নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধ চলতে থাকে।

১৯৫২

সিগনেট প্রেস থেকে তাঁর 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ (শ্রাবণ ১৩৫৯)। ১৩৫৯-এর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে 'নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন' কর্তৃক পুরস্কৃত হয়।
নভেম্বর বড়িশা কলেজে (বর্তমানে বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজ) অধ্যাপনার কাজে যোগদান।

১৯৫৩

ফেব্রুয়ারি বড়িশা কলেজের অধ্যাপনার কাজ থেকে ছাঁটাই হন। ফেব্রুয়ারি-মার্চ ডায়মন্ডহারবার ফকিরচাঁদ কলেজে অধ্যাপনার জন্য আবেদন করেন, কিন্তু বাসস্থানের অসুবিধার জন্য শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় নি।
মে মাসে [illegible] এক অনুষ্ঠানে কবিকে পুরস্কার দেওয়া হয়। জুলাই হাওড়া গার্লস কলেজে (বর্তমানে বিজয়কৃষ্ণ কলেজ) যোগদান। ইংরেজি বিভাগীয় প্রধান হওয়ার অতিরিক্ত মাসিক ৫০ টাকা ভাতা পেতেন।
বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (ফাল্গুন ১৩৬০) সংকলন প্রকাশ, কবিতাভবনের পূর্ববর্তী সংস্করণে গৃহীত কবিতা ছাড়াও 'হায় চিল', 'বেড়াল', 'হাওয়ার রাত', 'সমারূঢ়', 'আকাশলীনা', 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাগুলি গৃহীত হয়।

১৯৫৪

২৮ ও ২৯ জানুয়ারি: যথাক্রমে বৃহস্পতি ও শুক্রবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সিনেট হলে কবি সম্মেলনে যোগদান, প্রথম দিনে সবশেষে কবিতা পড়েন 'বনলতা সেন' সহ তিন-চারটি।

মে মাসে নাভানা প্রকাশন কর্তৃক 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের প্রকাশ। ১৩ অক্টোবর রেডিওর কবি সম্মেলনে 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাটি পাঠ করেন। ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় দেশপ্রিয় পার্কের কাছে সান্ধ্যভ্রমণের সময় রাস্তা পার হতে গিয়ে ট্রাম দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি হন। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁর পাঁজর, কণ্ঠা ও উরুদেশের হাড় ভেঙে যায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের চিঠি নিয়ে সজনীকান্ত দাসের কাছে যান মেডিকেল কলেজের দুই তরুণ ডাক্তার ভূমেন্দ্র গুহ ও দিলীপ মজুমদার। সজনীকান্তের প্রচেষ্টায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ অমিয়কুমার বসু ও ডাঃ অমলানন্দ দাশকে সঙ্গে নিয়ে কবিকে দেখতে যান।

২২ অক্টোবর: শুক্রবার (বঙ্গাব্দ ১৩৬১ কার্তিক ৫) রাত ১১-৩৫ মিঃ ওই হাসপাতালে মৃত্যু।
পরের দিন এক নাতিদীর্ঘ শোকযাত্রা সহ মরদেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

রুচিশীল ও মনের মত বিভিন্ন স্বাদের বই পেতে হলে
কলকাতা পৌরসংস্থার প্রকাশিত বই পড়ুন ও পড়ান

ছোটদের জন্য

আমাদের বিদ্যাসাগর
আমাদের সুভাষচন্দ্র

সাধারণের জন্য

মুক্তি সংগ্রাম ও কলকাতার পার্ক
C. V. Raman Birth Centenary Issue
Anthology Number 1924-1947
Netaji Birthday Com. Vol. Cent. eve-tribute
C. M. Gazette-Netaji Centenary Issue
Mayors of Calcutta
Calcutta-a Glimpse
Calcutta-a set of Pictures
Calcutta at a Glance
C. M. C. Year Book
Compendium on Assessment & Collection
Building Permit Manual ১০০.০০

কলকাতা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে পুরতথ্যসমৃদ্ধ পুরশ্রী নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

উল্লিখিত বইগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং
রেকর্ড বিভাগের কাউন্টারে সারা বছর পাবেন।
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
১, হগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০ ০৮৭

সামান্য কিছু সতর্কতা

ম্যালেরিয়া

তাড়াতে পারে

- জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করান ও পুরোমাত্রায় ওষুধ খান
- ম্যালেরিয়ার মশা কেবল পরিষ্কার জলে জন্মায়—খোলা চৌবাচ্চা, হাঁড়ি-কলসি বা ড্রামে ধরা জল সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন পরিষ্কার করুন
- বর্ষার জল বাড়ির ছাদে বা আনাচে-কানাচে জমতে দেবেন না
- জলের ট্যাঙ্ক ঢেকে রাখুন যাতে মশা ঢুকতে না পারে
- শোয়ার সময় অবশ্যই মশারি টাঙান

॥ ম্যালেরিয়া জীবন নেয় সাবধানের মার নেই ॥

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসভা